উলঙ্গ বুভুক্ষা

বেদুইন

—রূপাই ও তপাইকে—

॥ এক ॥

কালাচাঁদ মৃত্যুকালে পুত্র ফকিরচাঁদের জন্য তিন বিঘা জমি, একটি খড়ের চালা মাটির ঘর ও দেড়হাজার টাকা ঋণ রেখে গিয়েছিল। মৃত্যুকালে পুত্রকে কিছুই বলে যেতে পারেনি শুধুমাত্র নাতি নফরচাঁদের মাথায় হাত রেখে বিড়-বিড় করে অবোধ্য ভাষায় কিছু বলে গিয়েছিল, সেই বক্তব্যের অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি কেউ-ই।

মেয়ে সুরবালার বিয়ে দিতে অভিরাম মহাজনের কাছ থেকে তিন'শ টাকা ঋণ করেছিল কালাচাঁদ। আসল টাকা তো শোধ দিতেই পারেনি, সুদও সব সময় দিতে পারত না। বছর শেষে বাকি সুদের টাকার সঙ্গে আসল টাকা জুড়ে দিয়ে নতুন করে হ্যান্ডনোট লিখে দিত কালাচাঁদ। এইভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে বাড়তে মোট ঋণের অঙ্ক তিন'শ থেকে দেড় হাজারে দাঁড়িয়েছিল।

কালাচাঁদের মৃত্যুর পর ফকিরচাঁদ হিসাব করে দেখেছে তার বাবা জীবিত-কালেই তিন'শ টাকার সুদ দিয়েছে পাঁচশ সতের টাকা অথচ তার ঋণ শোধ না হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে অভিরামের পাওনা দাঁড়িয়েছে দেড় হাজার টাকা।

বাবার লেখা হ্যান্ডনোটকে অস্বীকার করতে পারার কোন সুযোগই না থাকায় নতমস্তকে ঋণের দায় মাথায় পেতে নিয়েছিল, তবে পড়শী অনন্ত হালদারের পরামর্শে নতুন করে হ্যান্ডনোট লিখে দিতে রাজি হয়নি ফকিরচাঁদ। তার চেয়ে সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। জমি বিক্রি করে ঋণ শোধ দেবার পথ। তবুও সব ঋণ শোধ না হওয়াতে ফকিরচাঁদ অভিরামের দয়া ভিক্ষা করতে বাধ্য হল। স্থির হল, আগামী দশ বছর পেটভাতায় ফকিরচাঁদের ছেলে নফর-চাঁদ অভিরামের খামারে বেগার দেবে। তাতেই শোধ হবে তার ঋণ।

কালাচাঁদ যে ঋণের অঙ্ক রেখে গেছে, আসল টাকার কয়েক গুণ শোধ হবার পর নফরচাঁদ পাবে মুক্তি, এ মুক্তি যে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে মুক্তি তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিল নফরচাঁদ। ফকিরচাঁদ ফকির হয়ে বিশ্বের জমিদারী লাভ করেছিল আর পুত্র নফরচাঁদকে নফর তৈরি করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বিদায় নিয়েছিল ধরাধাম থেকে। সে বিদায়ও খুব সুখের নয়, আনন্দের নয়, যাওয়াটাই যখন ঠিক তখন না যাবার পথ কোথাও উন্মুক্ত থাকলেও তা জানা ছিল না কারও। কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে বিনা চিকিৎসায় ফকিরচাঁদ মারা গেল। মৃত্যুর পূর্বে পুত্র নফরচাঁদকে কিছু বলে যেতে পারেনি।

এই ঋণই কালাচাঁদের মৃত্যুর পর শোধ দেবার দায় বহন করতে হয়েছিল ফকিরচাঁদকে। শেষ অবধি জমি বিক্রি করেও যখন ঋণ শোধ হল না তখন পেটভাতায় পুত্র নফরচাঁদকে অভিরামের বাড়িতে নফর হতে বাধ্য করেছিল।

কালাচাঁদ জীবিতকালেই সুরবালার বিয়ের সাত মাসের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল

গুরুতর দুর্ঘটনা। সুরবালার শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এল সুরবালা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়েই কালাচাঁদ ফকিরচাঁদকে পাঠিয়েছিল ঘটনাটা যাচাই করতে।

ফকিরচাঁদ বলল, সুরো নদীতে স্নান করতে গিয়েই অঘটন ঘটেছে। ওরা বলছে কামোটে টেনে নিয়ে গেছে সুরবালাকে। কিন্তু লোকে অন্য কথা বলছে।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করেছিল, কি বলছে?

সুরোর শ্বশুরদের শরিকরা বলছিল, সুরোর গলা টিপে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে সুরোর স্বামী অবিনাশ ও তার দলবল।

দলবল কেন?

তুমি তো ভাল করে খবর না নিয়ে বিয়ে দিয়েছিলে। অবিনাশের বাবা হল নামকরা ডাকাত। নদীতে নৌকা নিয়ে যায় ডাকাতি করতে। সঙ্গে অবিনাশও থাকে। ওদের লোকজনের অভাব আছে কি? আমাদের কপালে দুঃখ আছে, নইলে এমন কুটুম কেউ করে!

তা হলে উপায়?

ফকিরচাঁদ চুপি চুপি বলল, অবিনাশের দূর সম্পর্কের কাকা বলল, পুলিশে যা।

পুলিশের নাম শুনে চমকে উঠল কালাচাঁদ।

বলল, দরকার নেই। ওবনেশের বাবা জানতে পারলে আমাদের নির্বংশ করে ছাড়বে। সুরো মরে বেঁচেছে। বেঁচে থাকলে ডাকাতের ঘরে সাত খোয়াড় হোত।

সুরবালা মরলেও তার বিয়ের দরুণ ঋণটা থেকে গেল। জীবিতকালে কয়েক কিস্তি সুদ বিনা আর কিছুই শোধ দিতে পারেনি কালাচাঁদ। ফকিরচাঁদ জমি বিক্রি করে ঋণমুক্ত হবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু নামের সার্থকতা বজায় রাখতে সে নিজেও সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করতে না পেরে ফকির হয়ে নিজের ছেলে নফরকে অভিরামের নফর হতে বাধ্য করেছিল।

এসব পুরানো কথা।

ফকিরচাঁদ মরেছে।

নফরচাঁদ বড় হয়েছে। গায়ে-গতরে মেহনত করে পিতামহের ঋণ শোধ করে চলেছে, কবে যে ঋণমুক্ত হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

নফরের সব গেছে, আছে শুধু খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরখানা।

ঘর থাকলেই ঘরণী চাই।

ঘরণী আনা তো সহজ কথা নয়।

তবে ঘরণী পেতে নফরকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ঘ্যাটেশ্বরের রমাকান্ত মিশ্র বিয়ে করেছিল পাশের গাঁয়ের মেয়ে মালতীকে।

লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে রেলের পোড়া কয়লা কুড়োতো মালতী। হঠাৎ ধ্বস নেমে দুজন মারা যাওয়াতে কয়লা কুড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। মালতী তখন প্রায় ডাগর হয়েছে। কয়লা কুড়ানো বন্ধ হল, মালতীর মা মেয়েকে বসে খাওয়াবার দায়মুক্ত হতে রমাকান্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। মালতীর বয়স তখন বার পেরোয়নি।

বোনের বিয়ের ঋণ শোধ হয়নি।

ফকিরের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ঋণ শোধ হয়নি, নফরকেই বাবার ঋণ মাথায় পেতে নিতে হয়েছে, তাতে দুঃখ ছিল না কিন্তু গতর খাটিয়ে ঋণ শোধ দেবে এমন অবস্থাও চিন্তা করেনি।

নামের সঙ্গে মিল রেখে নফরচাঁদ হয়েছিল প্রকৃত একটি নফর।

রমাকান্ত বিয়েই করেছিল মালতীকে, ঘর বাঁধার সুযোগ সে পায়নি।

কচি বউটাকে কাকীমা পাঁচুবালার হেপাজতে রেখে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল।

কলকাতায় যাবার আগে কাকীমাকে ডেকে বলেছিল, ছুঁড়িটাকে রেখে যাচ্ছি কাকী। দু'মুঠো খেতে দিস। কলকাতায় গেলে কিছু রোজগার হবেই। হাতে টাকা এলে তোকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু রমাকান্ত গেল তো গেলই। তার হদিস আর পাওয়া যায়নি।

কয়েক বছর আগে রমাকান্তের বাবাও তার ছোট ভাইকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। সে বছর বড় দুর্যোগের বছর। কলকাতায় এসে কাজ জোগাড় করার আগেই কাটাকাটি আরম্ভ। হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই। কলকাতায় ট্রেন আসে খালি, দখিণের মোল্লারা শেয়ালদহে নামে, চুপি চুপি যায় রাজাবাজারে, আর হিন্দুরা সহজেই ঢুকে পড়ে বউবাজারে। এমন শহরে মানুষ আসে, পেটের দায়ে এসেছিল রমাকান্ত, কেফু মোল্লা আরও কত কে, কিন্তু ঘরে ফিরেছিল ক'জন তা কেউ বলতে পারে না। গাঁয়ের মানুষ শুনল কলকাতায় দাঙ্গা, সে ভয়ংকর কাণ্ড! যারা ফিরে আসে গ্রামে তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে গাল-গল্প শুনিয়ে গাঁয়ের মানুষের মনে ভয় ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে দিতে থাকে। গুজবে দখিণের গাঁগুলো ক্রমেই গরম হতে থাকে। মোল্লারা ভাবছে, হিন্দুরা তাদের মারবে, আবার হিন্দুরা ভাবছে মোল্লারা তাদের মারবে, গ্রামের শান্তি উবে যেতে থাকে।

দাঙ্গা থেমেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কলকাতায় আর হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি করছে না। কিন্তু রমাকান্তের বাবা আর কাকা দেশে ফিরে আসেনি। রমাকান্তের মা ছিল না, কাকীমা পাঁচুবালাই তাকে বড় করেছে। নিজের কোন সন্তান না থাকায় আর তার স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর পাঁচুবালার সব স্নেহ-ভালবাসার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল রমাকান্ত। তারপর কত বছর কেটেছে। তিন বছরের শিশু রমাকান্ত জোয়ান ছেলে।

ঘরে বসে থাকা তার পোষায় না।

সকালবেলায় পাঁচুবালা ঘাটে যাবে এমন সময় দাঁতে নিমকাঠি ঘষতে ঘষতে রমাকান্ত এসে বলল, কাকী, আমি কলকাতা যাব।

সে কি রে? কলকাতা ভাল জায়গা নয়। তোর বাবা-কাকা কলকাতা গিয়ে আর ঘরে ফিরে আসেনি। ও কথাটি মুখে আনিস নি। কলকাতা যাবি কোন দুখে।

প্রথম দিন রমাকান্ত কোন উত্তর দেয়নি। কলকাতায় নগদ কড়ি উপায় করার অনেক পথ রয়েছে। চাষের কাজেও মন্দা।

এবার পাঁচুবালার পালা।

রাতের বেলায় চুপি চুপি রমাকান্তকে বলল, দেখে এলাম।

কি দেখে এলে কাকী?

তোর লেগে একটা ফুটফুটে মেয়ে। তোর সঙ্গে বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

এত তাড়াতাড়ি কেন কাকী। আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি!

জানি না বাপু। তোর কাকা যখন কলকাতায় গেল, তখন বলেছিলাম তাড়াতাড়ি আসিস। সে বলেছিল ঠিক আসব, পালাব না রে। এই বাদার মানুষগুলো বউ ছেড়ে পালায়, নতুন বউ খোঁজে। সেই ভয়েই তো ছিলাম। ভগবান আমার কথা শুনল না। দুই ভাই মরল মোছলমানের চাকুতে।

রমাকান্ত বলল, কার কোথায় মরণ আছে কেউ বলতে পারে না। মোছলমানের চাকুতে না মরে গাড়ি চাপা পড়েও তো মরতে পারে। না জেনে কোন কথা বলা ভাল নয়।

পাঁচুবালা বলল, সে যাই হোক, তোকে কিন্তু বে' করতে হবে মালতীকে।

মালতী! বেশ নাম তো। তুই যখন বলছিস তখন বে' করেই ফেলব।

চোখ মুছতে মুছতে পাঁচুবালা বলল, অনেক কষ্টে তোকে বড় করেচি রে। যদি কথামত তুই কলকাতায় যাস, আমি কাকে নিয়ে থাকব। তোর বউ তো থাকবে ঘরে। বউ ঘরে থাকলে তোকে আসতেই হবে ঘরে। কান টানলে মাথা আসেই।

যদি সে পালায়?

সেটা কপাল, বুঝলি। রাজার ঘরের বউ পালায়। আমাদের মত গরীব-গুবরোদের বউ ঘর করতে না পারলে, বউ পালাবে না তো ধেই ধেই করে নাচবে! তুই বে' করবি তো? এবার তাহলে কথা পাকা করি।

মালতীর সঙ্গে রমাকান্তের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি পাঁচুবালা।

বিয়ের পর মালতীকে নিয়ে এল পাঁচুবালা।

এগার পেরিয়ে বার বছরে সবে পা দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনধারা যে কি তা বোঝে না মালতী। রাতের বেলায় কিছুতেই সে রমাকান্তের ঘরে যায় না। সারাদিন মাঠের কাজে, ঘরের কাজে সবাইয়ের সঙ্গে কাজ করে। রমাকান্ত

ঠাট্টা-তামাসা করলে লজ্জায় রাঙ্গা হয় কিন্তু রাতের বেলায় কেমন একটা ভয় তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিছুতেই সে রমাকান্তের কাছে যেতে চায় না। পাঁচুবালার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়।

রমাকান্ত কিছু বললে পাঁচুবালা বলত, একটু লায়েক হোক তারপর তোর ঘরে পাঠাব। এখনও কচি।

কচি মেয়ের সঙ্গে বে' দিলি কেন? বলেই রমাকান্ত বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। পাঁচুবালা বুঝতে পারে রমাকান্তের ক্ষোভের কারণ কিন্তু কচি মেয়েটাকে অমন শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলের ঘরে পাঠাতে সাহস পায় না। তারপর একদিন মালতীকে পেঁছে দিয়ে এল তার বাপের বাড়িতে। বলে এল, আসছে বছর পুজোর আগে বৌমাকে নিয়ে যাব। কটা মাস এখানে থাকবে।

বার পেরিয়ে তেরতে পা দিতেই পাঁচুবালা গেল মালতীকে আনতে। মালতীর বাবা-মা মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে স্বামীর ঘর করতে পাঠাতে চাইলেও এবার মালতী বেঁকে বসল। রমাকান্তকে এতই ভয় করত যার ফলে শ্বশুর-বাড়ি'যাবার নামেই সে গোঁজ হয়ে বসে বলল, আমি যাব নি।

কেন রে? কে তোর আপনজন তা চিনে নিতে হবে। মেয়েদের নিজের ঘর হল সোয়ামীর ঘর।

মালতীকে কোন মতেই রাজি করাতে পারল না তার বাবা-মা আর পাঁচুবালা। অবশেষে স্থির হল আগামী মাঘে মালতীকে পাঁচুবালার কাছে পেঁছে দেবে মালতীর বাবা-মা।

অগ্রহায়ণ-পৌষে ধান কাটা শেষ। কোন কাজ নেই রমাকান্তের। সারাদিন পলুই আর ঝাঁপজাল নিয়ে ডোবায় ডোবায় ঘোরে। মাছ ধরে। অবসর কাটায় গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে।

খালপারের আয়েনুদ্দি বলল, ঘরে আর বসে থাকা যায় না রে রমাকান্ত। চল আমরা কলকাতা যাই কিছু ধান্দা করে দু'পয়সা রোজগার করি।

রমাকান্ত বলল, আকাশের মাথা ধরা কি যায়?

যায়। ধরতে জানা চাই। যাবি কিনা বল?

কাকীকে শুধিয়ে বলব।

আবার কাকী। কাকী বিয়ে দিল, বউ তোর ঘর করল না। তোর মত নিমর্দা তোদের পাড়ায় আর ক'জন আছে বলতে পারিস?

কথাগুলো জোর আঘাত দিল রমাকান্তের মনে। অনেকক্ষণ ভেবে বলল, কবে যাবি বলতো?

সোমবার। যাবি তো?

হ্যাঁ যাব।

যাওয়ার কথা স্থির করে এসেছিল রমাকান্ত কিন্তু কাকীকে কিছু বলেনি। তার অনুমতি নেবার দরকারও হয়নি। সোমবার খুব সকালে বিছানা ছেড়ে

উঠেই নিজের কাপড়-জামা যা ছিল তা পোঁটলা বেঁধে পাঁচুবালাকে বলল, কাকী আজ আমি কলকাতা যাচ্ছি।

পাঁচুবালা অবাক হয়ে রমাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে কি রে। সামনেই মাঘ। বৌ আসবে যে!

আসবে আসুক। তুই বউ নিয়ে ঘর করবি। আমার আর বউয়ের দরকার নেই। তুই বে' দিয়েছিস, তার ঠ্যালা তুই সামলাবি।

পাঁচুবালা কেঁদে ফেলল। বলল, কবে আসবি?

পকেটভর্তি টাকা যখন হবে তখন।

কেটে গেল কয়েকটা বছর। রমাকান্ত আর ঘরে ফেরেনি।

পাশের গ্রামের ফনাই মিঞার মুখে শুনেছে রমাকান্ত মুরারীপুকুরের কোন বস্তিতে নাকি ঘর নিয়েছে। বিয়েও করেছে। আছেও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে। খবর শুনে পাঁচুবালা আকুলি-বিকুলি করে ঘুরতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। অনেক কষ্টে বীরেন পেয়াদাকে রাজি করে একদিন রমাকান্তের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল কলকাতাগামী রেলগাড়ি চেপে।

তারপর।

তারপর পাঁচুবালাও হারিয়ে গেল কলকাতার জনারণ্যে। পরবর্তীকালে কেউ তার কোন সন্ধান পায়নি।

কিন্তু মালতী।

তখন তো আর এগার-বার বছরের কচি মেয়েটি নয়। বয়সের জোয়ার এসেছে তার দেহে আর মনে। তার বাবা রমাকান্তের খোঁজ করতে এসে সব কিছু শুনে ফিরে গিয়েছিল। মালতীর মাকে ফিসফিসিয়ে সব ঘটনা বলে কেমন যেন বোবার মত চেয়ে রইল।

তা হলে উপায়? মালতীর কি হবে?

পাত্তর দেখতে হবে। রমাকান্তের সাথে বিয়ের কথা বোধহয় মালতী ভুলে গেছে। সেও খুঁজছিল নতুন সঙ্গী, বাবা-মাও চায় মালতী ঘর করুক। তবে এঁটো পাতায় মুখ দিতে সহজে কেউ রাজি হয় না।

অবশেষে নফরচাঁদকে আবিষ্কার করল মালতী নিজেই।

নফর সব খবর জেনেই প্রস্তাব দিয়েছিল।

মালতী সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল।

গাঁয়ের স্বজাতি আর বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে মালতী নতুন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসল, নফরও ঘরণী পাওয়ার উন্মাদনায় নতুন কিছু ঋণ করে সবার সামনে মালাবদল করে নিজেদের অধিকার মেনে নিল।

নফর পেল প্রত্যাশিত বউ আর মালতী পেল ঘর।

সবাই পাকা ফলার খেয়ে মঙ্গল কামনা করে ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে।

মালতী হল ঘরণী।

নফর বউ পেয়ে খুশী, মালতী ঘর পেয়ে খুশী।

একটা নতুন জীবনের আশা নিয়ে দুজনে সংসার পাতল কিন্তু সংসার চালাবার মত সংস্থান ছিল না নফরের। মালতীকেও গেরস্থবাড়ির কাজ খুঁজে নিতে হল। দুজনের মেহনতে কোনক্রমে দুটো পেট চলছিল।

মালতী বাদ সাধলো।

খবরটা শুভ কিন্তু পরিণতিটা সুখের নয়।

মালতীর প্রথম সন্তান হল।

খুশী দুজনেই কিন্তু পেট চলবে কি করে সেই চিন্তাই চমৎকার।

মালতী কাজে যেতে পারে না। কচি ছেলেটা নিয়ে ঘরেই থাকতে হয়। আর নফর তার পিতামহের ঋণ শোধ করছে তো করছেই, পেট-ভাতার বিনিময়ে।

তবুও ছেলেটার একটা নাম তো রাখতে হবে।

মালতী বলল, ছেলের নাম রাখব বিনোদ।

নফরচাঁদ হেসে বলল, দূর মাগী। আমার ঠাকুরদা বাবার নাম রেখেছিল ফকিরচাঁদ। পিসির বিয়ে দিতে বাবাকে ফকির করে গিয়েছিল। আর বাবা আমার নাম রেখেছিল নফর। দেখ, কেমন আমি চাষীর ছেলে জোতদারের নফর হয়েছি। ওসব নাম চলবে না। ওর নাম রেখে দে রাজকুমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজকুমার। হয়ত একদিন সত্যি সত্যি ও রাজকুমার হবে। আর কিছু হোক আর না হোক ফকির আর নফরের জ্বালাটা তো ভুলবে।

রাজকুমার। হ্যাঁ, রাজকুমারই বটে। বাবা-মায়ের কত আশা ছেলে নফর না হয়ে রাজার দুলালই হয়ত হবে কোনদিন। নফর চেয়েছিল ছেলে রাজার দুলাল হবে। তার আশা পূর্ণ করেছিল রাজকুমার। তার রাজ্যটা হয়েছিল সীমাহীন শহর কলকাতার ফুটপাত। রাজকুমার পেয়েছিল ফুটপাতের জমিদারী।

ফকিরচাঁদের মত নফরচাঁদ ভাগ্যের বিড়ম্বনা সহ্য করতে করতে একদিন দেহরক্ষা করল। রাজকুমার নফরের মৃত্যুর পর চোখে সর্ষের ফুল দেখতে থাকে। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ননীবালাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল। সব সমস্যার বড় সমস্যা পেট।

ননীবালার বিয়েটা হয়েছিল একটু ডাগর অবস্থায়। বছর না ঘুরতেই তার কোলে এল ছেলে। নাতির বয়স যখন দু'বছর তখন নফরচাঁদ পৃথিবীর মায়া কাটালেও তার ঠাকুরদার বাকি ঋণের অংকটা চাপিয়ে গেল ছেলে রাজকুমারের স্কন্ধে।

রাজকুমারও পেটভাতায় জোতদারের বাড়িতে কাজ করে। ননীবালা কচি ছেলে কোলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ করে বেড়ায়। তাও বেশিদিন

সম্ভব হয়নি ননীবালার, আবার সন্তান সম্ভাবনা।

রাজকুমার বলল, এভাবে তো দিন চলবে না বউ। চল আমরা কোথাও চলে যাই। নতুন করে ঘর বাঁধি।

মহাজনের ঋণ? প্রশ্ন করল ননীবালা।

রইল ঘর আর কয়েক কাঠা জমি। দিয়ে যাব তাকে।

ননীবালা দৃঢ়ভাবে বলল, না। আমরা কলকাতা যাব। খেটে খাব। কর্জা শোধ করব।

তারপর একদিন গর্ভবতী স্ত্রী ননীবালা আর তিন বছরের শিশু অমরকে নিয়ে যেদিন শেয়ালদহ স্টেশনে এসে নেমেছিল সেদিন তার এখনও মনে আছে। ফুটপাতের সাড়ে তিনহাত জমিতে গা এলিয়ে দিতে কত না ঝগড়া তা বলে শেষ করা যায় না।

ভাগ্য তাড়িত যারা অনেক বছর আগে এসে ফুটপাতের জমিদারীতে নিজেদের মালিকানা স্থির করেছে যে সব মস্তান পুলিশকে দক্ষিণা দিয়ে, তারা কোনক্রমেই অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। নবাগতদের মস্তান ও পুলিশকে সেলামি দিয়েই ফুটপাতের সাড়ে তিনহাত জায়গা পাওয়া যায়।

আমরা তো তোদের সম্পত্তির দখল নিচ্ছি না। রাত কাটাবার মত একটু জায়গা ছেড়ে দে।

দেব। তোর ট্যাঁকে কত আছে?

কেন রে?

পাড়ার ছেলেদের নজরাণা দিতে হয় তা বুঝি জানিস না। ও পল্টুদা, তোমার নতুন প্রজা এসেছে গো, ঠাঁই চায়।

পল্টু তখন চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলে সবেমাত্র সিগারেটে আগুন দিয়েছে এমন সময় আগন্তুকদের উপস্থিতি মোটেই অপ্রীতিকর নয় জেনেই বলল, কোত্থেকে এয়েছে রে নোদা?

সোঁদরবন থেকে।

বাঘ লয় তো। ভাল করে দেখে লে। একটু জায়গা করে দিস আর লগদ কড়িটা বুঝে নিস। কেমন?

নাও গো কর্তা। হুজুরের হুকুম হয়েছে। ওই গাড়িবারান্দার তলায় চল। জায়গা করে দিচ্ছি। আজ রাতের আট আনা আর নজরাণা উনিশ টাকা। মোট সাড়ে উনিশ টাকা পকেট থেকে বের কর।

জমিদারী পেল রাজকুমার। বউবাজারের গাড়িবারান্দার তলায় তিনহাত লম্বা আর তিনহাত চওড়া জমির জমিদারী। খাজনা ট্যাকস দিতে হয় না সরকারকে। এখানকার মালিকানা পাড়ার মস্তানদের আর পুলিশের দালালদের। এই তিন হাত জমিতে গা এলিয়ে দিতে গিয়ে নতুন জমিদারদের কত না ঝগড়া তা বলে শেষ করা যায় না। সব সময় ঝগড়াতেই শেষ হয় না,

কখনও কখনও নতুন পুরানো জমিদারদের মেয়ে পুরুষের দাবী মুখের কথায় শেষ হয় না, রক্তারক্তি করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতেও হয়। ফুটপাতের জমিদারীতে নবাগতদের নতুন জ্ঞানলাভের পাঠশালা কলকাতার ফুটপাত।

দিনের বেলায় ননীবালা অমরকে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখে কখনও গাড়ি-বারান্দার তলায় বসিয়ে রাখে। কখনও কোন বাজারের পচাপচাকি আনাজ তরকারি কুড়িয়ে সংসার সাজায়, পেট ভরাতি করার পথ খোঁজে, কখনও অধীর-ভাবে প্রতীক্ষা করে, কখন রাজকুমার এক আধ পালি চাল নিয়ে আসবে। পেটের জ্বালাটা মিটবে এই চাল ফুটিয়ে। ননীবালার অভিযোগ নেই, মেনে নিয়েছে এই জীবনকে। কেমন নিষ্পন্দ তাদের জীবনধারা, কোথাও কোন তরঙ্গ নেই, কোথাও কোন নতুনত্ব নেই, কোথাও কোন ক্ষোভ নেই। ফুটপাতের সংসার সাজায় অনাগত সুখের ভবিষ্যতের আশায়।

রাজকুমার বসে থাকেনি, ননীবালা আর অমরকে তার জমিদারীর পাহারাদারী করতে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ত রোজগারের আশায়। কখন যে কি ভাবে রাজকুমার খাবার সংগ্রহ করে থাকে তা জানার চেষ্টাও করেনা ননীবালা। সারাদিন কাঠকুটো কুড়িয়ে রাতের রান্নার জ্বালানী সংগ্রহ করে, কুড়িয়ে আনা আনাজ তরকারী পরিষ্কার করে প্রস্তুত থাকে। রাজকুমার চালের পোঁটলা আনলেই সন্ধ্যার পর তিনচারখানা ইঁট দিয়ে উনুন সাজিয়ে রাঁধতে বসে। চাল-ডাল আনাজ তরকারী সব কিছু নুন আর লংকার সঙ্গে সেদ্ধ করতে বসে। রান্না শেষ করে অমরকে খাওয়ায়, নিজেরা খায়, তারপর সব কিছু গুছিয়ে চট পেতে শুয়ে পড়ে।

চলছিল মন্দ নয়। রাজকুমার গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল মেহনত করে। এমন সময় ননীবালা বলল, ব্যথা।

রাজকুমার চমকে উঠল না। ব্যথার বিষয় তার অজানা ছিল না। বলল, বুঝলাম। চল হাসপাতালে।

বেশি দূর যেতে হল না। পাশেই হাসপাতাল।

ননীবালাকে পৌঁছে দিয়ে এসে এবার সংসারের পাহারাদারী করতে হয় রাজকুমারকে। চার বছরের ছেলেটা আজকাল বড় বেশি ছোটাছুটি করে। তাকে নিয়েই চিন্তা। কখন যে ফুটপাত ছেড়ে পথে নেমে পড়বে আর গাড়ি চাপা পড়বে তারই বা ঠিক কি! ননীবালার মতই সন্ধ্যাবেলায় চাল-ডাল ফুটিয়ে নিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে হয়। সন্ধ্যার আগে একবার যেতে হয় হাসপাতালে ননীবালার খবর নিতে। দু'দিন পরেই খবর পেল ননীবালার কোলে এসেছে একটা মেয়ে।

তিনদিন পর ননীবালা ফিরে এল মেয়ে কোলে করে।

রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একটা পেট বৃদ্ধি পেল।

ননীবালার কোন বিকার নেই। আগেও যেমন নীরবে মেনে নিয়েছিল

ভাগ্যকে এবারও তেমনি নীরবে ভাগ্যকে মেনে নিল। একবার রাজকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, দিদিমণিরা বলছিল আর যেন হাসপাতালে আসতে না হয়। আর যেন ছেলে-মেয়ে না হয়।

ওসব ভগবানের দয়া। আমাদের ভাবনা শুধু কি করে পেট চলবে। বলেই রাজকুমার আবার বলল, একটা ওষুধ লিখে দিয়েছে ডাক্তার, সেই কাগজটা কোথায় রেখেছিস, দে।

ওষুধ কিনতে হবে না।

কেন ?

পেটে ভাত পড়লে আর ওষুধ খেতে হবে না। তুই টাকাটা রেখে দে।

কোথায় টাকা দেখলি তুই ?

টাকা না হলে ওষুধ আনবি কি করে ?

দু'দিন উপোস দেব। তাতেই ওষুধের দাম পুষিয়ে যাবে। দে কাগজ।

না। যখন দরকার হবে তখন দেব। এখন নয়।

রাজকুমার আর কথা বাড়াল না। বেরিয়ে পড়ল কাজের খোঁজে।

॥ দুই ॥

অসুবিধা সৃষ্টি করল রঘুয়া। বিহারের গয়া জেলা থেকে এসেছে সপরিবারে। হাওড়া ব্রিজ থেকে গড়াতে গড়াতে বৌবাজারে পেঁছে গেছে ক'দিন আগে। তিনহাত জমিদারীর দখল না পেয়ে এগোতে এগোতে একেবারে কোলেবাজারের সামনে। এখানেও জমিদারীর দখল পেতে কম হেনেস্তা হতে হয়নি।

রাজকুমার নিজে ভুক্তভোগী, রঘুয়ার অসহায় অবস্থা বুঝল। কেমন সহানুভূতি জাগল তার মনে। তাকে ডেকে এনে পাশে বসিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা কর। রাতের জায়গা ঠিক মিলবে।

রঘুয়া ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, ক্যাইসে।

রাজকুমার চটে গিয়ে বলল, তোরা বাপকা মাথাসে। বললাম, জায়গা হবে। তার নানা কৈফিয়ত দাও। ট্যাঁক মে পয়সা হ্যায় ? তাহলে চুপসে থাকো! রাতের বেলায় ফেরিওলারা ঘরে ফিরবে, শোবার জায়গা পাবি। পাড়ার মস্তান লোককো কুছু কুছু দিতে হোগা। বুঝলি ?

রঘুয়া কি বুঝল তা ওর সৃষ্টিকর্তাই জানে। রাজকুমারের সংসারের পাশে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বৌ-ছেলে-মেয়েকে বসিয়ে বের হল কাজের ধান্দায়।

দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে রঘুয়া। চৌকা-বর্তনকা কাম খুঁজতে বের হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে।

রঘুয়া সকাল সকাল ফিরেছিল সেদিন।

রাজকুমার জানতে চাইল তার নাম।

রঘুয়া। রঘুয়া রবিদাস।

দেশ ছেড়ে ইঁহা কি জন্য আয়া?

পেট চলে না। সবাই বলল, বংগাল যা, কলকাত্তা যা। কলকাত্তায় মুটিয়া লোগ ভি পেট ভর্তি খেতে পায়। ঠেলার পিছারি করলেও পয়সা। রিক্সা পেলে তো রাজা আদমি। তোর কষ্ট আর থাকবে না।

রাজকুমারও একই ধান্দার লোক। বাদার দুর্গম অঞ্চল থেকে পেটের জ্বালায় ছুটে এসেছে কলকাতায়। ঘর বেঁধেছে ফুটপাতে।

তাই বুঝি নিজের মুলুক ছেড়ে এসেছিস?

রঘুয়া খেদের সঙ্গে বলল, হামার তো জমিন নেই, ক্ষেতিবাড়ি নেই। রইস আদমির ক্ষেতে কাম করতাম। সে কামও জোটে না। দু'চার মাহিনার কাম জোটে লেকিন তাতে ভুখ যায় না। পুরো যখন কাম থাকলে পেটের ভাত ভি জুটতো।

রাজকুমার বলল, তুমি একাই বুঝি বউ ছেলে নিয়ে এসেছ?

নেহি, নেহি। হাজার হাজার আদমি ছুটছে কলকাতায় পেটের ধান্দায়। মুলুক তো গরীবকো নেহি। রহিস আদমীর মুলুক। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ রাজপুত, কেউ যাদব, কেউ ভূমিহার। সব জমিনের মালিক ই লোক। ওদের কিরপা আমাদের জান বাঁচায়, আবার উ লোক গোস্সা হলে জান ইজ্জত সব বরবাদ!

এর আগে তুমি কলকাতায় এসেছ কি?

নেহি, লেকিন আসানসুলমে অনেক দফে এসেছি, খাদান মে কাম করেছি। সেও ভি জান-ইজ্জত বরবাদের জায়গা। হামারা গাঁওমে তিন সালসে রবিদাস মহল্লার ষোল আদমি আউর আওরতকো কোতল করেছে রহিস আদমিরা। আঠারো মোকানমে আগ লাগিয়েছে, বহু-বেটির ইজ্জত লুটেছে শয়তানলোক।

রাজকুমার অনেকক্ষণ রঘুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। আমার বাবার চাষের জমি ছিল। সামান্য কয়েক বিঘা। এখন এক ছটাক জমি নেই। একটা মাটির ঘরের খড়ের চালা আছে, তাও বোধহয় থাকবে না। রুটিরুজির জন্য ফুটপাতে এসে বসেছি, সংসার পেতেছি। উপরে আকাশ, নিচে কি আছে ভগবান জানে। মাঝে মাঝে আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে বলি, দুটো পেটভর্তি ভাত দাও ভগবান। মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবি মরলে মুখে আগুন দিয়ে মাটির তলায় শুতে দিও ভগবান। আর মাঝে এই ফুটপাত। এখানে আমরা থাকি, আমাদের পড়শী হল ঘেউয়া কুকুর, একগাদা বেড়াল। সবারই একই কথা, খেতে চায় সবাই। তবে ভাই কলকাতার ফুটপাতে ঘর বাঁধলে দুটি খেতে পাবে।

এখানে গুন্ডা-মস্তানের জুলুম আছে, পুলিশের লাঠি যে কোন সময় পিঠে পড়বে তবুও জুটবে দু'মুঠো।

রঘুয়া খুশী হল রাজকুমারের কথায়। বেশ খুশী মনে বলল, হামার পেটে দানা না পড়লেও বহু-বেটিকো তো খানা মিলবে।

রাজকুমার রঘুয়ার সঙ্গে একমত। বলল, কপাল, কপাল। কলকাতার রাস্তায় টাকা উড়ে বেড়ায়। যে ধরতে জানে সে-ই রাজা। না জানলে ভুখে মরে।

রঘুয়ার মত গণেশরাম, আকালু, সখিচরণ, আরও অনেকে এসে ধীরে ধীরে ফুটপাত দখল করতে থাকে। এরাই এসেছে বিহারের দেহাত থেকে পেটের জ্বালায়, রহিস আদমির অত্যাচারে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কলকারখানার বেকার শ্রমিকরা। হঠাৎ সব কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে মালিকরা। কলকারখানার শ্রমিকদের শতকরা সত্তরভাগই বাংলার বাইরের মানুষ। এরা আর ফিরে যায়নি মুলুকে। আর যাবেই বা কোথায়? ঘরবাড়ি তো বেদখল হয়েছে অনেককাল আগেই। যাদের কিছু আছে তারা ফিরে গেলেও তাদের রিস্তদারদের রেখে গেছে ফুটপাতে। আশা করছে আবার কলকারখানা চালু হলে ফিরে আসবে। ততদিন রিস্তদাররা ফুটপাথের জমিদারীটা দখল করে রাখবে ভবিষ্যতের আশায়।

ফুটপাতের জমিদারী ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আবার এলাকা হিসাবে ধর্মের ধ্বজাধারীরা নিজ নিজ মাথা গোঁজার স্থান করছে ধর্ম রক্ষা করতে। যতই জমিদারীর হিস্যাদার বৃদ্ধি পায় ততই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে গোটা শহরের ফুটপাথে।

রাজকুমার সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ে।

রাজাবাজাবে রাজমিস্ত্রীদের সাথে জোগানদারের কাজ করে। সবদিন কাজ জোটে না। কিন্তু সকালবেলায় উঠেই রওনা দেয়।

রঘুয়া জানতে চায়, কোথায় যাও দোস্ত। অত বিহানে ভয়ডর করে না।

ভয়ডর করলে চারটে পেট তো চলবে না ভাই। রাজাবাজারে সকালে রাজমিস্ত্রী, রং-এর মিস্ত্রীরা বসে থাকে। তাদের দলে ভিড়তে হয় নইলে কাজ জোটে না। তাই সকাল-সকাল গিয়ে মিস্ত্রীদের পাশে বসে পড়ি।

রঘুয়াও পেটের ধান্দায় বের হয়।

বাজারে বাজারে ঘোরে ঝুড়ি মাথায় করে। যারা বেশি মাল কেনে তাদের প্রয়োজন হয় মুটিয়া। মোট বয়ে যা পায় সারাদিনে তা দিয়েই পেট চলে যায়।

রঘুয়া বড়ই হিসাবী।

তার বউও কম নয়। রোজকার যা উপার্জন তা থেকে কিছু কিছু লুকিয়ে রাখে তার কাঁচুলির ভেতর।

একদিন রাজকুমার ফিরে এসে বলল, আজকাল কাজ পাওয়া বড়ই কঠিন।

কেন? প্রশ্ন করে ননীবালা।

পাশেই বসেছিল রঘুয়া। আধপোড়া বিড়িতে আগুন দিয়ে একগাল ধুঁয়ো ছেড়ে ননীবালার গলায় গলা মিলিয়ে বলল, কাহে?

রাজকুমার বলল, রাজাবাজারে নতুন নতুন লোক আসছে। আসছে বাংলাদেশ থেকে। সবাই বলছে ওরা বিহারী মুসলমান। ওদের ভাই বেরাদারা এদেশে অনেক আছে। তাদের ঘরেই ওরা থাকে, আর দেশী জোগানদারকে হটিয়ে ওরা কাজ করছে, মজুরীও কম নিচ্ছে। আমাদের মত যারা জোগানদার তারা কাজ পাচ্ছে না।

তাজ্জব কি বাত। তা হবে। ওরা উর্দুওলা। উর্দুওলারা ওদের কাজ দেয়। আমাদের কাজ দেবে কেন। বলেই রঘুয়া হাত থেকে পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইল। ননীবালাও নিশ্চুপ। তার ছেলে-মেয়ে তখন ঘুমিয়ে। ননীবালা বোধহয় আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের দরজায় আকুতি জানাচ্ছিল।

রঘুয়া আবার বলল, হামার গাঁয়ের করিম মোল্লার সঙ্গে মুলাকাত হয়ে গেল। বিশ সাল বাদ মোলাকাত।

রাজকুমার বলল, করিম মোল্লা বুঝি তোমার মত রহিস আদমীর জুলুমে ঘর ছেড়ে এসেছে?

সিয়ারাম, সিয়ারাম, তা কেন হতে যাবে। উলোক পাকিস্তান মে গিয়া। বিশ সাল আগে জমিন উমিন বেচকে উলোগ পাকিস্তান গেল। হিন্দুদের জমিন উমিন জোর জবরদস্তি করকে দখল নিয়ে মৌজসে ছিল। লেকিন পাকিস্তান তো রহল না। বাংলাদেশ জব হো গেইলো তব বংগালীরা ভাগা দিল। বাংলাদেশের বংগালীরা বহুত মারপিট করছে। ভাগ্‌কে আয়া, করিব দশহাজার গার্ডেন রিচমে ঢুকেছে।

তাজ্জব কথা। এত লোক কি করে এল?

ওহি তো সোচতা। বর্ডারমে গর্দান পাশপোর্ট মিলতা হ্যায়।

সে আবার কি?

হিন্দুস্তানকে পুলিশ শ'দোশো রুপিয়া, বংগালী পুলিশকো শ'দোশো রুপিয়া দেয়। বংগালী পুলিশ গর্দান পাকড়কে ধাক্‌লা দেতা আর হিন্দুস্তানকা পুলিশ টাকা রুপিয়া নিয়ে অন্দরমে ঘুষ দেতা হ্যায়। বুঝল ভেইয়া।

হুঁ। রাজকুমার ভাবছিল। গর্দান পাশপোর্ট আজব চিজ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে ওরা?

চোরাই মালের কারবার, করিম বলল, আমরা ভাগে কাম করি। জাহাজসে মাল নামবে নৌকায়, চোরাবাজারে মজুত হবে। তারপর বাজারে নিয়ে যাবে। আমরা এই কাম করছি, তুই করবি রঘুয়া? বললাম, ডর লাগে

ভাই। পারব না। বুঝলি রাজকুমার, উলোক পাকিস্তানী। বিশোয়াস করলে জান যাবে।

রাজকুমারের মাথা কেমন চক্কর খেয়ে গেল। বলল, ভালই করেছ ভাই।

করিম বলেছিল, ডর কিসের। হর রোজ হামি লোক নৌকা নিয়ে বসে থাকি। জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে কথা হয়। হুক লাগাই, পেটি টানকে টানকে পানিমে গিরাই, তারপর তুলে নিয়ে গুদামে পেঁাছে দেই। হররোজ এক এক পেটির জন্য শ' রুপেয়া। ভাগাভাগি করলে কমসে কম পঁচাশ রুপিয়া মিলছে। তুই ডরপো আদমি। বললাম, ঠিক ভাই। জরু-বিবি নিয়ে ঘর করি, কোন হাঙ্গামা হলে পুলিশ তো রেয়াত করবে না। হাজতমে লে জায়গা।

সন্ধ্যার পর উনুনে আগুন দিয়ে ননীবালা চাল সেদ্ধ করেছে। ফুটপাত একটু হাল্কা হতেই ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দিল। তাদের কাছে টেনে নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।

রঘুয়ার বউ লছমনিয়া সন্ধ্যাবেলায় রুটি সেঁকছিল। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে বসেছে। ফুটপাতের জমিদারীতে রসুইখানা তৈরি হয়েছে তিনখানা কুড়িয়ে আনা ভাঙা ইঁট দিয়ে। করাত কলের সামনে ভোর বেলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আবর্জনার সঙ্গে কাঠের যে সব কুচি ফেলে দেয় তা কুড়িয়ে আনে। জ্বালানীর জন্য আর কোথাও যেতে হয় না। কেরাসিন টিনের একটা টুকরো সংগ্রহ করেছে ময়লার গাদা থেকে। সেটাই তার তাওয়া। চুল্লায় টিনের টুকরো রেখে আটার ডেলা হাতে থাবরে রুটি তৈরি করে সেঁকছে।

দিনের বেলায় কুড়িয়ে আনা আনাজ পরিষ্কার করে নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছে। ছেলেমেয়েরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যখন রুটি সেঁকা শেষ হবে তখন তাদের হাতে তুলে দেবে রুটি তরকারী। ছেলেমেয়েরাও অপেক্ষা করছে। কারও মুখে কোন শব্দ নেই।

রুটি সেঁকা শেষ করে লছমনিয়া হাঁক দিল এই ঘুরঘুরিয়া, বিন্দিয়া, মুন্না জলদি আ, খানা খালে।

ছেলেমেয়েরা ডাক শোনামাত্র কুড়িয়ে আনা কাগজের একটা টুকরো হাতে করে একে একে সবাই হাজির হল।

লছমনিয়া সবার হাতে আধখানা রুটি আর তরকারী তুলে দিল।

রাত ন'টা না বাজতেই ননীবালা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুমিয়েছে। নিকট প্রতিবেশী রঘুয়ার ছেলেমেয়েরা খাওয়া শেষ করতেই লছমনিয়া তাদের জন্য চট পেতে শুতে দিয়ে নিজেও খেতে বসল। রঘুয়া আর রাজকুমার বসে বিড়ি টানছে তখন।

লছমনিয়া রুটি আর ভাজি রঘুয়ার সামনে রেখে বলল, খা লে।

রাজকুমারের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

উঠে গিয়ে বসল ননীবালার পাশে।

শুতে শুতে অনেক রাত হবে। সব দোকানের আর বাড়ির আলো নিভবে, লোক চলাচল বন্ধ হবে, কাছেই কোলেবাজার। বাজারের বেচাকেনা আরম্ভ হয় শেষ রাত থেকে তাই শোবার সময় তাদের বরাদ্দ রাত বারটা থেকে দুটো আড়াইটে। সেই সময়ের অপেক্ষা করে বসে থাকে রাজকুমার, রঘুয়া আর ফুটপাতের জমিদারদের পুরুষরা। মহিলারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আগেই শুয়ে পড়ে।

রাত শেষ হবার আগেই একটা মেয়ে ফুটপাতের সম্মুখ দিয়ে বার বার হাঁটাচলা করে। একেবারে উলঙ্গ না হলেও ঊর্ধাঙ্গে কোন আবরণ তার থাকে না কোন দিন। সবাই ওকে চেনে। পাশের গলিতে থাকে, কোন গেরস্ত বাড়ির যুবতী। মাথার গন্ডগোল বোধহয় জন্মাবধি। মেয়েটা এলেই সবাই জানে রাত শেষ হতে আর দেরি নেই।

রাজকুমার কয়েক বছর বাস করছে তার জমিদারীতে। আগুনে পোড়া লোক। সমাজবিরোধী আর পুলিশকে ট্যাকস্ দিতে অভ্যস্ত। গোটা কলকাতার ফুটপাত হল সমাজবিরোধী ও পুলিশের লাখেরাজ জমিদারী। আর জমিদারীর বাসিন্দারা হল পত্তনিদার! পত্তনিদারদের কারও মাসিক বন্দোবস্ত, কারও রোজকার রোজ। পত্তনিদাররাও জমিদার। তারা দরপত্তনিদারদের তিনহাত জমি ছেড়ে দেয় নগদ কড়ি পেলে।

মূল জমিদারদের নায়েব গোমস্তা দরকার হয় না। ট্যাকস্ খাজনা আদায় করে দালালরা। শালিয়ানা মালগুজারির হাঙ্গামা নেই। নগদ কড়ি ভাগা-ভাগি হয়। সমাজবিরোধীরা যায় চোলাইয়ের আড্ডায়, যারা নেতৃস্থানীয় 'তাদের পকেটের কড়ি ব্যয় হয় রেডলাইট এরিয়াতে। যারা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তারা দলবদ্ধ হয়ে সুযোগ বুঝে ফুটপাতের জমিদারদের সেয়ানা মেয়ে, এমন কি স্বামী-স্ত্রী শুয়ে থাকলে ভোজালি দেখিয়ে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে যায় পাশের অন্ধকার গলিতে। তারপরের কথা কাউকে বলতে হয় না। পর পর কয়েকজন ধর্ষণ করে যখন মেয়েটাকে ছেড়ে দেয় তখন তার চলার ক্ষমতা আর থাকে না।

অভিযোগ করার সুযোগ তাদের নেই, কেউ সাহস করে থানায় গেলে তাদের কথা শোনার মত ধৈর্যও থাকে না বাবুদের। সোজাসুজি হাঁকিয়ে দেয়। এই সব সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের যোগ থাকে তাই সবাই নীরবে সহ্য করে।

জমিদারী রক্ষার তাগিদে নজরানা দিতে হয়। রাজকুমার তার তিনহাত জমিদারীতে বাস করতে বিনা রসিদে খাজনা ট্যাক্স দিয়ে আসছে। প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। অন্য কারো এ ক্ষমতা আছে তা জানেনা কেউ-ই।

এরপর আছে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ চাঁদার হাঙ্গামা। দুর্গা-পুজোটা কোনক্রমে কাটলেও কালীপুজোর চাঁদার হেপা পোয়াতে অস্থির হয়ে ওঠে সবাই।

মস্তান তথা দেবীর অকুণ্ঠ আগমার্কা ভক্তরা চাঁদার যে অঙ্ক বলবে তা দিতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে। না দিলে সমূহ বিপদ। অক্ষমতার যুক্তি ওদের আদালতে গ্রাহ্য নয়।

সেদিন রঘুয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল, চোরাই মাল তোমার করিম মোল্লারা কোথায় বিক্রি করে? পুলিশে পাকড়াও করে না?

রঘুয়া বলল, ধরমতল্লা আর ময়দানে ওদের দোকান ছে।

পুলিশ জানে? মাল আটক করে না?

করে। মাসে নাকি বিশ হাজার রুপেয়া পুলিশকে দিতে হয়। যদি টাকা দিতে না পারে তখন আটক করে। দোকান পিছু পঞ্চাশ টাকা। কভি কভি বেশি দিতে হয়। থানার বড়বাবুর দোঠো বেটির সাদী হল, তাতে দু'লাখ রুপেয়া পুরো উশুল দিতে হয়েছে।

বল কি ভেইয়া! দু'লাখ! কে দিল?

হাঁ ভাই। চোরাবাজারে যে মাল আসে তার দাম রুপেয়া মে পনদ্রহ পয়সা। বিক্রি পুরা রুপেয়া। বাকি পয়সার ভাগ পায় দালাল, দোকানদার আর পুলিশ আউর মস্তান। দো লাখ রুপেয়া তো কুছু নেহি।

রাজকুমার গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। রঘুয়া ভাবল রাজকুমার তার কথা বিশ্বাস করছে না। তাই জোর দিয়ে বলল, তুহার মত আমার ভি বিশোয়াস ছিল না। লেকিন করিমের জুড়িদার ভি একই কথা বলল। আর দুকানদার লোক হল ইউনিয়নকা মেম্বার। ইউনিয়ন চালায় পার্টি। পুলিশ পাকড়াও করলেই পার্টিবাজি আরম্ভ হয়। পুলিশ দেখছে তাদের জেব্ ভর্তি হচ্ছে, লিডারলোক মৌজসে আছে, মস্তানলোক রুপেয়া উশুল করছে। তাই পুলিশ কোন হাঙ্গামা করে না। করলে নোকরি ছুটে যেতেও তো পারে। ওরাই ফুটের রাজা। রাজাকো সিপাই চাহি, হাতিয়ার চাহি। সব কুছু ওদের ছে।

হঠাৎ রঘুয়া বলল, ছোড় ওসব বাত। বাজার ঘুমকে আসছি।

রাজকুমারও বেরিয়ে পড়ল কাজের ধান্দায়।

রঘুয়া বের হল রিকসা নিয়ে।

রাতের বেলায় রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল, কত হল?

বাইশ রুপেয়া। রিকসাকা মালিকের পাঁচ, হামার সতরা রুপেয়া। তোমার কত হল?

আজ কাম জোটেনি। এক পয়সাও হয়নি। পুলিশ ধরল, লাইসেন্স চাইল। দেখাতে পারলাম না। মালিকের মাত্র তিনটে গাড়ির লাইসেন্স আছে, আর গাড়ি চলে ষোলটা। - আমার গাড়ির কোন লাইসেন্স ছিল না।

পুলিশ ধরল। সারাদিন হাজতে আটক থাকলাম।

তারপর ?

সন্ধ্যা পর্যন্ত মালিক গাড়ি ফেরৎ না পেয়ে থানায় খুঁজতে এল। জামিন পেলাম।

মালিককে বললে না কেন ?

অনেকবার বলেছি। মালিক তো সবই জানে। মালিক হল দক্ষিণের কোন থানার হাওলাদার। গাড়ি কাল ছুট করে নিয়ে আসবে। আমার রুটিরোজগার গেল, বিনা কসুরে হাজতে রইলাম সারাটা দিন। কপাল ভাই, কপাল! ঘর ছাড়লাম পেটের জ্বালায়। কলকাতার ফুটপাতে না ভরল পেট অথচ জাত গেল। ভগবান ভরসা।

রাজকুমার গালে হাত দিয়ে বসল।

ননীবালা তখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। দশ পয়সা করে দুটো ঠোং-আতে করে মুড়ি এনে দিয়েছে তাদের হাতে। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েদের কাড়াকাড়ি চলছে।

ননীবালা রাজকুমারের কাছে এসে বসল।

মুখ তুলে একবার তাকিয়ে রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ননীবালা বুঝল কোথাও কোন অসুবিধা দেখা দেওয়াতে রাজকুমার দম ধরে বসে আছে। তবুও জিজ্ঞেস করল, কিছু হল ?

না।

সারাদিন ছিলে কোথায় ?

থানার হাজতে।

ডুকরে উঠল ননীবালা।

রাজকুমার কোন কথা না বলে চুপ করেই বসেছিল।

রঘুয়া ননীবালাকে জিজ্ঞেস করল, বালবাচ্চাকো খিলায় গা নেহি ?

পয়সা কোথায় ? দু'কেজি চাল, আনাজ কেনার মত কড়ি তো নেই।

রঘুয়া গেঁজ থেকে সাতটা টাকা বের করে বলল, এই নাও ভাই কুমার। চাউল-উল মোলকে আন। বালবাচ্চা রামজিকা দান, ও-লোগকো ভুখে রাখবে না।

রাজকুমার মেহনত করে খায়। কারও দান কখনও নেয় না। ভিক্ষা তো দূরের কথা। সে হাত পাততে দ্বিধাবোধ করছিল। রাজকুমার তখনও চুপ করে বসেছিল। রঘুয়া বুঝল। বলল, আরে সরম কিস্‌কা। উধার, কর্জা। যব রুপেয়া হোবে ফেরৎ দিও। দেখ ভাইয়া, পিছলা সালমে তুমি হামাকে ফুটপাতমে জাগা বনা দেয়া। আবি হামার তো কুছু কাম করনা হ্যায়।

ননীবালা কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে রান্নার জোগাড় করেছিল। অপেক্ষা করছিল রাজকুমারের। রোজই রাজকুমার আসে চাল, আনাজ, নুনতেল নিয়ে।

আজ এসেছে খালি হাতে। চাল আর ডাল হলেই ননীবালা ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে।

ছেলেমেয়েরা যে সব আনাজ কুড়িয়ে এনেছে তার সঙ্গে আধ কেজি চাল আর একশ' গ্রাম ডাল দিতে পারলেই ছেলেমেয়েদের রাজভোগ হতে পারে। চালের ও ডালের অভাবে রাজার ভোগটা তখনও হয়ে ওঠেনি। রাজকুমারের ট্যাঁক খালি, সঞ্চয় বলতে যা কিছু কাঁচা পয়সা ছিল তাও ছেলেমেয়েদের জল-খাবার মেটাতেই শেষ হয়েছে। ননীবালার চোখ ছাপিয়ে জল নামল, কোন কথা বলল না।

রাজকুমারের মনের কথা তার নিস্পৃহতার মাঝ দিয়ে ফুটে উঠেছিল! রঘুয়া বুঝেছিল কোনক্রমেই রাজকুমারকে হাত পাততে বাধ্য করা সম্ভব নয়। তাই বেশ মোলায়েম সুরে ননীবালাকে বলল, ভৌজি। হামার তরফ আও। ভাইয়া তো কর্জা ভি নিতে চায় না। তোমার হাতেই দিচ্ছি সাতটা রুপেয়া। কিন্তু ফেরৎ নেব আট টাকা। এক রুপেয়া সুদ। সমঝি। এ রুপেয়া খয়রাত নেহি। সমঝা?

ননীবালা অবাক হয়ে রঘুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন বলতে চাইছিল। রঘুয়া বাধা দিয়ে বলল, কুছু কথা নাহি। রুপেয়া লেও, বাল-বাচ্চাদের খিলাও।

ননীবালা কোন কিছু বলার আগেই তার হাতে সাতটা টাকা গুঁজে দিয়ে হেসে উঠল রঘুয়া। বলল, সরম কা বাত নাহি। তুমি তো হামারই ভৌজি!

রাজকুমার গুম হয়ে বসেছিল। কোন কথা না বলে ননীবালা সওদা করতে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোঁচর ভর্তি চাল-ডাল নিয়ে যখন ফিরে এল তখনও রাজকুমার চুপ করেই বসেছিল। ছেলেমেয়েরা ঘুমের চোখে মিটি মিটি চেয়ে দেখছিল। বোধহয় রাজকুমার তার সন্তানদের বুভুক্ষু চেহারাটা সহ্য করতে পারছিল না। নিঃশব্দে যখন সে উঠে গেল তখন ননীবালা তাকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ তার নজর পড়ল, গাড়িবারান্দার অধিবাসী সবাই থাকলেও রাজকুমার নেই।

ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তোর বাবা কোথায় গেল?

অমরচাঁদ তার কচি হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, উ যে।

ননীবালা রান্না শেষ করে ডাকল রাজকুমারকে।

রাজকুমার একটা লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে বিড়ি টানছিল। ননীবালার ডাকে সারা না দেওয়াতে ননীবালা উঠে এসে ধাক্কা দিয়ে বলল, চল।

নাঃ।

তুই রাগ করেছিস?

রাজকুমার উত্তর দিতে পারল না। কার ওপর রাগ করবে সে। অক্ষমতার ব্যথা তার নিজস্ব। তাকে বড় করে দেখাও যেমন যায় না, তেমনি নিজেকে

ক্ষমাও করা যায় না। সারাদিন হাজতে থেকেছে, খেতেও পায়নি। ট্যাকে যা ছিল তাও পুলিশ কেড়ে নিয়েছে। দেহটাও ঝিম্ ঝিম্ করছিল। মনটা যে কেমন ছিল তা সে নিজেও জানে না। তবুও তার মনের অবস্থা কিছুটা বদলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি চাই বল ?

কিছুই না। খেতে চল।

তুই কেন ওই খোট্টার কাছ থেকে কর্জা নিলি ?

কর্জা তো করতেই হত। রঘুয়া নিজেই দিল। এতে দোষ কোথায়। তুই শোধ করে দিবি। দরকার হলে রাজা বাদশাও কর্জা করে। তোর চোদ্দ পুরুষের কর্জা তো শোধ করছিস, এটাও করবি।

রাজকুমার অবাক হয়ে ননীবালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই এসব কথা শিখলি কি করে ?

শিখতে হয় না, দেখলে শুনলেই শেখা যায়। এটা তো অজ গাঁ নয়। কলকাতা শহর। কত মানুষ কত কথা বলে, শুনতে শুনতে শিখেছি। নে, চল এবার খেয়ে নে। ছেলেমেয়েরা বসে আছে না খেয়ে। অনেক রাত হল।

রাজকুমার কথা না বাড়িয়ে ননীবালার পেছন পেছন এসে বসল তার জমিদারীতে।

চটা ওঠা এনামেলের বাটিতে ছেলেমেয়েকে খেতে দিয়ে একটা সান্‌কিতে তাদের খাবার ঢেলে নিয়ে দুজনে একই সঙ্গে খেতে আরম্ভ করল।

খেতে খেতে ননীবালা বলল, আমাদের দামিনী এসেছিল সকালে। সে বলল!

থামলি কেন ? কি বলল ?

বলল, তার সোয়ামি পালিয়েছে। খুব কষ্ট। বাবুদের বাড়িতে বাসন মেজে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে।

উপায় কি ?

তাতো ঠিক। তবুও তো গতর খাটিয়ে খাচ্ছে।

তা বোধহয় সহ্য হবে না। ওর মতলব আলাদা। পীরডাঙ্গার আনোয়ার তাকে বলছিল।

কি বলছিল ?

দামু, তুই আর কেন কষ্ট করিস। আমি নারকেলডাঙ্গায় ঘর পেয়েছি। তুই সেখানে থাকবি। বেশ খেটেখুটে খাওয়াব তোকে। আর কেন ফুটে থেকে শুকিয়ে মরবি।

দামিনী কি বলেছে ?

সে ভাবছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, কি করব বলত ? আমি বললাম, তোর বুঝি একা থাকার মন নেই ? দামিনী বলল, একা থাকারই ইচ্ছা কিন্তু

রাতের বেলায় বড়ই ভয় করে। দু'দিন গুন্ডারা টানাটানি করেছে। তার চেয়ে একজন পুরুষের হেপাজতে থাকলে ইজ্জতটা তো থাকবে।

তুই কি বললি ?

বললাম, কারও তো ঘর করতে হবে। আনোয়ার যখন আদর করে ডাকছে তখন ওর ঘরে গিয়েই ওঠ।

এই কথা বললি ? আশ্চর্য মেয়েমানুষ, ইজ্জত রাখতে ধর্ম নষ্ট করতে বললি !

খারাপ তো কিছু নয়। ফুটের মানুষ, তাদের আবার জাতধর্ম কি ! তাদের পেট থাকে। পেট তাদের জাত, পেট তাদের ধর্ম যেমন করে হোক তা ভর্তি করতে তো হবে। বরং ওর ঘরে থাকলে কেউ আর রাতের বেলায় টানা-টানি করবে না।

তাও ঠিক। ওপরের পেটটা ভর্তি করতে নিচের পেটটা তো ভর্তি হবে। তারপর খোকাখুকু এলেই আনোয়ার যে থাকবে তার কি কিছু ঠিক আছে !

এখন তো বাঁচবে। শেষে কি হবে কে জানে। এই তো সাগরীর মরদটা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেও আবার নাকি আরেকটা ছুঁড়ি ধরেছে। সাগরীও মোহনের কোঁচর চেপে ধরেছে। মোহনের বউ দুটো মে য় রেখে কোথায় যে গেছে তা কেউ জানেনা। সাগরী সতীনের মেয়ে টানছে। নিজে তো বাঁজা। এমন তো হামেশাই হয়।

রাজকুমার ননীবালার যুক্তি মেনে নিতে পারল না। খাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে উঠে পড়ল। টিউবওয়েলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটা বিড়ি ধরাল।

ননীবালা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কখন যে রাজকুমার এসে তার পাশে শুয়েছিল তা টেরও পায়নি।

সকালবেলায় কাজে বের হবার সময় ননীবালার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলল কালকের কিছু আছে কি ? দশটা পয়সা দে।

ননীবালার কাছে তখনও দুটো টাকা ছিল। একটা দিয়ে বলল, রাস্তায় চা রুটি খেয়ে নিস ! আমি ছেলেমেয়েকে দেখব। ভাবিস না। আজ কাজ ঠিকই পাবি। একটু সকাল সকাল আসিস।

রাজকুমার টাকা ট্যাকে গুঁজে বেরিয়ে পড়ল মহাজনের রিক্সা খুঁজতে।

সকালবেলায় পুরানো মালিকের আড্ডায় গিয়ে শুনল তার রিক্সা তখনও থানায় জমা আছে। মালিক রাজেন ঝা কলকাতা পুলিশের হাওলদার। নতুন বড়বাবু বড় কড়া। সাহস করে রিক্সা ফেরত চাইতে যায়নি। রাজেন ঝা পাকা লোক। রাজকুমারকে হাতছাড়া করতে চায় না। বলল, দো চার রোজ বাদ তুহার কাম মিলেগা। তু সাঁফ মালিককো পাশ যা। হামার বাত বোলকে রিক্সা মাঙ্ দো চার রোজ এ্যাসা চালিয়ে লে। হামি জরুর কাম দিবে। হামি ভি পুলিশ !

সফি মালিকের আড্ডা মসজিদের পেছনে। সেখানে যাবার পথেই ঝোপা-ডাঙ্গার জমিদারদের আড্ডা। সেই আড্ডায় দামিনী থাকে। সকালবেলায় বাবুদের বাড়ির বাসন মেজে দামিনী ফিরে এসেছে। ভাবল তাকে একবার দেখে যাবে।

পথে যেতে যেতে ভাবছিল দামিনীর মনের কথাটা তো ননীবালার মনের কথা নয়? নিজের মনের কথা ঘুরিয়ে বলেনি তো! অনেক দিন ফুটে থেকে থেকে সে-ও বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছে। মাথা ঢাকার চালা একটা পেলে সেও বোধহয় ছুটে বের হবে। কি জানি। ননীবালাই তো বলল, পেট। জাতধর্ম আমাদের নেই। পেট আমাদের ধর্ম। ঠিকই বলেছে। কি জানি! কাউকেই ভরসা করা যায় না, বিশ্বাস নেই মেয়ে জাতটাকে। ওরা পেট ভর্তি করতে সব কিছু মেনে নিতে পারে, মানিয়ে বোঝাপড়াও করে থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে পার্কের উত্তর দিকে আসতেই দামিনীর আড্ডার খোঁজ পেল। জানাশোনা অনেকেই থাকে সেখানে। রাজকুমারকে দেখেই মোড়লগাজির হীরু সরদার বলল, কিরে রাজু, অনেক দিন পর দেখলাম, কাজে বের হোস নি।

রাজকুমার কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।

কেমন আছিস?

ভাল।

তোর বউ কোথায়? এখানেই। বউবাজারের দিকে আছিস। ভাল। কোথায় চললি?

এখানেই এলাম। পুলিশ রিক্সা আটক করেছে। নতুন রিক্সার খোঁজে এসেছি। পুরানো মালিক বলল, সফি মালিকের অনেক রিক্সা আছে।

তা আছে। পাবি কি? বেটা চামার। ওসব খোট্টাদের ভরসা করিস না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চ। পিছারি মারবি। তের টাকা পাবি।

তের টাকা!

কেন? কম হল বুঝি। সামনে ঠেলা টেনে পাই পনের টাকা। তুই তো পিছারি রইবি। একটা খেপ। দুটো ক্ষেপ হলেই ডবল। রাজি?

তা মন্দ নয়।

তাহলে আর দেরি করিস না। ওই আমার মালিকের ঠেলা। চ, কাজে লেগে পড়ি।

একটা খবর করে আসি।

কার খবর?

দামিনীর।

সে কি আজ আছে। বাবুদের বাড়িতে কাজ করত। মাথায় ভূত ঢুকেছে। অনিল বলল, দামু তুই আমার ঘর কর। মাগীর কত দেমাক।

বলল, ফুটে থাকবনি। ফুটে থাকলে সব পয়মাল হয়ে যাবে।

তারপর ?

কাল রাতে গেছে সেই আনোয়ার না জানোয়ারের ঘরে। নারকেলডাঙ্গার বস্তিতে। দামিনীর আর ভরসা নেই। এর আগে আনোয়ার দুটো মাগী তাড়িয়েছে। ওই যে বিশের বউ অবলা। ওর কোলের ছেলেটা তোআনোয়ারের। পোয়াতি হবার পরই তাড়িয়েছে। বিশে ঘর করার মত মেয়েমানুষ পাচ্ছিল না। পেয়ে গেল অবলাকে। হাসপাতাল থেকে খালাস হয়েই বিশের কাছে উঠেছে। বিশে পালছে দুটোকেই। তবে বিশে উপায় করে ভাল। অবলা ভালই আছে ছেলে নিয়ে। এত জেনেও দামিনী কেন গেল ? সবাই মানা করলাম তবুও গেল। ওর কপালে দুঃখ আছে।

দামিনী আমার বউয়ের কাছে কাল সকালে গিয়েছিল। আনোয়ারের কথাও বলেছিল। তা হলে তুই সব জানিস।

সব জানি না। তবে মনে হয়েছিল দামিনী আনোয়ারের ঘরই করবে।

রাজকুমার পকেট থেকে দুটো বিড়ি বের করে হীরুর হাতে একটা দিয়ে বলল, মাচিস আছে তোর কাছে।

আছে। বলেই হীরু দেশলাই বের করে বিড়িতে আগুন দিল।

কয়েকটা সুখটান দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে হীরু জিজ্ঞাসা করল, চা খাবি ?

মন্দ কি! সকালে তো একটা দানাও পড়েনি পেটে।

এতক্ষণ বলিসনি কেন ? চ মণির চায়ের দোকানে।

দোকান বলতে যা বুঝায় তা নয়। ফুটপাতের এক কোণায় মণি উনুন জেবলে চা তৈরি করে। তার খদ্দের প্রায় সবাই ফুটপাতের জমিদার।

দোকানের সামনে একটা বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে হরিয়া, নিধু, সমীর, গণেশ, লেবরু আর সামনে উপু হয়ে বসে রয়েছে নেড়ী নিত্যবালা। মণি ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা দিয়ে আবার জলের গামলাটা উনুনে বসিয়েছে। হীরু জিজ্ঞেস করল, চা হবে ?

মণি উনুনে জোর বাতাস দিচ্ছিল। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে বলল, একটু দেরি আছে। জলটা গরম হয়ে এসেছে।

গণেশের চা খাওয়া শেষ হয়েছে। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল, বইঠো হীরুভাই।

গণেশ মতিহারী জেলার লোক। দশ বছর আগে কলকাতায় এসেছিল। বয়স তখন ছিল পনের ষোল। মোবাইল হোটেলের মালিক। লেবরু ওর কমবাইন্ড হ্যান্ড। রাতের বেলায় লেবরু রসুই করে। দিনের বেলায় ছাতুর ধামা, চাটনি আর পেঁয়াজের থলে হাতে করে ফুটপাতের জমিদারীতে দোকান সাজায়। দুটো টিনের ড্রামে জল তুলে আনে টিউবওয়েল থেকে।

পেতলের থালা আর এ্যালুমিনিয়ামের ঘটিগুলো মেজে সাফ করে।

গণেশ চা খেয়েই লেবরুকে বলল, ক্যারে লেবরু পি লিয়া তো ?

হু, বলেই লেবরু হাতের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়ল। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দুজনেই এগিয়ে গেল নিজেদের ঝুপড়ির দিকে। জায়গা খালি পেয়ে হীরু আর রাজকুমার বেঞ্চে বসল।

নিত্যবালাও উঠে পড়ল। পঁচিশটা পয়সা মণির হাতে দিতেই মণি নিত্য-বালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, পঁচিশ পয়সার দিন আর নেই। পঁয়ত্রিশ দে। সব জিনিস কেমন মাঙ্গা জানিস তো।

অবাক হয়ে নিত্যবালা মণির মুখের কাছে হাত নেড়ে বলল তোর চায়ের দাম রোজই দেখছি মাঙ্গা হচ্ছে। গলা কাটলেই পারিস।

মণি হেসে বলল, কাটারি বানাতে দিয়েছি। তুই ততক্ষণ তোর বর গণেশকে জিজ্ঞেস করে আয়। লেবরু আর নিজের চায়ের দাম সত্তর পয়সা এখুনি দিয়ে গেল। ওর কমে হবে না।

গজর গজর করতে করতে নিত্যবালা আরও পাঁচটা পয়সা এগিয়ে দিতেই মণি খেঁকিয়ে উঠল। এটা কি মাছের বাজার। যা তোর বরের কাছে। তাকে শুধিয়ে আয়।

নিত্যবালাও খেঁকিয়ে উঠে বলল, বর বর করিস না। ওকি আমার সাত পাকের ভাতার। এই নে আর পাঁচটা নয়া পয়সা।

নিত্যবালা হাতের ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে গজ গজ করতে করতে উঠে গেল। নেড়ীও উঠে পড়েছে। তারও চা খাওয়া শেষ। তারা উঠে যেতেই আরেক দঙ্গল মেয়ে এসে বসল দোকানের সামনে।

দেখলি তো হরিয়া নিত্যবালার আক্কেল। মরদটা ঠিক ঠিক পয়সা দেয়। আর'ও নিজের পয়সা দিতেই যত ঝামেলা করে রোজই।

হরিয়া হেসে বলল, ও হল তিনশ টাকার বেগম। গণেশ বলে, হামি নিত্যবালাকে তিন শ রুপেয়ামে মোলেছি। তিন শ টাকা দিয়ে বউ কিনেছে গণেশ, আর নিত্যবালা বলল, আমি কি ওর সাতপাকের বউ। মাগীগুলোর মুখে কিছু আটকায় না।

রাজকুমার চা খেতে খেতে বলল, তোর কাজ কটায় রে হীরু ?

হীরুর চা খাওয়া হয়ে গেছে। হাতের ভাঁড়টা বেঞ্চের নিচে পা দিয়ে রাখতে রাখতে বলল, কাজের কি ঠিক আছে। খদ্দের আসবে। মাল কিনবে। তারপর ঠেলা ডাকবে। তখন দাম করে ঠেলায় মাল তুলবে। আবার রাতের বেলায় মালও ওঠাতে হয়। ভোর রাতে চালান হাতে নিয়ে মাল পৌঁছে দিতে হয়। তুই একটা কাজ কর রাজু। চা খাওয়া তো হয়ে গেছে। তুই ততক্ষণ তোর ডেরায় খবর দিয়ে আয়। কখন ফিরব তার তো ঠিক নেই। আমি মহাজনের গুদামে ঠেলা লাগিয়ে এখানেই থাকব।

রাজকুমার চা খেয়ে ফিরে গেল তার বৌবাজারের ডেরায়।

চাল ডাল আনাজের ব্যবস্থা করে ননীবালার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলল, আমি কাজে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। ভাবিস না যেন।

ননীবালা বলল, সকাল সকাল আসবি। আমার দেহটা জুতসই নয়।

রাজকুমার 'আচ্ছা' বলে না খেয়েই গেল হীরুর কাছে।

রাজকুমারকে দেখেই হীরু হেসে বলল, তোর বরাত ভাল। চ, এবার মাল ওঠাতে হবে।

সেদিন মাল পেঁছে আর ফিরতি ভাড়া পেল না। হীরু রোজই ফিরতি ভাড়া পায়। খালি গাড়ি নিয়ে আসতে হয় না কোন দিন।

সারা দিনে একটা খেপ দিয়ে রাজকুমার বিকেল বেলায় তেরটা টাকা হাতে করে ফিরে এল। কাজটা মেহনতের কিন্তু সারাদিন প্যাসেনজারের জন্য রাস্তায় ধর্ণা দিতে হয় না। দাম দর করতে হয় না। রিকসায় বড় ঝামেলা। ঠেলা ঠেলতে অত ঝামেলা পোহাতে হয় না। হীরুই সব ঠিক করে। ঠেলার মালিকের পাওনা যেমন সে বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই রাজকুমারের প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়। বেশির ভাগ দিনেই আপ-ডাউন ভাড়াতে রোজগারও মন্দ হয় না। প্রায় দিনই ছাব্বিশ টাকা হাতে করে ডেরায় আসে। বাজার পত্তর করে বাকি টাকাটা ননীবালার হাতে তুলে দেয়। পরদিন সকালে বের হবার সময় দুটো টাকা ননীবালার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বলে, রাস্তায় চা খেতে হয়, বিড়ি কিনতে হয়। জানিস তো কত খরচ।

ননীবালা হেসে বলে, আর কিছু?

দূর মাগী, আর কিছু হলে তো তোর পেটের ভাত জুটবে না। ওই তো করিম আর নোদা, সারাদিন কামকাজ করে ডেরায় আসে টলতে টলতে, যা মজুরি পায় তার আট আনাই যায় চোলাইয়ে।

ননীবালা আর কথা বাড়ায় না। গামছাটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে ছেলেমেয়ে সামলাতে থাকে।

এই ভাবে রাজকুমারের দিন কাটে, ভালই কাটে। জমিদারীর ট্যাক্স মেটায় ননীবালা। হঠাৎ মস্তানদের ট্যাকসের রেট বৃদ্ধি পেতেই ননীবালা কিছুতেই রাজি হল না আট আনার জায়গায় পুরো একটা টাকা দিতে। ঝগড়া বেধে গেল একদিন। ননীবালা জোর দিয়ে বলল, যা দিচ্ছি তার চে এক কড়িও বেশি দিতে পারবনি। তোদের পেটে সব ঢোকালে, আমার বেটাবেটির পেটে কি দেব!

ওরাই বা শুনবে কেন? ওদের এটা পেশা। গরীবের পকেট মেরে ওদের মদ মেয়েমানুষের পয়সা তুলতে হয়। পুলিশকে দিতে হয়। আবার পেটেও দিতে হয়। এই জমিদারীর কায়েমী উপার্জনে বাগড়া দিলে শুনবে কেন। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই এই রেওয়াজ বিনা বাধায় চলে আসছে।

ননীবালা বলল, তোদের দিতে দিতে আমরা ফতুর হয়ে গেইছি।

কলকাতায় থাকবি, ঘর ভাড়া দিবি নে, কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিবি নে, তোদের ভালমন্দের নজর রাখি আমরা, একটা টাকা দিবি না কেন?

এক টাকা!

হাঁ, এক টাকা দিতেই হবে, নইলে জায়গা খালি করে দিবি আজই।

মরদটা আসুক। তার সঙ্গেই কথা বলিস। আমার কাছে টাকা থাকে না।

রাতের বেলায় আবার আসব বলিস তোর মরদকে।

ফুটপাতের তিনহাত জমিদারীতে নির্বিঘ্নে দিন কাটাতে পারে না রাজকুমারের মত প্রায় এক লক্ষ নরনারী। যাদের আকার মানুষের প্রকারটা খাবারের দোকানে হা পিত্যেশে বসে থাকা গায়ে লোমওঠা কুকুরের চেয়ে বিশেষ উঁচুস্তরের নয়। কুকুরগুলোকে আঘাত করলে কেঁউ-কেঁউ করে ব্যথা বেদনা জানায়, আর এইসব ফুটপাতের জমিদাররা আঘাত পেলে মুখ বুজে সহ্য করে। বাদ প্রতিবাদ করার সাহসও তাদের থাকে না। সারমেয়কুলের মত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লড়াই যত নিত্যকার ততটা সমাজবিরোধীদের দেওয়া আঘাতে চুপ করে থাকাও নিত্যকার ঘটনা।

রাতের বেলায় রাজকুমার ফিরেই বলল, খেতে দে বউ।

হাতমুখ ধুয়ে আয়।

রাজকুমারের খেয়াল ছিল না। সারাদিন পিছারি ঠেলে তার হাত পায়ের অবস্থা সত্যিই অতি নোংরা হয়েছে কিন্তু এমনই ক্ষুধার তাড়না যে সেদিকে লক্ষ্য করার মত ধৈর্যও তার ছিল না।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বলল, অমর আর বিন্তি তো ঘুমোচ্ছে। ওরা খেয়েছে তো।

হাঁ। বলেই চটাওঠা এনামেলের থালায় ভাত আর তরকারী গুছিয়ে দিয়ে রাজকুমারের সামনে রাখল। বলল, নে খা।

তোর ভাত নিলি না?

পরে খাব। তুই খেয়ে ঘুমো। জানিস, আজ ওই শ্যামলালের দল এসেছিল।

কি বলল?

বলল, এক টাকা করে রোজ দিতে হবে।

রাজকুমারের মুখ ভর্তি ভাত। কিছু বলতে পারল না।

ননীবালা বলল, তের টাকার একটাকা দিলে আমরা খাব কি?

তা তো বটেই। দিতে হবে। তবে কোন কোন দিন তো বেশি রোজগারও হয়। মিটিয়ে দিতে হবে। বিন্তির একটা জামা কিনতে হবে। মেয়েটা খালি গায়ে থাকে। কাল শেয়ালদা বাজারে গিয়ে একটা জামা কিনব। কেমন!

খাওয়া শেষ করে রাজকুমার চট টেনে শুয়ে পড়ল।

ননীবালা থালাবাটি সব ধুয়ে পুঁছে নিজেও খেয়ে নিল। রাত বাড়তে থাকে। অনেক রাত অবধি বসে বসে দেখছিল। দেখছিল কতলোক কত ধান্দায় ঘোরাফেরা করছে বড় রাস্তাটায়। কারও দিকে তাকিয়েও দেখছে না কেউ-ই। ফুটপাতের মানুষগুলো চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে আছে। ওপাশে অবিনাশ আর তার বউ জড়াজড়ি করে শুয়ে, তাদের মাথার কাছে রুজি রোজগারের হাতিয়ার রিক্সাটা দাঁড় করানো। অবিনাশ রিক্সাটা নিজেই কিনেছে। সকালবেলায় অবিনাশের বউ সুন্দরী কল থেকে হাড়ি ভর্তি জল এনে রিক্সা ধুয়ে পরিষ্কার করে। সকালে পান্তা আর আলুসেদ্ধ খেয়ে অবিনাশ বেরিয়ে পড়ে, তখন সুন্দরী যায় পুরানো একটা বস্তা কাঁধে করে পাড়ার ভেতর। ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়। বারটা নাগাদ ফিরে এসে রান্না করে। কোন দিন ছেঁড়া কাগজে বস্তা ভর্তি হয়, কোন দিন অর্ধেক ভর্তি হয় না। বস্তা ভর্তি না হলে আবার পরের দিন বস্তা ভর্তি করতে বের হয়। নিয়মবাধা কাজ, কোন হেরফের হয় না।

সন্ধ্যাবেলায় ছেঁড়া কাগজের খদ্দের আসে। পঁচিশ পয়সা, কখনও তিরিশ পয়সা কে-জি দরে কাগজ কিনে নিয়ে যায়। ক্রেতারা ঠেলা বোঝাই দেয়। সুন্দরী তার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে নিজের শাড়ি কেনে, আর সেই পয়সা থেকেই অবিনাশ রিক্সার কিস্তি শোধ করে।

ননীবালা সংসার করতে চায়। সুন্দরীর মত বস্তা ঘাড়ে করে যেমন বের হয় না তেমনি বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজতেও যায় না। রাজকুমার নিষেধ করেছে।

রাজকুমার বলে, ওসব কাজ তোকে করতে হবেনি। আমাদের ঘরের মেয়ে ঝিয়ের কাজ আর ময়লা কাগজ কুড়োনির কাজ কখনও করেনি।

ননীবালা বলে, তোর বাপঠাকুর্দা তো ফুটে ঘর বাঁধেনি।

ঠিক বলেছিস। দায়ে পড়ে ফুটে এসেছি। তা বলে সব কিছু খোয়াতে তো পারি না। তোর মান সম্মান তো আছে।

ননীবালা বিরক্তির সঙ্গে বলে, ফুটের মানুষের মান সম্মান!

ইচ্ছা থাকলেও ননীবালা সুন্দরীর মত বস্তা ঘাড়ে করে বেরও হয়নি আবার কোনদিন বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজতেও যায় নি। রাজকুমার পছন্দ করে না।

॥ তিন ॥

এই ভাবেই দিন কাটে রাত হয়, রাত কাটে দিন হয়।

সেদিন রাতে ফিরে আসতেই রাজকুমারকে ননীবালা বলল, আজ আবার আশুকে দেখলাম।

রাজকুমার হাতমুখ ধুতে ধুতে বলল, কে আশু?

চিনতি পারলি নি। আমাদের ক্ষেমা পিসির ননদের মেয়ে। বেশ ডাগর হয়েছে, আমি চিনেছি। ও পেথমে চিনতে পারেনি।

আশু মানে ?

আশুবালা, বেশ সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল।

কোথায় ?

ওই সোনারুপোর দোকানগুলোর সামনের ফুটপাতে। আশুর মত আরও বিশ পঁচিশটা মেয়ে নাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কদিন-ই দেখছি।

কিছু বলেনি ?

বললাম, কিরে আশু। চিনতে পারিস ? আশু মাথা নেড়ে বলল, হাঁ। বললাম, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ? ও হাসলে।

ওখানে আর যাসনি বউ।

ননীবালা চিন্তিতভাবে বলল, ভাবছিলাম তোকে শুধোবো। আজ আবার আশুকে দেখে মনে পড়ল। ওরা কারা।

ওরা লাইনের মেয়ে।

নাইন কি ?

সে তুই বুঝবি না। পেটের ধান্দায় ওরা লোক ভুলাতে দাঁড়িয়ে থাকে। খদ্দের পেলে দাম দর করে, তাদের সঙ্গে কোন ডেরায় ওঠে, রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় ফেরে। বুঝলি ? তুই একটা বেকুব।

কি ঘেন্নার কথা !

ধুৎ মাগী ! ওরা পাঁচদিন কলকাতায় থাকে, তারপর গাঁয়ে ফিরে যায়। মা-বাবা জানে ওরা কলকাতায় চাকরি করে। কি চাকরি করে তাতো দেখছিস। ওরা যখন জন্মায়, তখন ওদের বাবা মা ভাবেও না ওরা কি করে বাঁচবে, তারপর গায়ে গতরে বড় হয়ে ছট্‌ফটায়। দালাল জোটে, ওদের টেনে আনে ওই লাইনে কখনও ফুসলিয়ে কখনও স্বেচ্ছায় আসে।

ননীবালা অবাক হয়। রাজকুমার থামতেই বলল, তুই জানলি কি করে ?

সারা শহরটা ঘুরতে হয় আমাকে। মানুষ দেখেই চিনতি পারি। ওরা উল্টো দিকের গলিতে ঘর বাঁধে। সন্ধ্যের পর দোকানপত্তর বন্ধ হলেই ওরা বের হয়। সেজেগুজে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় খদ্দের ধরতে।

পুলিশে ধরবে কোন দিন।

কচু। পুলিশও পয়সা পায় ওদের কাছে। মোটা পয়সা। আবার পুলিশ তো আর বেম্মচারী নয়, তারাও ওদের সঙ্গে ঝুলে পড়ে। বউবাজারের এই রাস্তাটাই গোলমেলে। নয়া সড়কের মাথায় তো রাস্তায় চড়ে বেড়ায় মেয়েরা। তাদের সাজ দেখলে চমকে যাবি। ওপাশে থানা আবার নয়া সড়কের পাশেও থানা। পুলিশ জানে ? খুব জানে, ওসব শুনে কাজ নেই। খেয়েদেয়ে চ শুয়ে পড়ি। কাল আবার ঠেলা নিয়ে হালতুতে যেতে হবে। ডবল পয়সা

ফিরতি ভাড়াও ঠিক করেছে হীরু। এ রকম দশবার দিন কাজ পেলে তোর দুখানা নতুন শাড়িও হবে ছেলেমেয়েদের লজ্জা ঢাকা পড়বে।

চট পেতে শোবার ব্যবস্থা করে খেতে বসল।

বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমেছিল। তখনই ঝিরঝিরে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। আবার বৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় ছেঁড়া প্ল্যাসটিকের কাগজ দিয়ে ছেলেমেয়েকে ঢেকে দিয়ে ননীবালা সবে মাত্র শুয়েছে। রাত তখন অনেকটা। প্রায় মাঝরাত। হঠাৎ প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল।

রাজকুমার ও ননীবালা উঠে বসল। ফুটের সবাই তখন জেগে গেছে।

বৃষ্টির গতি মোটেই ভাল নয়।

এক ঘণ্টার মধ্যে বড় রাস্তা গলি সব ডুবে গেল।

দেখতে দেখতে ভেসে গেল গোটা শহরটা।

রাজকুমার চিন্তিতভাবে বলল, লক্ষণ ভাল নয় রে। বিছানাপাটি গুটিয়ে নে।

ননীবালা ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে রাজকুমারকে বলল, তুই অমরকে নিয়ে দাঁড়া, আমি বিছানাপাটি সব কিছু গুটিয়ে নিচ্ছি।

ছেলেমেয়েকে নিয়ে ননীবালা সামনের পাকাবাড়ির ধাপিতে উঠে বসল। ছেঁড়া প্ল্যাসটিক কাপড় দিয়ে ছেলেমেয়েকে ঢেকে রাখল। বিছানাপাটি হাঁড়ি-কুড়ি গুছিয়ে নিয়ে তার ওপর চেপে বসল ননীবালা। রাজকুমার ঠায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে।

ননীবালা ডেকে বলল, তুই উঠে আয়। ভিজিসনি, সর্দি হবে। আমার পাশে বোস্।

তোরই জায়গা হচ্ছে না।

দুজনে ভাগাভাগি করে বসব। ছেলেমেয়েদের আড়াল করে বসলে ওরা বাঁচবে।

রাজকুমারের ইচ্ছা না থাকলেও রাস্তার জল ক্রমশ বাড়তেই তার হাঁটু অবধি জলের তলায় ঢাকা পড়ল। পরণের লুঙ্গিটা ভিজতেই বাধ্য হয়ে রাজকুমার ননীবালার পাশে গিয়ে বসল।

যেমন বৃষ্টির ধারা তেমনি মেঘের ডাক, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক।

দেশটা বুঝি রসাতলে যাবে রে বউ। এমন বৃষ্টি বাবার কালে দেখিনি।

দেবতা বড়ই নারাজ। আমাদের মত গরীবদেরই কষ্ট। কি ভাবছিস?

কাল ছিল হালতুর ট্রিপ। হবে না। দেবতা আজ থামবে না দেখছি। বস্তাটা তুলে দে। ছেলেমেয়েটাকে ভাল করে ঢেকে দি। শহরে গতর খাটালে ভাত জোটে তবে ঝঞ্ঝাটও কম নয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই যাদের নাই তাদের এই ভাবে পথে পড়ে মরতে হয়। পেট চালাতে হয়রান, তার ওপর দেবতার কোপ! কপাল মন্দ!

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাস্তার আলোগুলো তখন জ্বলছিল। বৃষ্টির জলে আলোগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝেই। পরক্ষণেই আবার রাস্তার জলের ওপর লাইটপোস্টের আলোগুলো চিক্‌ চিক্‌ করছিল। ননীবালা বোধহয় এইগুলো দেখছিল। রাতের বিষন্নতাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল অবিশ্রান্ত এই বৃষ্টি। ননীবালা নিজেকে যতটা না সামলাচ্ছিল তার চেয়ে বেশি সামলাতে হচ্ছিল ছেলেমেয়েকে। অবোধ শিশুদের চোখের ঘুম ছুটে গেছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল আর মাঝে মাঝেই মায়ের কোলে মুখ ঘসছিল।

পাশের রোয়াকে একদল মেয়ে পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরই কোন কচি শিশু মাঝে মাঝেই বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠছিল। অসহায় শিশুর জননী মুখে স্তন তুলে দিয়ে কান্না থামাতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করছিল।

এখানে মাথা গোঁজার জায়গা নেই কারও, বলল ননীবালা।

এখানে অনেক কিছু আছে রে বউ। কলকাতায় সব আছে নেই শুধু মানুষের ভালবাসা। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ মানুষকে ভাল-বাসতে ভুলে গেছে।

হঠাৎ নিভে গেল রাস্তার আলো। ঘুরঘুটি অন্ধকার। বড় বড় বাড়ির দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর রেখা এসে পড়ছিল রাস্তার বদ্ধ জলে। যেটুকু ভরসা ছিল, তাও মুহূর্তে উপে গেল। এই অন্ধকারে পাশের লোকটাকে চেনা যাচ্ছিল না। বিদ্যুতের ঝলকানিতে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল পরিবেশটাকে। শঙ্কিত সবাই, করার কিছু নেই, সবাই নিরুপায়।

ননীবালা বলল, বিহান যে কখন হবে?

ভাবিস না, রাত যখন হয়েছে, বিহানও হবে! শীগ্‌গীরই হবে। কষ্টের রাতগুলো কাটতে বড় সময় নেয়।

ননীবালা আকাশের দিকে তাকিয়ে নতুন দিনের আলোর প্রতীক্ষা করছে।

বৃষ্টিটা কিছু কমেছে। সকালের আলো তখনও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। হয়ত সকাল হয়েছে কিছু কালো মেঘের আচ্ছাদনের তলায় সকালের আলো ঢাকা পড়েছে।

ননীবালা ছেলেমেয়েকে রাজকুমারের হেপাজতে দিয়ে জলে নেমে পড়ল। রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস?

দেখতে যাচ্ছি আমার আর কিছু ওখানে থেকে গেছে কিনা।

হতাশভাবে রাজকুমার বলল, ওকি আর আছে। সব ভেসে গেছে।

তবুও জল ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা করল ননীবালা। জলের রং ঘোরতর কালো। সেই কালো জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার আবর্জনা। জলের তলায় কি আছে তা দেখার কোন উপায় নেই। ননীবালা ছলাৎ ছলাৎ করে জল ছেটাতে ছেটাতে ফিরে এল।

রাজকুমার ফ্যাকাশে মুখ তুলে বলল, আজ আর রুটিরুজি জুটবে না। হালতুর কাজটা পেলে অনেকটা বেঁচে যেতাম।

ননীবালা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আজ কাজ নেই, কাল হবে। জওয়ান মরদ বসে থাকবিনে। কিন্তু আজ পেটে যদি দানা না পড়ে, কালকের জন্য বসে থাকতে পারবি কি ?

জল যে আরও বাড়ছে রে বউ।

চল ইস্টিশানে গিয়ে উঠি। সেখানে ভুঁইটা উঁচু। দেখে শুনে রাতের মত জায়গা পেলে কিছু ফুটিয়ে নিতেও পারব।

তাহলে হাঁড়ি পাতিল সবই নিয়ে যেতে হবে।

তাও হবে। ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু দিতে হবে তো। ইস্টিশনে রুটিও পাওয়া যায়। দশ পয়সা দিলেই বাসি রুটি দেয়।

আজ কাড়াকাড়ি পড়বে। দশ পয়সায় হবেনি।

বিশ পয়সা দিবি। আমার কাছে কিছু আছে। চ, ওখানে গিয়ে উঠি।

ইস্টিশানেও শান্তি নেই। দেখবি কত ঝামেলা। রেলবাবু তাড়াবে, পুলিশ তাড়াবে, জায়গাও পাবি না পা দেবার।

চ, দেখি না কি হয়। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে ওরা দয়া ধর্ম করবে।

সব কিছু নিয়ে রওনা হবার আগেই সামনের রোয়াকে পদ্মগাঁয়ের বেলা লেগেছে কাজিয়া করতে। সকালবেলায় তার সেয়ানা মেয়ে রাধারাণী কোথাও রাত কাটিয়ে সকালবেলায় জল ভেঙ্গে ডেরায় এসেই কাউকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে মায়ের কাছে এসে উঠেছে বড়বাড়ির রোয়াকে।

রাধারাণী কোন কথা না বলে পাঁচটা টাকা আঁচল খুলে বের করে বেলাকে দেখাল। টাকা দেখেই বেলা তিড়বিড়িয়ে উঠল, চিৎকার করে বলল, পাঁচটা টাকার জন্য ধম্মনাশ করে এলিরে হারামজাদী।

রাধারাণী সামনে দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, আয়, তোকে মজা দেখাচ্ছি। তোর মরণ হয় না। বে দিলুম, ঘর করলিনি। ঘর করলে লোকে বলত, ঘরের বউ। ভাতার ছেড়ে এসেছিস কি ধম্মনাশ করতে।

রাধারাণী চুলের মুঠি ছাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, তোরাও ধম্মনাশ করে টাকা নিস। পাঁচটা টাকা বুঝি কম হয়েছে। বলুক তো ফুটের কোন মেয়েটা ধম্মনাশ করে পয়সা কামাই করে না। আমার বাপের সঙ্গে তুইও তো ঘর করিসনি। কার তরে তুই ফুটে পড়ে থাকিস, রাতের বেলায় কার তরে ইস্টিশনে ঘুরে বেড়াস।

সবাই জল ভেঙ্গে ইস্টিশনের দিকে এগোতে থাকে।

বেলার মুখে আগল থাকে না, রাধারাণীরও মুখে আগল নেই। জলের মধ্যে লাফাতে লাফাতে লেদার বউ ছুটে এসে রাধারাণীর মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ কর আদানী। লোকে নিন্দে করবে। এই জলের মধ্যে মারামারি করবি

না কি? ভিড় জমে যাবে।

রাধারাণী ক্ষান্ত হতে চায় না।

ননীবালা ভিড় ঠেলে ততক্ষণ ডাঙ্গায় উঠেছে। রাধারাণীর সামনে এসে বলল, তোর কি আক্কেল বল দিকি। নিজের মায়ের কেচ্ছা করছিস খোলা ময়দানে, তোর মরণ হয় না।

এতক্ষণে বোধ হয় রাধারাণীর হুঁস ফিরে এল। কাঁদতে শুরু করল।

পাঁচটা টাকা বেলার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি চন্নু।

ঝাঁপিয়ে উঠল বেলা। বলল, কোথায় যাবিরে আবাগীর বেটি।

যেখানে পরাণ চায়। চোখ দুটো খোলা আছে, কলকাতা শহরতো পদ্ম গাঁ লয়। তোদের আড্ডায় আর থাকবনি।

ননীবালা রাধারাণীর হাত চেপে ধরে বলল, আগ করিস নি আদানী। মায়ে-ঝিয়ে এমন কাজিয়া হয় তবে মুখ না সামলালে ঘরের কথা পরে জানতে পারে।

স্টেশনের মুশাফিরখানার সিঁড়িতে পা দিয়েই সবাই থেমে গেল। লোক গিজগিজ করছে, পা দেবার জায়গা খুঁজতেই সবাই ব্যস্ত।

বৃষ্টিটা থেমে এসেছে। তখনও টিপ্‌টিপানি চলছে।

রাজকুমার ছেলেমেয়ের হাত ধরে ততক্ষণ এসে গেছে মুসাফিরখানার সিঁড়িতে। কাছে এসে বলল, জল ধরে এসেছে, রাস্তার জলও কমছে। জল নামবে চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই। সামনের ডাঙ্গায় ভাতটা ফুটিয়ে নিতে পারিস। এরা রইল আমি বাজারের দিকে যাচ্ছি।

নোংরা জলে যাসনি। পায়ে হাজাটাজা বিষ ঘা হবে।

কিছু হবে না। তুই এদের দেখ, ভাত ফোটাবার ব্যবস্থা কর। আমি বাজারটা ঘুরে আসি। জল সবটা নামতে অনেক দেরি। দেখি কিছু পয়সা আসে কিনা।

বৃষ্টিটা থামতে সবাই সামনের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সবার চিন্তা আজ কি করে খাবার ব্যবস্থা করবে।

আবার টিপ্‌টিপানি বৃষ্টি আরম্ভ হতেই হুড়মুড় করে সবাই ছুটল মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজতে। ননীবালা প্ল্যাসটিকের কাগজ মাথায় জড়িয়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে গেল অসমাপ্ত ফ্লাইওভারের দিকে। ফ্লাইওভারের তলায় কোথাও কোথাও জল তখন নেমে গেছে, সরকার দয়া করে নিরাশ্রয়ের মাথা গোঁজার জায়গা করে দিয়েছে। খাজনা ট্যাক্স না দিয়ে মাথা গোঁজার এত বড় পাকা ইমারত শহর কলকাতায় আর কটাই বা আছে। তবে যারা নতুন তারা জানে না, এই আশ্রয় কোনমতেই নিরাপদ নয়। বিপদ যে কোন সময় হামলা করতে পারে।

রাজকুমারের আর এগিয়ে যেতে হল না।

দক্ষিণের স্টেশন থেকে একদল যাত্রী তখন ছুটছিল বড় রাস্তার দিকে। যাদের সঙ্গে মালপত্র ছিল তারা অসহায়ের মত তাকিয়েছিল মালের দিকে। একজন এসে বলল, এই শোন।

রাজকুমাব ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বইল।

আমার একটা বাকস আর বিছানা আছে। বইতে পারবি।

কোথায় যেতে হবে?

উই যে হাসপাতাল। ওর সামনেব গলিতে। পারবি?

পারব। কত দেবে বাবু?

কত চাস?

তিন টাকা দিতে হবে।

তিন টাকা?

হাঁ বাবু। একটা রিক্সা নিলে সাত টাকার কম হবেনি। আমি তো তিন টাকা চেয়েছি। দেখছেন তো রাস্তায় কত জল জমেছে। জল ভেঙ্গে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অনেকটা দূরও।

নে চল।

দাঁড়াও বাবু। বলেই রাজকুমার ছুটে গিয়ে ননীবালাকে বলে এল।

ফিরে এসে বলল, চল বাবু।

বাক্স আর বিছানা মাথায় করে ভদ্রলোক ও তার পরিবারের পেছন পেছন রাজকুমার জল ভেঙ্গে এগোতে থাকে। বাবুরা আগে আগে চলছে, পেছনে রাজকুমার। বাবুদের নজর সব সময় তার উপর। কি জানি মাল নিয়ে সটকে পড়তে তো পারে। রাজকুমার তো রেলের কুলি নয়। ফালতু লোক বিশ্বাস করতে পারবে কেন!

ননীবালা ভাবছিল আজ কি করে বাচ্চাদের পেটে কিছু দেবে।

একদল মেয়ে মরদ ক্যানিং-এর গাড়ি থেকে তাড়ির হাঁড়ি কলসী নিয়ে ছুটে আসতে আসতে থেমে গেল। সামনে কিছুটা দূরেই রাস্তা ভাসছে জলে, আবার টিপটিপানি বৃষ্টিও বন্ধ হয়নি। ননীবালার পাশে খানিকটা খালি জায়গা দেখে সবাই ভিড় করল। তাড়ির উৎকট গন্ধ নাক ঝাঁঝিয়ে দিচ্ছিল। ভেজা আঁচল দিয়ে ননীবালা নাক চেপে ধরে তার চটের পোঁটলাটার ওপর ছেলেমেয়েকে নিয়ে চেপে বসল।

তাড়িওয়ালারা হতাশভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে একজন অপরজনকে বলল, বাঁচা গেলরে আয়েনুদ্দি। তিন টাকায় খালাস।

খালাস। গেটবাবুদের রোজই দিতে হয় বুঝি? আরে বুদ্ধু আজ নতুন এসেছে। তাড়ির ঠেকও চেনে না, স্টেশনের হালচালও জানে না।

নিয়ামত বলল, রোজ ওটা ভাগাভাগি হয়। বাবুরা পুলিশরা।

কিছুক্ষণ থেমে নিয়ামত আবার বলল, আজ আর পানি বন্ধ হবে না।

মাল কাটানোই কঠিন হবে।

মেয়ের দল হাসতে হাসতে বলল, তোরা মরদ বাচ্চা। তোরা ভয় পাস আমরা জানি কোথায় গেলে মাল হু হু করে কাটে। দশটা পঁচিশ ধরতেই হবে। ফেল করলে আবার এক্ ঘণ্টা পর গাড়ি।

আয়েনুদ্দিন নতুন লোক। জিজ্ঞেস করল, কোথায় বেশি কাটবে রে বুবু ?

তুই দেখছি মস্ত ন্যাকা। ঠেলাওলা রিক্সাওলা মুটেরা যেখানে ভিড় করে। এই সব খোট্টারা তো চুল্লুর পয়সা জোটাতে পারে না। কয়েক গেলাস তাড়ি খেয়ে তেষ্টা মেটায়।

আয়েনুদ্দিন আর জবাব দিল না। নিয়ামত বলল, কিছুটা পানি মেশাতে হবে নইলে পোষাবে না। খাওয়ার সোডা এনেছিস বুবু ?—আমার কাছে আছে। আজ চলবে।

নসীব রে নসীব। ঘরের গাড়ি চড়ে এসেও রেহাই নেই। গেটবাবুদের না দিলে গেট পার হওয়া যায় না। সেই পয়সাটা পানি দিয়েই তুলতে হবে। ঘরের কড়ি তো দিতে পারিনে। খুচরো খদ্দের আছে। টি-টি বাবুরা আছে। তাই আমাদের চলছে একজনের নিয়ে আরেকজনকে দেই। আয়েনুদ্দির চাচা কেরামত আলি গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করল। পাশে বসেছিল ননীবালা। তাকে লক্ষ্য করে বলল, কি গো মাসী, এখানে খুব পানি হয়েছে তো ?

খুব, ভেসে গেছে শহরটা। বাবুদের ঘরেও জল ঢুকেছে। বস্তির মানুষেরা ডাঙ্গায় উঠেছে মালপত্তর নিয়ে। গত রাতটা যা গেছে। এখন তো জল কমেছে, বৃষ্টিও কিছুটা ধরেছে। দুপুর নাগাদ সব সাফ হবে মনে হয়।

আবার যে পানি এল।

এ আর কি বেশি। কাল রাতে থাকলে বুঝতি বৃষ্টি কাকে বলে। কাল বিকেল থেকে শেষ রাত অবধি যা বৃষ্টি, উঃ।

আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে কাটতে থাকলেও আকাশের রং বুঝিয়ে দিল এটাই শেষ নয়, আবার মেঘের দাপট আসছে। তবুও ব্যস্ত শহরের মানুষ নেমে পড়ল কাজে। তিনটে স্টেশনে একটার পর একটা ট্রেন আসছে আর হাজার হাজার যাত্রী বাইরে এসে ছোটাছুটি করছে। প্যান্টপরা যাত্রীরা হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে, ধুতিওলা বাবুরা মালকোঁচা আঁটছে। লুঙ্গিওলারা লুঙ্গি ভাঁজ করে নিয়েছে। মেয়েদের অবস্থাই কাহিল। অফিস-যাত্রী মেয়েরা শাড়ি বাঁচাতে পেটিকোট ভিজিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে জল ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় ট্রাম বন্ধ। দু একটা বাস মাঝে মাঝে চলছে। রিক্সাওলারা এই মরশুমে চারগুণ পয়সা কামাইয়ের ধান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টেশনের সামনে। দোকানপাট তখনও ভাল করে খোলেনি। সবাই ব্যস্ত অথচ ব্যস্ততার ছেদ টেনে দিয়েছে রাস্তার জমাট জল। জল নামছে, তবে কখন যে জল সম্পূর্ণ ভাবে সরবে তা কেউ বলতে পারছে না।

উত্তর থেকে যারা আসছে তারাও বলছে জলে ডুবেছে শহরের অলিগলি সন্ধি, কবে যে জল নামবে সেটাই সবাই ভাবছে। দক্ষিণ থেকে যারা আসছে তারাও ভেজা কাপড় জামা নিয়ে এসেছে। তাদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মাঝ কলকাতায় বস্তি অঞ্চলে দুর্দশার শেষ নেই।

রাজকুমার বাবুদের মাল নামিয়ে ফিরে এসেই টাকা তিনটি ননীবালার হাতে দিয়ে বলল, কোথাও যদি পাঁউরুটি পাওয়া যায় খুঁজে নিয়ে আয়, গোটা কতক সিঙ্গাপুরীও আনিস। তুইও খেয়ে নিস। আমি দেখি আর দু একটা খেপ যদি পাই।

রাজকুমার ছুটল পয়সার ধান্দায়।

রঘুয়ার বউ লছমনিয়া সওদা করতে বেরিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা।

লছমনিয়া অবাক হয়ে বলল, তুলোগ হিঁয়া পর আইলু। হামার মরদ তো তুহার লেগে সোচতে সোচতে বাহার নিকালা। তু লোগকো পতা করনে গিয়া।

আর পতা। ম্লান হাসি রাজকুমারের ঠোঁটে।

কাহে রে ভেইয়া?

বৃষ্টির জল সব পাতা ভাসায় লিয়া। সাঁঝ তক্ আকাশ সাফ হলেই আমরা আড্ডায় ফিরে গা। রঘুয়াকে বলিস, হামিলোক মরিনি। জিন্দাই ফিরে আসব।

লছমনিয়া বাধা দিয়ে বলল, কাঁহা যাইছু?

পেটে হাত দিয়ে রাজকুমার হাসল।

হামি চাউল আর ডাউলসে খিঁচড়ি পাকায়া। সবলোক চল হামার সাথ। আজ নেওতা। ননীবালা কাঁহা ছে বালবাচ্চা কাঁহা ছে, টিশনমে? তু ঠারু যা হামি বোলাকা আনেগো। সমঝা?

রাজকুমার লছমনিয়ার পেছনে পেছনে ননীবালার সন্ধানে গেল।

ননীবালা তখন রান্নার চেষ্টা করছে। বাজার থেকে চাল এনে সবে রান্নার জন্য তিন ইঁটের উনুনে ফুঁ দিয়ে ধুঁয়াতে তার চোখ মুখ লাল করেছে। চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে।

এহিতো ননীবালা। আর রসুই করলে নোহি হোগা। হামরা ডেরামে চ। জলের দিকে তাকিয়ে লছমনিয়া নাক চেপে ধরে বলল, রাম, রাম, জলদি চ।

রাজকুমার লক্ষ্য করল জলের স্রোতে মরা ইঁদুর, মরা বেড়াল, মরা কুকুরের লাশ রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। জল কমতেই ওই সব পচা পাচাঁক জন্তু-গুলো এদিকে ওদিক আটকে রয়েছে। ছোট বড় সব রাস্তাই কাদায় আবর্জনায় ভর্তি। পচা গন্ধে তিষ্ঠানো দায়। এই সব ডিঙ্গিয়ে কখনও পা দিয়ে চটকে ছুটছে মানুষের দঙ্গল। কর্মশেষে নিরাপদে নিজেদের আস্তানায় ফিরতে সবাই ব্যস্ত। কখন যে বিকেল গড়িয়েছে মেঘ ঢাকা আকাশ দেখে অনুমান করাও যায়নি।

দিন যায় রাত আসে।

বৃষ্টি থেমেছে। ফুটপাতের জমিদারীতে ফেরার চেষ্টা করছে ফুটপাতের প্রজারা। সন্ধ্যে হতেই রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফুটপাথের বাসিন্দারা। এবার তারা খুঁজে নেবে তাদের তিন হাত জমির মালিকানা।

পরের দিন মেঘের তলা দিয়ে সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

ধাঙ্গড়রা রাস্তা নর্দমা সাফ করতে নেমেছে। গতকাল ট্রাম চলেনি, সামান্য দুচারটে বাস চললেও তাতে জায়গা পায়নি সবাই। আজ সকালে আবার ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল, বাসগুলো কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। কালকের দুর্যোগের চিহ্ন শহরের বুক থেকে প্রায় মুছে এসেছে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিশেষ ছেদ কোথাও নেই। এক নজরে মনে হবে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছে শহরে ও শহরতলীতে। শুধু স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসেনি ফুটপাতের জমিদারদের। তারা নিজের নিজের জায়গা খুঁজে নিলেও গতকালের আবর্জনার স্তূপ জমে আছে সেখানে, ভেজা কাঁথা আর চটগুলো দড়ি টাঙ্গিয়ে শুকোবার চেষ্টা করছে। মেয়েরা আবার তিনখানা ইঁট খুঁজে এনে উনুন পেতেছে!

আবার বউবাজারের ফুটপাতে সংসার পেতে বসেছে রঘুয়া। আজ সকালে মুলুক থেকে রঘুয়ার চারজন রিস্তাদার এসেছে। হাওড়া স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে রঘুয়ার দেওয়া ঠিকানায় এসে হাজির। রঘুয়া শুকনো চটের ওপর প্লাসটিকের কাগজ পেতে বিস্তাদার গণেশ রাম আর সপরিবারে লালন সাঁইকে বসিয়ে আমেজের সঙ্গে বলল, তব বাতাও।

লালন সাঁই তার বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, বাতাওজি।

লজ্জায় লাল হয়ে তার বউ সখিয়া বলল, তু বাতা।

লালন যা বলল, তার অর্থ হল, গ্রামে আর থাকা যাচ্ছে না। হরিজনদের গ্রাম ছাড়া করতে ভূমিহার বীরভদ্র সিং বার বার হামলা করছে। হরিজনরা আর বেগার খাটতে রাজি নয়। এই তাদের অপরাধ। জোর করে গত সালে গেঁহু আর কুরীত কেটে নিয়ে গেছে হরিজনদের জমি থেকে। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের ঘরে আগুন দিয়ে বিবি বাচ্চাকে পথে বসিয়েছে। নিরুপায় হয়ে পেটের দায়ে ছুটে এসেছে কলকাত্তা। এখানে মুটিয়া থেকে রহিস আদমি সবারই রটিরুজি জোটে। তাই দু'বিঘা জমির মায়া কাটিয়ে তারা এসেছে কোন ধান্দা করে পেট চালাতে।

সব শুনে রঘুয়া বলল, এতো সহি বাত লেকিন কলকাত্তামে রুটি-ছাতু মিলবে কিন্তু কোঠী নেই মিলবে। হামার দোস্ত রাজকুমারকো পুছেগা। উ কুছু কর দেগা।

রাজকুমার সব শুনে বলল, কাজ তো কিছু দেখছি না। তবে একটা কাজ

করতে পারিস। আজকাল লোকে খুব চা খায়। কোন গাড়ি বারান্দার তলায় চায়ের দোকান করতে পারিস। রুপেয়া পয়সা কম দিয়েও তোদের ধান্দা চলবে।

লালন সাঁই বলল, মগর।

মগর-টগর কিছু নেই। কাজে লেগে যা। তবে শোবার জায়গা করতে হলে তোরা তালতলায় যা। ওখানে তোদের দেশওয়ালী অনেক ভৈইয়া আছে। কিছু না কিছু হয়েই যাবে।

যুক্তিটা কতটা মনঃপুত হল তা বলা যায় না। পরদিনই লালন তার পরিবার নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল। তার খোঁজ খবর করার মত মন তাদের ছিল না।

লছমনিয়া এবার মুখ খুলল, তোহার মুখে বাত নেইরে মরদোয়া, দেখ রাজুভাই ক্যায়সা উলোক কো হটা দিয়া।

রঘুয়া হেসে বলল, হামার নিজেরই চালচুলহা নাই উলোককা কি করেগা।

আবার ফুটপাত ভর্তি হয়েছে। শহরের ফুটপাতে লক্ষাধিক রাজকুমার আর রঘুয়ার মত ভাগ্য তাড়িত মানুষ জমিদারী কায়েমী করেছে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। ফুটপাত ভর্তি হবেই, আবার আগের মতই মহল্লার সমাজ-বিরোধীরা ফুটপাতের খাজনা আদায় করতে এসেছে। ওদেব অন্য কোন জীবিকা নেই। কেরাসিন তেল, সিনেমার টিকিট কালোবাজারে বিক্রি আর গরীব ফুটপাতের অধিবাসীদের ওপর নানাভাবে জুলুম বরে অর্থ আদায় করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে। পুলিশকে হিস্যা দেয়। অলিখিত এই আইন মেনে চলে ফুটপাতের বাসিন্দারা আর ফুটপাতের ফেরীওয়ালারা। এতে ব্যয় নেই, আয় যথেষ্ট, মালগুজারি দিতে হয় না।

ফেরীওলা পয়সা দিয়েই ফুটপাতের জমিদারী ভোগ করে। কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। তারা চলে গেলে-ফুটপাতের বাসিন্দাদের আড্ডা বসে, রান্না আরম্ভ হয়। তারা রাত কাটায় চট মুড়ি দিয়ে। এদের আরও কিছু উপরি দিতে হয়। সমাজবিরোধীরা জওয়ান মেয়েদের মাঝে মাঝেই ফুটপাত থেকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার গলিতে এটুকু অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়। যখন ওরা ছিল দেহাতে সেখানেও জোতদার জমিদারদের নানা অত্যাচারের সঙ্গে মেয়েদের মর্যাদাহানি ছিল উপরি পাওনা। এখানে উপরি পাওনা মিটিয়ে দিলে আর কোন অত্যাচার সহ্য করতে হয় না।

ফেরীওলারা ইউনিয়ন করেছে। তারা ফুটপাতের জমিদারী ছাড়তে রাজি নয়। তারা জোটবন্দী হয়ে সরকার তথা পুলিশের হুজ্জত সহ্য করতে চায় না। মাঝে মাঝেই বিবাদ দেখা দেয়। যতই বিবাদ বিসম্বাদ হোক মাস কাবারী অথবা রোজানা খাজনা ট্যাক্স পুলিশের থানায় সমাজবিরোধীদের

দিতে হয়। ফুটপাতের জমিদারদের তো কোন সংগঠন নেই। সেজন্য তাদের বেশি জুলুম সহ্য করতে হয়। এদের ব্যথা বেদনার অংশীদার কেউ নেই, এদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে না। নীরবে সহ্য করে। কখনও কখনও জায়গাও বদল করে।

এরা কারা? কেন এরা ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে। এসব প্রশ্ন জেগেছে সমাজসেবীদের মনে। তারা সমীক্ষা করেছে, সরকারকে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন পথের সন্ধান বিগত চল্লিশ বছরেও খুঁজে পায় নি। মূল সমস্যা জীবিকার। এই সমস্যা মেটাতে পারেনি রাষ্ট্র, সমাজ ও হিতাকাঙ্ক্ষীর দল। পারবেও না বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়।

মানুষের অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্র কাগজে কলমে। বাস্তবে নয়। বাস্তব বড়ই রূঢ় ও কঠিন। তাই চিরকাল ওরা অত্যাচার সহ্য করেছে, ভবিষ্যতেও করবে মুখ বুজে।

রাজকুমার আর ননীবালা এসব তত্ত্বকথা বোঝে না। তাদের বড় সমস্যা হল পেট আর প্রজনন। মানুষের এমন কি জীবজগতের প্রাথমিক এই দুটো প্রয়োজন মেটাবার আশা নিয়েই তারা পথে বের হয়েছে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনহাত জমির জমিদারীতে নিজেদের আটক করে রাখতে বাধ্য হয়েছে।

শহরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছে।

আবার ঠেলার পিছারির কাজ পেয়েছে রাজকুমার।

হীরুর বাঁধা খদ্দের বেশি। তাদের মাল নিয়ে যেতে হয় শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। দিনান্তে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় ফুটপাতে। ননীবালা রাতের বেলায় ভাত ফুটিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে দুজন বড় হতে থাকে। দুঃখ দারিদ্র দৈন্য জয় করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

এমনি করে বর্ষা পেরিয়ে শীত নেমে আসে।

এবার শীতের প্রথমেই বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেও শহর ডোবে নি। রাতের বেলায় ছেঁড়া প্ল্যাসটিক কাপড়ের তাঁবু টাঙ্গিয়ে তার তলায় চারজনে গুড়িশুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। বেশ কতকগুলো ছেঁড়া চট জোগাড় করেছিল। সারা বছরে সেগুলোই তাদের সম্বল। ওগুলো বিছিয়ে চট গায়ে দিয়ে গায়ের গরমে বুকের সঙ্গে হাঁটু জড়িয়ে শুয়ে থাকে। শেষ রাতে ঠাণ্ডা বেশি হলে রাজকুমার উঠে বসে, তার গায়ের চট ভাল করে টেনে দেয় ছেলেমেয়ের গায়ে। পাশেই একটা খোট্টা চায়ের দোকান করেছে। দোকানের উনুনের পাশে গিয়ে বসে ভাঁড়ে করে চা খেয়ে কাঁপুনি কমায়। বেশিক্ষণ দেরি করতে হয় না। হীরুর খবর অনুসারে প্রস্তুত হয়ে নেয়। হীরু ঠেলার তালা খুলে প্রস্তুত হয়েই থাকে। রাজকুমার ননীবালাকে ডেকে তোলে। রাতের বাসি ভাত অথবা পান্তা যা থাকে তাই খেয়ে রওনা দেবার আগে তার হাতে ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে দেয়। সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে গামছাটা মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ননীবালা সারাদিন ছেলেমেয়ে পাহারা দেয়। বিকেলবেলায় পাড়ার মুদির দোকান থেকে সওদা নিয়ে ফিরে এসে রাঁধতে বসে। সারা দিনটা শুয়ে বসেই কাটে।

দামিনী এসেছিল সেদিন।

কেমন আছিস ননী, বলেই বসে পড়ল ফুটপাতে।

তুই কেমন আছিস?

আছি। কদিন আছি জানি না। গাঁয়ে যাব মনে করছি।

আনোয়ারকে নিয়ে যাবি তো?

ও পোড়ার মুখো খানকির ছেলের মুখে আগুন। বাপের ঘরে যাব।

আনোয়ারকে সহ্য হলনি বুঝি।

ওটা তো একটা গুণ্ডা। জুয়া আর চোলাই। রাতের বেলায় যা ধোলাই দেয়। আর সহ্য হলনি।

সবাই তো জানে আনোয়ার কয়েকটা মেয়েমানুষ তাড়িয়েছে তাও গেলি কেন?

বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, ঘর সংসার করব। ছাই। মাঝে মাঝেই পুলিশ আসে। আনোয়ার ওদের হাতে টাকা দিয়ে নিজের কাজে বের হয়। আগে তো জানতুমনি। আনোয়ার যে পাকা চোর আর ছিনতাইবাজ। ওর সঙ্গে ঘর করা যায় না। ওকে বিশ্বাস নেই। তাই দেশে বাপের ঘরে যাব।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কি ভাবছিস ননী।

ভাবছি ভাতার ছাড়বি কেন?

ওরে আমার সাতপাকের ভাতার। নিকে করা বউ হলেও তো বাঁচতাম। আনোয়ার বলল, তুই কলমা পড়লে তবেই নিকে করব। আমি বললাম। যাক্, তোর বর কোথায়? কাজে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে? দেরি আছে? আমার সঙ্গে যাবি।

কোথায়?

রাজাবাজারের বস্তিতে আনোয়ারের ঘরে, একা লড়াই করতে পারব না। তুই যদি থাকিস তা হলে ঝাঁটা মেরে ওর মুখটা থেঁতলে দিয়ে আসতাম।

ওটা পারবনি। অমরের বাবা শুনলে খুব রাগ করবে। এমনি তে খুব ঠান্ডা মানুষ। গোঁসা হলে আর রক্ষে নেই। তোরা মাগ ভাতারের লড়াই নিজেরাই মিটিয়ে নে।

তুই তো তখন বলেছিলি আনোয়ারের সঙ্গে ঘর করতে।

বলেছিলাম, তুই তো বলিসনি ও একটা দাগী গুণ্ডা। তাহলে কি তোকে বলতাম।

খেদের সঙ্গে দামিনী বলল, আমিই কি জানতাম। চারটে সাতাশে একটা গাড়ি আছে। ওঠাই ধরব ভাবছি বারাসাতের নীরদ যাবে বলেছে, ওর সঙ্গেই চলে যাব।

যা ভাল বুঝিস।

মেয়েটা ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতেই ননীবালা ছুটে গিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল।

দামিনী চুপ করে বসেছিল। ননীবালা মেয়েকে টানতে টানতে ফুটপাতে নিয়ে আসতেই দামিনী বলল, বেশ বড় হয়ে উঠছে তোর মেয়ে।

ননীবালা হেসে বলল, হ্যাঁ, হাঁটতে পারে। বড়ই ভয় করে। যা গাড়ি চলে। কখন গাড়ি চাপা পড়বে।

চোখে চোখে রাখিস।

তাতো রাখি, সেদিন ডানদিকের বড় রাস্তায় জুগলালরামের বেটা চেপটে গেছে বাসের তলায়।

তারপর?

তারপর হৈ হৈ। বাস তো পালিয়ে গেল। পরে যে বাসটা আসছিল সেটাতে আগুন দিল পাড়ার ছেলেরা। জানিস দামিনী সকালবেলায় জুগলাল রিকসা নিয়ে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তা পেরিয়েছে এমন সময় তার ছেলে চাপা পড়ল। সে জানত না। সোয়ারীর তাগাদায় সে ছুটে চলল নয়া রাস্তায়। অমরের বাবা বলল। একেই বলে কপাল। জুগলাল শুনল একটা ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছে। দেখল বাসে আগুন দিয়েছে। এত জেনেও সে ফিরে তাকাল না সোয়ারীর তাগাদায়। কি আপশোষ! ফিরে এসে শুনল, তার পেছনে তারই ছেলে বাস চাপা পড়ে মরেছে। কপাল রে দামু কপাল। ছেলে মরল এক রশি দূরে বাবা জানলও না। তাই বড় ভয় ছেলেমেয়েকে নিয়ে।

দামিনী উঠে পড়ল।

কোথায় যাবি এখন? গাড়ির তো অনেক দেরি, কিছু খাবি?

নারে না, নীরদের খোঁজে যাব। দেখি তাকে পাই কিনা। না পেলে একাই যাব।

দামিনী ফিরে গেল।

ননীবালা তার দুরন্ত মেয়েটাকে সামলাতে ব্যস্ত। অন্য কিছু কাজের কথাই তার আর মনে হচ্ছিল না। দামিনীর কথা শুনে কেমন একটা অজ্ঞাত ভয় তাকে চেপে ধরেছিল। জুগলালরামের মত সেও হয়তো জানতে পারবে না তার মেয়ে অথবা ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছে। আতঙ্ক তাকে বেমনা করে তুলল।

রাতে রাজকুমার ফিরে আসতেই বলল, আজ দামিনী এসেছিল।

কি বলল?

ও দেশে ফিরে যাচ্ছে। তাই বলতে এসেছিল।

আনোয়ারের সঙ্গে বনিবনা বুঝি হল না?

হ্যাঁ। তবে ভালই হয়েছে। আনোয়ার জুয়ারী, মদ খেয়ে দামিনীকে পেটায়। একটা পাকা গুণ্ডা। দামিনী তার ভয়েই কলকাতা ছেড়ে দেশে পালিয়ে গেল।

রাজকুমার কোন কথা না বলে সামনের টিউবওয়েলে হাত মুখ ধুতে গেল।

ননীবালা ভাত খেতে বসে বলল, তুই দেরি করলে বড়ই ডর লাগে।

কেন রে?

যেভাবে ছেলেবুড়ো গাড়ি চাপা পড়ছে। এই তো সবাই বলছে, জুগলালের বেটা নাকি বাসের তলায় চেপটে গেছে। তারচেয়ে চল আমরা দেশে ফিরে যাই।

রাজকুমার হেসে বলল, মরণ কপালে থাকলে দেশেও সাপে কেটে তো মরতে পারি। সেখানে গেলে দুই সন্ধ্যে ভাত জুটবে না বউ। তার চেয়ে মরতে হলে এখানেই মরব। শুকিয়ে তো মরতে হবে না।

যুক্তিটা অকাট্য। ননীবালা যুক্তি না মেনে পারল না তবুও বলল, ডর করে বুঝলি।

মেয়েদের মন বড় নরম। ভয় ডর করে কি শহরে বাস করা যায়। কোন ভয় নেই। আজ শীতটা বেশ কামড় দিচ্ছে। বিছানা পাত শুয়ে পড়ি। আবার সেই সাত সকালে আঁধার থাকতেই বের হতে হবে। কাল যাব সেই বাগুইহাটি।

রাত কাটে, দিন কাটে। রাজকুমার মেসিনের চাকার মত ঘুরপাক খায়। ঠেলা গাড়ির পিছারি করতে করতে হয়রান হলেও তার অবসর মেলে না। এতে তার আপশোষ নেই। তবুও তো তিনটে প্রাণীর মুখে ভাত দিতে পারছে।

।। চার ।।

রঘুয়া চতুর লোক। আজকাল আর কাজ করে না মোবাইল হোটেল বসিয়েছে থানার উল্টো দিকে। কয়েকটা এলুমিনিয়মের থালা আর ঘটি তার বাণিজ্যিক সম্পদ। সকালবেলায় রেলিং এর সঙ্গে চাদর টাঙ্গিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে। মিশিরজির ছাতুর দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। রোজানা মাল, রোজানা আদায়। বিকেলবেলায় হিসাব করে কড়াগণ্ডায় পাওনা মিটিয়ে দেয়। দুই ধামা ছাতু সরবরাহ করে মিশিরজী। একটা ছাতু ছোলার। আর একটা ছাতু ছোলা আর ভুট্টার। ছোলা-ভুট্টার ছাতুর খদ্দের বেশি। ছোলার ছাতুর দাম বেশি তাই গ্রাহকও কম। ছাতুর সঙ্গে কয়েক কুচো পেঁয়াজ আর একটা কাঁচা লঙ্কা মুফত আর যে কোন একটা চাটনি মুফত। বিক্রেতার কোন হাঙ্গামা নেই। খদ্দের থালা ঘটি তাকে মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় নগদ পাওনাও গুণে দেয়।

রঘুয়া কলকাতার হালচাল বুঝেছে। কোথায় দোকান বসালে বিক্রি বেশি

কম তাও সে জানে। ছিন্নমূলে বিহারী মজুরদের পাড়ার সামনেই তার দোকান। এক ধামা ছাতু বেলা দুটোর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। রঘুয়া দিনান্তের নাফা গুণেতি করে লছমনিয়ার হাতে দিয়ে বললে, রাখ দে।

রাজকুমারের সঙ্গে রঘুয়ার দেখা হয় মাঝে মাঝে। রঘুয়া বউবাজারের ফুটপাত ছেড়ে এগিয়ে গেছে মানিকতলায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে। এখানে দেশওয়ালী ভেইয়াদের সংখ্যা বেশি। সন্ধ্যাবেলায় লছমনিয়া যখন রুটি সেঁকে তখন রঘুয়া ভেইয়াদের সঙ্গে বলে মুলুকের কথা, নিজেদের সুখদুঃখের কথা। ধান্দা আর নাফার কথা শোনে আর শোনায়।

ওই পথে যাবার সময় রঘুয়ার সঙ্গে দেখা হয়। রঘুয়া জিজ্ঞাসা করে, কেইসা রাজুভেইয়া? ভোজী তো আচ্ছা ছে? বেটা বেটি ক্যায়সা?

সব ভাল। তোমার খবর তো ভাল।

রামজীর কিরপা। চা খায়েগা রাজুভাই।

টাইম নাই ভাই। ফিরতি পথে এসে বসব, জিরোবো।

কথা শেষ করে ঠেলার পিছারিতে জোর ঠেলা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, খবরদার, খবরদার।

রাজকুমার চলে গেলে রঘুয়া তারা দোকান সাজাতে বেরিয়ে পড়ল।

আজকাল বড়বাজার থেকে ছাতু নিয়ে আসে রঘুয়া। এতে লাভ বেশি। এখন আর মিশিরজির সঙ্গে রোজদিন পয়সা নিয়ে খিট্ খিট্ করতে হয় না।

এরই কদিন পরে রাজকুমার ওই পথে যাচ্ছিল। দেখতে পেল সামনে পুলিশ আর রাস্তায় লোকে ভিড় করেছে। চিৎকার শুনে বুঝতে পারল, আগে কোথাও খুন টুন হয়েছে। হীরুকে বলল, গাড়িটা গলিতে নে হীরু। ব্যাপার ভাল ■■ হচ্ছে না। মহাজনের মাল লোপাট হলে গুনাগার দিতে হবে।

হীরুও এই কথাই ভাবছিল। পাশের গলিতে ঠেলা ঢুকিয়ে হীরু বলল, তুই একবার দেখে আয় ওখানে গোলমাল কেন?

রাজকুমার গামছা দিয়ে মুখ মুছে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। এক গাল ধুঁয়া ছেড়ে বলল, হুঁসিয়ার থাকিস।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখল ফুটপাতে চার পাঁচটা পুরুষ। মেয়ে আর বাচ্চার থেঁতলানো লাশ পড়ে আছে। প্রচণ্ড ভিড় জমেছে।

পাশের লোককে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ভাই?

রাতের বেলায় ফুটে শুয়েছিল। একটা লরী এসে থেঁতলে দিয়ে গেছে।

লরীটা কোথায়?

লরী তো পালিয়ে গেছে।

রাজকুমারের মুখ থেকে অসারে বের হল, আহা রে।

পুলিশ এসেছে মড়া-তোলার গাড়ি এসেছে। গাড়িতে লাশ তুলে দেওয়া মাত্র গাড়ি বেরিয়ে গেল। রাস্তায় ভিড় কমেনি সবাই চিৎকার করছে। তাদের

দাবী এই রাস্তায় লরী চলা বন্ধ করতে হবে। পুলিশ অফিসাররা তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। রাজকুমার আর দাঁড়াল না। তার গা গুলিয়ে উঠতে থাকে। বীভৎস মৃতদেহগুলো তার স্নায়ুতন্ত্রীকে কেমন অবশ করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে গলির মুখে এসে হীরুকে বলল, এবার চল ওই গলি দিয়ে। ওখানকার গোলমাল এখন মিটবে না। ছেলে বুড়ো নিয়ে পাঁচটা মরেছে।

কি করে মরল ?

রাস্তার ফুটে শুয়েছিল। শেষ রাতে লরী ফুটপাতে উঠে ওদের রুটি বেলা করে দিয়ে গেছে। লরীও পালিয়েছে।

কোথাকার লোক শুনেছিস কিছু ?

তা শুনিনি, তবে আমাদের মত কপাল পোড়া মানুষ। মনে হয় ওরা দেশওয়ালী ভেইয়া। কলকাতায় এসেছিল পেটের জ্বালায়। আমাদেরও হয়ত কোন দিন ওইভাবেই মরতে হবে। একেই বলে কপাল।

তোর রঘুয়াকে দেখলি ?

রঘুয়া কি আছে। সে দেখে শুনে নিশ্চয়ই বউ নিয়ে পালিয়েছে নইলে কোন বাগানে গিয়ে বসে আছে। পুলিশের হাঙ্গামা তো বেশি।

তা বটে। তোল পেছনটা। চল এবাব। মহাজনের মালটা পেঁৗছে দিয়ে আসি।

রাতের বেলায় ননীবালাকে সকালের ঘটনা বলতেই ননীবালা ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, আর দরকার নেই। এবার চল গাঁয়ে ফিরে যাই।

আমিও সেই কথাই ভাবছি তবে পেট যে শুনবে নারে বউ।

তুই রঘুয়ার মত একটা কিছু ব্যবসা করতে পারিস। ছোটখাট দোকান দে।

সেটাও ভাবছি।

ভেবে ভেবে তো মরতে চললি। ওতে মেহনত কম। নগদ পয়সার মুখ দেখবি সব সময়।

রাজকুমার ভাবে সেও দোকান দেবে। কিন্তু সাহস পায় না। বিহারী মুটে মজুর হয়ত তার মোবাইল হোটেলে আসবেই না। সবাই তো সব কাজ পারে না। দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় তাকে। এরজন্য কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কিছু ব্যবসা ধান্দা করতে হলে দরকার হয় নগদ কড়ির, সেটাও তো তার নেই।

রাজকুমার মাঝে মাঝেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট দিয়ে মাল নিয়ে যায়। রঘুয়ার দেখা আর পায় না। রঘুয়া অন্য কোথাও আবার ডেরা গেড়েছে অথবা দেশে ফিরে গেছে, কেউ তার ঠিকানা বলতে পারল না।

শনিবারে অনেক রাতে রাজকুমার হীরুর কাছে ঠেলা জমা দিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এসে দেখল ননীবালা মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে। রাজ-

কুমার চট টেনে বসতে বসতে বলল, আজ বুঝি রান্না করিস নি।

নারে। মেয়েটার খুব জ্বর। মারারী হাসপাতালে গিয়েছিলাম। অনেক দেরি হয়ে গেল। রান্নার সময় পাইনি। মেয়েটাও কোল ছাড়ছে না।

অমর গেল কোথায়?

আছে কোথাও। মুড়ি আর তেলভাজা কিনে এনে রেখে গেছে। তুই খেয়ে নে।

তুই খাবি না?

খাব। তুই মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসলে খাব। মাথায় জল দিতে বলেছে। বলেছে ম্যালারী, ওষুধ লিখে দিল।

হাসপাতাল থেকে ওষুধ দিলে নি?

না। বললে কিনে নে গিয়ে।

কিনেছিস?

কিনেছি। খাওয়ালুম বমি করে দিল।

খুব তেতো হবে। আবার খাওয়াতে হবে। বাটিতে বড়ি ভিজিয়ে দে।

হাত মুখ ধুয়ে এসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, পুজো এসে গেল। এখন খেপ বেশি, পয়সাও বেশি। একটু রাত হবে ফিরতে।

কিন্তু মেয়েটার কি হবে?

তুই তো মা। তুই আছিস। আমাকে তো পয়সা আনতে হবে।

তা বটে।

খাওয়া শেষ করে মেয়েকে কোলে নিয়ে বসল রাজকুমার। ননীবালা মুড়ি খেতে খেতে দেখল অমর চুপি চুপি আসছে। হাঁক দিয়ে বলল, এই অমর। এদিকে আয়। কোথায় গিয়ে ছিলি রে শত্তুর।

অমর ভয়ে ভয়ে রাজকুমারের পাশে এসে দাঁড়াল। রাজকুমার বুঝল অমর কোন গর্হিত কাজ করে এসেছে তাই ভয়ে মায়ের সামনে যাচ্ছিল না। বলল, যা তো অমরা, এক ঘটি ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়। খুকির মাথাটা ধুইয়ে দি।

অমর যেন বেঁচে গেল।

ঘটি হাতে দৌড়ে গেল টিউবওয়েলে।

ননীবালা বলল, আর এখানে ভাল লাগছে না। চ দেশে যাই।

রাজকুমার ক্ষোভের সঙ্গে বলল, দেশে আছে কি?

কেন? তোর বাপ ঠাকুদার ভিটে আছে, যেখানে ছিলুম।

তা বটে। সে সব কি আছে রে। পাঁচভূতে উচ্ছন্ন করে দিয়েছে এত দিনে। কেউ হয়ত জবরদস্তী দখল করেছে। ধানী জমিগুলোই বেহাত হয়ে গেল মহাজন আর জোতদারের চালাকিতে। এতো মাত্র একটা খড়ের ঘর। তা কি আছে। গিয়ে দেখব ঘর ভেঙ্গে পাশের পরেশ বৈদ্যে ওখানে ঝাল লাগিয়েছে। ঝগড়া কাজিয়া করে লাভ হবে না। ওদের পয়সা আছে। আমার তো কিছু

নেই। যা আনি তা পেট পুষতেই শেষ। এখানে দুজনে খেটেখুটে দানাপানি জোটাচ্ছি। তোর তো দিন কাটছে। ছেলেমেয়েটাও দু'সন্ধ্যে খেতে পাচ্ছে।

ছাই! বলে ননীবালা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

ঘটি বোঝাই জল এনে দিল অমর। রাজকুমার ধীরে ধীরে মেয়ের মাথায় জল দিতে থাকে। জল দেওয়া শেষ করে ছেঁড়া গামছাটা টেনে নিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিয়ে ননীবালাকে বলল, দে ওষুধটা। খাইয়েদি। খুকু খেয়েছে কিছু?

না। মুখে সোয়াদ নেই। খাচ্ছে না। সকাল থেকে জলটি মুখে নেয়নি।

না খেলে মরে যাবে। খেতে দে কিছু তারপর ওষুধ খাবে।

কোন রকমে মেয়েটাকে ওষুধ খাইয়ে রাজকুমার অমরকে জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে তেলে ভাজাগুলো এনেছিলি?

অমর রাজকুমারের মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলল, খারাপ বুঝি?

না। খেতে তো ভালই লাগল।

উড়িয়াদের দোকান থেকে এনেছি। সবাই বলল, গরম গরম তেলে ভাজা খুব ভাল।

গরম ছিল না, অনেকদিন এর সোয়াদ মুখে লেগে থাকবে বুঝলি।

ননীবালা বলল, এরকম একটা তেলে ভাজার দোকান করতেও তো পারিস। তেলে ভাজায় খুব লাভ। ওই উড়েদের দোকানে চারজন লোক কাজ করে, খেতে পায়, মাইনে পায় আবার দেশে টাকাও পাঠায়। করবি?

ওতে টাকার দরকার। টাকা থাকলেও করা যায় না রে। ওদের মত মাল তৈরি না করলে লোকে কিনবে কেন? ওটাও শিখতে হবে। সবাই সব কাজ পারে না, তাতো জানিস? পারিস তুই মোটর গাড়ি চালাতে। পারিস না। এবার বুঝে নে। যে কাজ করবি তা শিখতে হয়। নাহলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হয়।

ননীবালা থামবার মত মেয়ে নয়। বলল, তুই কখনও ঠেলা করে মাল নিয়ে গেছিস কি? তবুও সে কাজ করছিস। করতে করতে শেখে। আর টাকা, সেটাও হবে। আমাকে যে টাকা দিস তা থেকে বাঁচিয়ে তিন চার কুড়ি টাকা জমেছে।

রেখে দে। মেয়েটার ব্যারাম। ও আরাম হলে তখন তোকে বলব।

সাহস পায়নি। হাতের কাজ ছেড়ে হঠাৎ নতুন কাজে নামবার মত মনের বল তার নেই। কিন্তু ননীবালা চুপ করে থাকার মত মেয়ে নয়। কোলের মেয়েটাকে বাবুদের বাড়ির আঙ্গিনায় বসিয়ে দুটো বাড়িতে ঠিকে কাজ করছে। নতুন কিছুতে হাত দিতে হলে হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার। বাবুদের বাড়িতে কাজ করলে সকালের জলখাবার পায়, নগদ কিছু হাতেও আসে।

পুরানো ছেঁড়া ফাটা শাড়িও পায়। নিজেরটুকু সামলে রাজকুমারের পয়সা থেকে কিছুটা বাঁচায়। যে দিন রাজকুমার কাজ পায় না, অথবা যেদিন রাজকুমার কাজে যেতে পারে না সেদিন পেটের ভাত সেই জোগাড় করে।

ননীবালা রোজই ভাবে অমরটা যদি বড় হয় তাহলে তার কষ্ট কমবে।

সাত আট বছরে অমর শহরে থেকে বেশ চৌকশ হয়েছে। হঠাৎ একদিন তিনটি টাকা আর বিশটা পয়সা এনে দিল ননীবালাকে।

ননীবালা বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পেলি?

মাছ বিক্রি করে।

মাছ পেলি কোথায়?

খুঁটিতে।

খুঁটি? সে আবার কি?

তুমি জানো না মা। যেখানে বেশি মাছ বিক্রি হয়। ওরা বলে খুঁটি। আমি মাছ কুড়িয়ে বিক্রি করেছি।

কুড়িয়েছিলি না চুরি করেছিস?

না মা চুরি করিনি। ওদের ডালা থেকে কুচাকাচা মাছ মাটিতে পড়ে। সেগুলো কেউ নেয় না আমি কুড়িয়ে কলাপাতা করে বাজারে বসতেই একটা বাবু নিয়ে নিল। কত দাম বলতে পারিনি। এই পয়সাগুলো দিল।

ননীবালা অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কালকেও যাব মা।

বিক্রি করিসনি। আমার কাছে নিয়ে আসবি।

পরের দিন অমরচাঁদ ছেঁড়া ন্যাকড়ায় মুড়ে প্রায় আধকেজি কুচো কুড়িয়ে আনতেই ননীবালা জিজ্ঞেস করল, এত মাছ পেয়েছিস?

কালকেও এতটা পেয়েছিলাম।

কিছু মাছ রেখে ননীবালা বলল, এগুলো বিক্রি করে দে। তিনটাকার কম দিসনে।

অমর বাজারের দিকে গেল মাছ নিয়ে। ননীবালা মাছগুলো বাছাই করে রান্না করতে বসল। আধঘন্টার মধ্যেই অমর ফিরে এল সাড়ে তিন টাকা হাতে করে।

কালকে রাজকুমারকে অমরের কথা বলা হয়নি। আজ রাজকুমার ফিরতেই ননীবালা বলল, অমরের কাণ্ড শোন। কাল আর আজ দুদিন পেরায় সাত টাকা উপায় করেছে।

রাজকুমারও অবাক হয়ে গেল, বলল, কি করে?

মাছ বিক্রি করে।

মাছ পেল কোথায়? চুরি করেনি তো?

না রে না। কুড়িয়েছে। খুঁটিতে গেলে মাটিতে যে সব কুচো মাছ পড়ে

থাকে তাই কুড়িয়ে বিক্রি করেছে। কাল পেয়েছিল তিন টাকা পনের পয়সা আজ পেয়েছে সাড়ে তিন টাকা। কিছুটা আমি রেখেছিলাম, তরকারি রেঁধেছি। আমিও মনে করেছিলাম, অমর বুঝি চুরি করে, দেখলাম তা নয়

টাকাটা রেখে দে।

জানিস, ওই যে পাগলীটা ঘুরে বেড়াত তাকে আজ দেখলাম, তার কোলে একটা ছেলে।

কি সর্বনাশ।

সর্বনাশ কেন ?

ছেলের বাবার কি ঠিক আছে। কে যে অপকর্ম করল। পাপ। ভয়ানক পাপ।

রাজকুমার বলতে বলতে থমকে গেল।

ননীবালা বলল, ছেলেটাকে বুকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলাম ওই দোকানটার সামনে বসে ছেলেটাকে বুকের দুধ দিচ্ছে। তুই দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতিস। কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না। ওখান থেকে উঠে আবার গিয়ে বসল ওই হোটেলের সামনে। পাতা কুড়িয়ে খাচ্ছিল নিজেই।

রাজকুমার যেন শিউড়ে উঠল। বলল, আর বলিসনি। ওসব শুনতে ভাল লাগে না। পাগল হলেও তো মা। তাই ছেলেকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকে। ভয় পায়। কেউ যদি কেড়ে নেয়।

ছেলেটা বাঁচবে কি ?

কে বাঁচবে বল। আসছে বর্ষায় যদি বাঁচে শীতে আর বাঁচবে না। থাক ওসব কথা, হীরু বলছিল, একটা ঠেলা বিক্রি হবে। সাতশ টাকা দাম চায়। বলল, যদি টাকা জোগাড় করতে পারিস তা হলে ঠেলাটা কিনে নে। তা হলে তুই নিজের ঠেলা টানবি, কাউকে পিছারি করে নিলে আর ফুটপাতে থাকতে হবেনি তোর বউ ছেলেমেয়েকে। কথাটা তো ভালই। সাতশ টাকা কে দেবে বলতো। চার বছর হয়ে গেল ফুটপাতে পড়ে আছি। কিছুই করতে পারলাম না।

ননীবালা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, কিনে নে।

টাকা কোথায় ?

আমি দেব। সাতশ টাকা কত কুড়ি বলত ?

কুড়ির হিসাব মিলবে না রে। অনেক কুড়ি। বরং তুই টাকাটা বের কর আমি গুণে দেখি।

ননীবালা তার পোটলার ভেতর থেকে একটা ছোট কাপড়ের পোঁটলা দিয়ে বলল, তুই গুণে দেখ।

রাজকুমার গুণতে গুণতে অবাক হয়ে গেল। এত টাকা ননীবালা পেল কোথায় ? এত কষ্টের মধ্যে কি ভাবে সঞ্চয় করেছে এটাই আশ্চর্য।

সাত'শর বেশিই আছে।

ভেবেছিলাম গাঁয়ে গিয়ে এক বিঘে জমি কিনব। তা করে লাভ নেই। তুই উপায় করলে অনেক জমি করতে পারব। আমিও খাটছি। অমরও ধীরে ধীরে ডাগর হচ্ছে। আমাদের চলে যাবে কোন রকমে। তুই ঠেলাটা কিনে নে।

সে রাতে স্বামী-স্ত্রীর অনেক কথা হল।

ননীবালার ইচ্ছা গাঁয়ে ফিরে যাবার। বার বাব জোর দিয়ে বলতে থাকে। রাজকুমার গাঁয়ে যে পেটের ভাত জুটবে না সেটাও বার বার মনে করে দিতে থাকে। অবশেষে কোন মীমাংসা হল না, রয়ে গেল একটা কিন্তু।

রাজকুমার সকালবেলায় টাকা নিয়ে গেল হীরুর কাছে। গিয়েই শুনল এবেলায় কোন কাজ জোটেনি রে রাজু। তুই ডেরায় যা। কাজ হলে তোকে ডেকে নেব।

হীরুর কথা শেষ হতেই রাজকুমার বলল, তুই যে ঠেলা কেনার কথা বলেছিলি।

তুই কিনবি ?

হ্যাঁ। একটু দাম দর কম করলে ভাল হয়।

তা হলে চ। দেখি বেটা খোট্টা বেচে দিয়েছে কিনা।

হীরুর পেছন পেছন রাজকুমার গেল বাগমারী বাজারের কাছে। রামধনিয়াকে খুঁজে বের করে হীরু বলল, গাঁহাক এসেছে রে ধনিয়া। এবার মাল দেখা।

রামধনিয়া ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছিল ফুটপাতের দোকানে। গ্রাহকের নাম শুনেই চোঁ করে ভাঁড় শেষ করে বিড়ি ধরিয়ে বলল, চ, মাল দেখবি।

গলির মধ্যে রামধনিয়ার ঠেলা দাঁড় করানো ছিল। ঠেলা মানে দুটো চাকা আর বাঁশের ফ্রেম। রাজকুমার দেখে শুনে বলল, এটা মেরামত করতে তো কয়েক'শ টাকা দরকার। দুটো চাকা কিনে কি হবে রে হীরু।

হীরু তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, লাইসেন্স আছে। জানিস না লাইসেন্স করা কত হাঙ্গামা, নতুন লাইসেন্স দিতেই চায় না। তুই কিনে নে। দুটো চাকার দাম দিবি। বাকিটা বাঁশ কিনে তুই তো তৈরি করতে পারবি।

তা পারব। তুইও তো তৈরি করতে পারবি।

হীরু কাছে এসে বলল, কত নিবিরে রামধনিয়া ?

হাজার রুপেয়া দিতে হবে।

আছে তো দুটো চাকা। তার দাম এত ?

তাজ্জব কি বাত্ বলছিস রে হীরু। একটো চাকার দামই তো হাজার রুপেয়া। আমার আউর একটা ঠেলা আছে তাই তোকে পানির দামে দিচ্ছি। হামার কাজ করার কোহি আদমি নেহি, ইস লিয়ে বেচতা হ্যায়।

হীরু বলল, পাঁচশ পাবি মাল ছেড়ে দে।

রামধনিয়া রাজি হয় না। অবশেষে সাতশ টাকায় দাম স্থির হল।

লেখাপড়া করে লাইসেন্স রাজকুমারের হাতে দিয়ে বলল, ইবার তুহার নামে লাইসিন বদল করে নিস্। সমজা।

রাজকুমার ভাঙ্গা ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল হীরুর ডেরায়। পকেটে যা ছিল তা দিয়ে বাঁশ কিনে এনে বসল ঠেলাকে চালু করে তুলতে।

সারাদিন চা মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঠেলা নিয়ে এসে হাজির হল ননীবালার সামনে। এসেই বলল, এই হল ঠেলা।

অমর আর খুকি লাফিয়ে ঠেলার ওপর উঠে বসল।

রাজকুমার এখন আর পিছারি নয়। ঠেলার মালিক। নতুন করে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করার সূচনা মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

রঘুয়ার একটা মেয়ে হয়েছে। তাদের নিয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ডেরায় আর তাঁকে দেখা যায় না। লোকমুখে শুনেছে রঘুয়া পোস্তায় জায়গা করেছে। সে আর রিকসা টানে না। ছাতুর দোকান করেনা। এখন মহাজনের কাছ থেকে বস্তা বস্তা আদা নিয়ে পুরানো টাঁকশালের সামনে ফুটপাতে বসে। কখনও খুচরা কখনো পাইকারী দরে আদা বিক্রি করে যা লাভ হয় তা মন্দ নয়। আগে মহাজনের কাছ থেকে ধারে মাল আনত, এখন নগদানগদ। নগদ পয়সায় মাল কিনলে কিছুটা কম দামে মাল পাওয়া যায়। উদ্বৃত্ত ভালই থাকে। মূল টাকায় আর হাত পড়ে না। বউয়ের হাতে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে বলে, খুব সামালকে রাখিস। চোর চোট্টা নজদিক হ্যায়। সামঝা। তার বউ লছমনিয়া একটা কাপড়ের থলে সেলাই করেছে। তাতেই টাকা ভর্তি করে কাঁচুলির ভেতর লুকিয়ে রাখে। প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নেয়। রাত গভীর হলেই মেয়েটাকে কোলে করে নিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কাঁচুলিতে হাত বুলিয়ে দেখে টাকা ঠিক আছে কি না।

লছমনিয়া এভাবে ফুটপাতে আর থাকতে চায় না। রোজই বলে একটি কোঠি দেখ রে রঘুয়া। হামার ডর লাগে। রুপিয়া পয়সা নিয়ে এহি ঠাঁইমে রহনা ঠিক নেই।

রঘুয়া দোকান গুটিয়ে মাঝে মাঝেই বের হয় কোন বস্তিতে কোন ঘরের আশায়। তার পাশে আরও অনেক লোক আদার বেপারি। তাদের মধ্যে যারা বউবাচ্চা নিয়ে থাকে তাদেরও বলে একটা ঘর যদি পাওয়া যায়।

সভিয়া মুঙ্গেরের লোক। জাতে ছোট, দোসাদ। সে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে গঙ্গার ধারে ঝুপড়িতে। সেই একদিন বুদ্ধি দিল, গঙ্গাজীকা কিনারে একটো ঝুপড়ি বানা লে রঘুয়া। উস্মে জরুবাচ্চা লোক রহেগা।

লেকিন জমিন তো হামারা নেহি।

উস্‌মে কেয়া। সরকারকা জমিন। কোহি কুছ নেহি বোলেগা।

রঘুয়ার মনে যুক্তিটা এঁটে বসল। সভিয়ার সঙ্গে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে দর্মা বাঁশ সংগ্রহ করে ঝুপড়ি বাঁধল গঙ্গার ধারে। লছমনিয়া কোমর বেঁধে লাগল আপনা কোঠি তৈরি করতে।

রামজীর কৃপায় তাদের ঘর হল।

সভিয়া দোসাদের বউ ঝড়ুয়া আদর করে তাদের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, সব ইহাঁ পর মৌজসে রহ। কভি কভি পুলিশলোক আর পোর্টমাসী কা বাবু আসলে দো-এক রুপিয়া দেনেসে কোহি তকলিফ্‌ নেহি হোগা।

সহজ সরল রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে রঘুয়া নিশ্চিন্ত মনে আদার ব্যবসায় নেমে পড়ল।

রঘুয়াকে আর চেনাই যায় না।

ঠেলা বেনার আগে একদিন রাতের বেলায় হাওড়া স্টেশন থেকে আদা ভর্তি ঠেলা নিয়ে রাজকুমার আসছিল মহাজনের গুদামে মাল নামাতে। আদার গুদামের মালিক যে রঘুয়া তা রাজকুমার ভাবতেও পারেনি। আদা নামাতে গিয়ে রাজকুমার দেখল, আদার মালিক স্বয়ং রঘুয়া।

আরে রাজকুমার তুম্‌!

হাঁ ভাই। তুমি বুঝি আদার ব্যাপারী।

রঘুয়া লজ্জিত ভাবে বলল, রামজীকা মর্জি।

রাজকুমার ভাবছিল তারই ফুটপাতের হিস্যাদার রঘুয়া আজ মহাজন আর রাজকুমার আজও পিছারি হয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। অনেক রাতে ডেরায় ফিরে রাজকুমার ননীবালাকে রঘুয়ার কথা বলতেই সে বলল, দেখলি তো। রিকসা থেকে আজ রঘুয়া আদার মহাজন। ওরা ফুটে জায়গা না পেয়ে সে সময় তার পায়ে ধরা বাকি রেখেছিল। রঘুয়ার বউ বলেছিল, দেশে ওদের এক ছটাক জমিও নেই। ছোটজাত, বড়জাতের জমি চষতো। বেগার দিত। বদলা পেত কয়েক মুঠো ভুট্টা আর গম। গাঁয়ের বামুন আর রাজপুতদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। গাঁয়ের কুয়ো থেকে জল নিতে দিত না ছোট-জাতদের। ওর বউকে দু'মাইল হেঁটে জল আনতে হত।

রাজকুমার বলল, ও রকম জুলুম সহ্য করতে না পেরে আমরাও তো ফুটপাতে এসে বসেছি। তবে আমাদের দেশে জাতপাতের জ্বালা নেই, জোতদার আর মহাজনের জুলুমে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। দুই জাত আছে আমাদের দেশে, গরীব আর বড়লোক।

ননীবালা বলেছিল ওদেরও যা আমাদেরও তা। ওরা কেমন গুছিয়ে নিয়েছে। ওরা পরদেশী। ওরা পারে তুই পারিস না। তুই তো নিমর্দা, বললাম তেলে ভাজার দোকান কর, তাও করলি না।

ননীবালা কথা শেষ করে তিনখানা ইঁট পেতে রান্নার জোগাড় করল।

রঘুয়াকে দেখা অবধি রাজকুমারের জেদ চেপেছিল তার কপাল ফেরাতে হবে। সুযোগ পেয়ে গেল। হীরুর সাহায্যে রামধনিয়ার ঠেলা কেনবার। ভাঙ্গা হলেও অত কম দামে কলকাতা শহরে ভাঙ্গা ঠেলাও পাওয়া যায় না।

নতুন ঠেলা পেয়ে রাজকুমার পিছারি জোগাড় করল তারককে। তারকও দখিনের জোয়ান মরদ। শেয়ালদা স্টেশনে মুটেগিরি করত। বিনা লাইসেন্সের মুটেকে পুলিশ মাঝে মাঝেই হাজতে পুরে দেয়। হাতকড়ি দিয়ে আদালতে যায় মাঝে মাঝে আবার মোট পেতে শেয়ালদহের প্লাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজকুমার তাকেই পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। তারকও সহজেই রাজি হল। তারক আসার পর রাজকুমারের ঠেলা একদিনও বসে থাকেনি। প্রায় দিনই ডবল আয় হয় ফিরতি ভাড়া পেয়ে।

কদিন ধরেই ঠেলা নিয়ে যাচ্ছে ঢাকুরিয়া স্টেশন পেরিয়ে কসবার দিকে। মাঝে মাঝেই লেভেল ক্রশিং-এ অপেক্ষা করতে হয়। তাদের সম্মুখ দিয়ে গাড়ি উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়, দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায়। দক্ষিণের গাড়ি দেখলেই রাজকুমার কেমন একটা ব্যথা অনুভব করে। তার মনে ভেসে ওঠে তার গাঁয়ের জীবনের আবছা স্মৃতি। এই গাড়িতে চাপলে সেও ফিরে যেতে পারত তার গাঁয়ে। সে সব স্বপ্ন। রাজকুমার তবুও ভাবে, ঠেলা তার লক্ষ্মী। এভাবে চললে বছর শেষে সে ফিরে যাবে গ্রামে, ঘরটা মেরামত করে কদিন বাস করবে। সুবিধা মত যদি পাওয়া যায় তা হলে দুচার কাঠা জমিও কিনবে। বাপঠাকুরদা যা পারেনি তাই সে করবে। চাষার ছেলে। আর কিছু পারুক আর না পারুক, কিছু আনাজ তরকারীর চাষ করে কলকাতার বাজারে আনলে দিনান্তে পঁচিশ টাকা আয়ও হবে, বেশিও হতে পারে। আবার নিজের ঘরে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করতেও পারবে। রাজকুমারকে অন্যমনস্ক দেখে তারক হেঁকে বলল, কি ভাবছ রাজুদা গেট খুলেছে। টানো।

রাজকুমার 'হুঁ' বলে ঠেলা টানতে থাকে। তারক পিছারি করে। রেল লাইন পার হয়ে রাজকুমার বলল, জানিস তারক ট্রেন গেলেই মনে হয়, কবে বাড়ি ফিরব।

বাড়ি কি আছে রাজুদা আমরা সবাই তো ভিখিরি। ভিখ্ মাংতে এসেছি গাঁ ছেড়ে শহরে। ও সব ভুলেই গেছি।

তুই বিয়ে করলি না কেন?

ওটা আর বল না রাজুদা। বিয়ে তো করেছিলুম। নন্দু পাইকের মেয়ে অলকাকে। আর শুনে কাজ নেই। অলকা পালিয়ে গেল। বাস্। ঘেন্না ধরে গেছে বিয়েতে। সারাদিন কাজ করে রাতের বেলায় দু'গেলাস চোলাই খেয়ে সবই ভুলে থাকি। জোরে টানো রাস্তাটা ভাল নয়, দেখছ তো।

রাজকুমার কোন প্রশ্ন না করে ঠেলা টানতে থাকে। তারক পেছন থেকে ঠেলতে থাকে। মালিকের মোকামে পেঁছে জিরোতে থাকে দুজনেই।

্রাজকুমারের মন তখন ছ্টছে বলগাহীন ভাবে পঞ্চাশ মাইল দূরের ছোট গ্রামটায়। নোনা জল, নোনা মাটি, তাল খেজুর আর নারকেল গাছ। দলা জমিতে হোগলা বিনা আর কোন বৃক্ষ ঝাড়ঝোপের সাক্ষাৎ মেলে না। সম্বৎসরের একটা ফসল ঘরে তুলে আলস্যে যেখানে দিন কাটাতে হয় বৎসরের বেশির ভাগ সময়। তবুও মনোহারি সেই দুর্গম অঞ্চল, এই সবই তার মনটা আচ্ছন্ন করে রাখে অনেক সময়ই।

বিড়িতে সুখটান দিয়ে তারককে বলল, তুই আবার বিয়ে কর তারক।

না রাজুদা এই আছি ভাল। মাঝে মাঝে নিয়ামতের মেয়েটা আসে। স সময়টা খোষ মেজাজে থাকি। আসল কথাটা হল পকেটে রেস্ত না থাকলে কান মাগী-ই ঘর করে না, ফাঁকা পকেট দেখলেই ওরা পালিয়ে যায়। তার চয়ে বিয়ে না করে মাঝে মাঝে মেয়ে খুঁজে নেওয়া ভাল। পকেটে পয়সা াকলেই ওরা আসবে। পয়সা ফুরোলেই ওরা বলবে চন্নু। আমি বলব, াবার আসিস। বাবুদের বাড়িতে ঠিকে ঝি কাজ করে যেমন তেমনি ঠিকে ময়ে নিয়ে কারবার করা ভাল।

যদি ছেলেটেলে হয় তখন কি করবি।

তারক হেসে বলল, ঠিকে মেয়েমানুষের ছেলের বাবা যে কে তা মেয়োনুষটাই বলতে পারবে নি।

রাজকুমার সমাজতত্ত্বের এমন সহজ সরল বিশ্লেষণ শুনে চুপ করে গেল। ারক মদ খায়। হাতে পয়সা হলে ফুটপাতের মেয়েদের নিয়ে বাসা বাঁধে। ার যখন কিছুই থাকে না তখন মজুরী খাটতে বের হয়। বিয়ের প্রসঙ্গ াদ দিয়ে রাজকুমার বলল, হাঁরে তারু, তোর মায়ের সঙ্গেই তো দেশ থেকে সেছিলি। মা কি মারা গেছে?

তারক একগাল হেসে বলল তুমি যেমনটি কথাও তেমনটি। সেতো দশ ছর আগের কথা। আমাকে ময়লা কাগজ কুড়াতে দিয়ে মা হাওয়া। ারপর আর জানিনা। কাগজ কুড়িয়ে বস্তা ভর্তি করে বাজারে বেচতুম। তা য়ে চার টাকার বেশিই পেতুম। দুজনের পেট চলত না। মা বোধহয় ামার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার য়স বার তের। চার টাকায় আমার বেশ চলে যেত। মাকে খুঁজে বের করার ার সময় পাইনি রাজুদা। এতদিন কি আর বেঁচে আছে। থাকলেও কেউ-উকেই চিনতে পারব না। তবে গাঁয়ে আছে কিছু রিস্তাদার। দুনিয়াতে াপনজন বলতে আর কেউ নেই। শেয়ালদতে বড় বন্ধু ছিল পুলিশ। তারা য়সা পেলে আদর করত, পয়সা না পেলে হাজতে ঢোকাত। তোমার কাছে াসা অবধি পুলিশ বন্ধু হাওয়া হয়ে গেছে।

এবার ওঠ। মাল নামিয়ে ফিরতি পথ ধরি।

ফিরতি ভাড়া আজ আর পাব না বোধহয়।

রাস্তায় পেয়েও যেতে পারি। নে ওঠ। দু'হাতে মাল নামালে ডেরায় ফিরতে পারব সন্ধ্যার আগেই।

সন্ধ্যের আগেই রাজকুমার ফিরে এসে দেখল রাধারানীর মা বেলা ননীবালার সামনে বসে কাঁদছে। ফুটপাতের জমিদারদের কয়েকজন গৃহিণী ভিড় করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে, কেউ কেউ আহা-উহু, করছে।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে বেলা ?

আদানীকে ছুরি মেরেছে আফসার। হাসপাতালে দিয়ে এইচি। এখন কি করি বল দিকি রাজু। মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে।

রাজকুমার অবাক হয়ে গেল। আফসারের সঙ্গে মিলজুল না হওয়াতে এই ঘটনা। তার মনে পড়ল দামিনীর কথা। দামিনী চালাক মেয়ে। সে বুঝেছিল, বিপদ হতে পারে তাই সবার আগেই একেবারে কলকাতা ছেড়েছিল। রাধারানী বোকা তাই তাকে ছুরি খেতে হয়েছে। সবাইয়ের মানা অগ্রাহ্য করে রাধারানী গিয়েছিল আফসারের ঘর করতে। রাধারানী মনে করেছিল, সুখেই থাকবে। আফসার বিহারী। রাধারানীর ইচ্ছে হয়েছিল তার শ্বশুর-বাড়ি যাবার, তাই অঘটন।

রাধারানী জুলুম ধরেছিল আফসারের মুলুকে নিয়ে যেতে। আফসার মোটেই রাজি নয়। নানা অজুহাতে রাধারানীকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। কদিন ধরে দুজনের ঝগড়াঝাটি চলছিল।

হয়ত আরও কিছুকাল ঝগড়া চলত।

হঠাৎ তা বন্ধ হল মুলুক থেকে আফসারে শালা বসিরের আগমনে।

কথাবার্তায় বুঝল, আফসারের বিবি বাচ্চা আছে তার দেশে।

বসির জিজ্ঞেস করল, এ কোন্ ছে ?

রাখেলা !

সত্যিই রাধারানী ছিল তার রাখেলা। রাধারানী ভাবতেও পারেনি পরিণতি এমনটা হবে। আফসার এতকাল তাকে সব কিছু গোপন করেছে। মাঝে মাঝে মুলুক গেছে। কিন্তু বিশেষ দেরি করেনি দশ বারদিনের মধ্যে ফিরে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে বলেছে, খেতিকাম করতে দেশে যেতে হয় মাঝে মাঝে।

সব কিছু বুঝেই রাধারানী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই আফসার বাধা দিল।

রাধারানী কোন যুক্তি শোনার মত মেয়ে নয়। সে বলল, তোর বিয়ে করা বউ আছে তা বলিসনি কেন। আমি তো ঘর করব না। চললাম।

থাম মাগী। আমি মুসলমান। চার বিবি আমার জায়েজ।

আমি তোর বিয়ের বিবি নই। নিকের বিবিও নই। আমি তোর ঘরে থাকব না।

ঝগড়াটা জমে উঠতেই আফসার রাগের মাথায় পেনসিল কাটা ছুরি দিয়ে

রাধারানীর গাল দু'ফাঁক করে দিল। রক্ত দেখেই আফসার ঘাবড়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে দিল দৌড়। বসির মিঞা হকচকিয়ে পাশের চায়ের দোকানে বসে ভাবছিল কি করে মুলুক ফিরে যাবে। খবর পেয়ে বেলা গিয়েছিল। মেয়েকে নিয়ে সোজা থানায়, সেখান থেকে মেয়েকে হাসপাতালে জমা দিয়ে ফুটে এসে চিৎকার করে লোক জমায়েত করেছে। সব শুনে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কেউ বিশেষ আগ্রহ দেখাল না।

ওদিকে পুলিশ এসে আফসারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজছে। জবানবন্দী নিয়ে বিদায় হয়েছে।

তারপর যে কি তা রাজকুমার জানে না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার ফিরে এল ফুটপাতের জমিদারদের স্বাভাবিক জীবন।

কয়েকদিন পরে রাতের বেলায় একদল জওয়ান ছেলে এসে বলল, কাল তোদের যেতে হবে।

কথাটা বুঝতে না পেরে রাজকুমার বিস্মিত ভাবে বলল, কোথায়?

জানিস না। কাল ময়দানে মিটিং। সেখানে ফুটের সবাইকে যেতে হবে। দুপুরে শেয়ালদহে যাবি। মিছিল করে যাবি। ভুলিস না যেন।

কিন্তু আগাম বায়নার টাকা নিয়েছি। কাল কাজে যেতেই হবে সকালে। নইলে মহাজনের ক্ষতি হবে। আমারও পেট আছে তো!

ওদের একজন বলল, কাল খেতে পাবি মাঠে। আর মহাজন? সে আমরা বুঝব।

তা হয় না বাবা, বেইমানি করতে পারবনি।

তুই যে দেখছি ধম্মপুত্তুর। কাল মিছিলে না গেলে ফুটে আর থাকতে পাবিনে, বুঝলি।

আমার বউ গেলে হয় না?

বউও যাবে। তোকেও যেতে হবে।

এবারকার মত মাপ করে দাও বাবুরা। এরপরে যেদিন বলবে সেদিনই যাব।

বেশ। তবে ফুটের সব লোক যখন যাবে তোর বউও যেন তাদের সঙ্গে যায়। বলে রাখিস।

সকালবেলায় পতাকা নেড়ে একদল লোক নিজের দলের জিগীর দিল তা শুনেই ফুটের লোকেরা হুরমুর করে উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হল মিছিলে যেতে।

দিল্লীর মন্ত্রী আসছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

ননীবালা মেয়ের হাত ধরে চলল স্টেশনের চত্বরে।

যাবার আগে রাজকুমার বলল, দল ছাড়িস না যেন। তাহলে উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণে চলে যাবি। খুবই ভিড় হবে। বুঝলি। মন্ত্রী আসছে দিল্লী থেকে। এই রাস্তার নামতো জানা আছে। ভুল হলে লোককে জিজ্ঞেস করিস।

ননীবালা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রওনা হল। রাজকুমার বের হল তার ঠেলা নিয়ে। তারক মিছিলে যায়নি। সেও এসে গেছে।

তুই ময়দানে যাবিনি তারু ?

না রাজুদা, ওরা তো আমাকে খেতে দেবে না। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খেতে দেবে বলেছে'।

তুমি গেলে না কেন ?

ওসবে আমি যাই না। আবার না গেলেও পাড়ার মস্তানরা ফুটের আস্তানা ভেঙ্গে দেবে। তাই তোর বউদিকে যেতে বলেছি।

ননীবালা রাতের বেলায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল মেয়ের হাত ধরে। সারাদিন নানা পথ হেঁটে ক্লান্ত, খাবারও জোটেনি, চারখানা শুকনো পোড়া রুটি একটু গুড়.দিয়েছিল বাবুরা। জল খেতে যেতে হয়েছিল আরও দূরে। অনেকে জল না পেয়ে পাশের পুকুরের জল আঁজলা ভর্তি খেতে বাধ্য হয়েছে। মাঠের পশ্চিমদিকটা মলমূত্রে এমন অবস্থা করে রেখেছিল যা দেখলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বউবাজারের নর্দমা সকালে ধাঙ্গড়রা যখন পরিষ্কার করে তখন যেমন পচা দুর্গন্ধ বেব হয় তার চেয়েও নক্কারজনক জায়গা। ননীবালার ইচ্ছে ছিল তখনই ফিরে আসা কিন্তু পথ হারাবার ভয়ে তার দলের লোকদের কাছছাড়া হতে পারেনি।

মাঠের শেষের দিকে বসেছিল মাঝবয়সী একটা বিধবা, তার সঙ্গে দুটো মেয়ে আর একটা'ছেলে। ননীবালা ভিড় সহ্য করতে না পেরে তাদের পাশে গিয়ে বসেছিল। জল তেষ্টায় যখন মেয়েটা ছট্‌ফট্ করছিল তখন বিধবা মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, জল আছে ?

হায় কপাল। মহিলাটি তার কথা বুঝতে পারল না।

আবার বলেছিল, পানি হ্যায়।

ওঃ পানি। বলেই একটা মাটির কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিল একটা মাটির ভাঁড়ে।

আলাপ জমে উঠল।

তুমি কোথা থেকে আসছ ?

মন্দ্রাস সে।

কেন ? কি কাজ কর এখানে ? আকারে ইঙ্গিতে দু একটা হিন্দী শব্দ দিয়ে দুজন দুজনকে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

মহিলাটি বলেছিল, আমি সার্কাস করতাম। এখন করি না। সার্কাসের লোকের সঙ্গে বিয়ে করেছিলাম। একটা ছেলে হল, কোম্পানী নোটিশ দিল। আর ছেলেমেয়ে হলে চাকরি থাকবে না। বরাত বহিনজি, আরও দুটো মেয়ে হল। চাকরি গেল, স্বামী মরল কিন্তু পেট তো মরল না। চারজনের পেট। কি করি। ছেলেমেয়েকে খেলা শেখালাম। সারা হিন্দুস্তান খেলা দেখিয়ে

বেড়াই। কখনও মণিপুর কখনও আমেদাবাদ কখনও জম্মু কখনও কোচিন। পেট চলে যায়।

এত জায়গা ঘুরলে তো গাড়ি ভাড়া দরকার। কোথায় পাও।

খেলা দেখিয়েই পয়সা পাই। তবে বছরে একবার কলকাতায় আসি। তিন মাস থাকি। এই শীত এলেই চলে যাই দক্ষিণে। কলকাতায় ভাল পয়সা পাই। ছেলে তারের খেলা দেখায়। মেয়েরা পোলের খেলা দেখায়।

আলাপ তাদের জমে উঠেছিল ভালই।

মহিলাটি দুঃখ করে বলেছিল, বালাম্মা, তোর কখনও কষ্ট হবে না। খেলা দেখিয়ে ভালভাবেই দিন গুজরান হবে। তা মন্দ হয় না। তবে আজকাল কলকাতার এই মাঠে খেলা দেখাতে বড়ই অসুবিধা। সপ্তাহে তিনদিন লাল ঝান্ডা আর তে-রঙা ঝান্ডার লোক এসে জড় হয়। আমাদের খেলা দেখার লোকের বড় অভাব হয়। খোলামেলা জায়গার অভাবে রুটিরুজিতে টান ধরে।

ননীবালা বলল, পাড়ায় গেলে পার।

এবার থেকে তাই যাব কিন্তু এই ময়দানে হররোজ লাখো লোক আসে তাই এখানে ভাতের অভাব হয় না। বড় মেয়েটার বিয়ে দিলে আবার পেটে টান ধরবে?

কোথায় বিয়ে ঠিক করেছ?

ঠিক হয়নি। মেয়েকে বাঙ্গালী, মেরুয়া, খোট্টা, চীনা সবাই লোভ দেখায় বিয়ে করতে। এবার দেশে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসব, পাত্র ঠিক করব। শুনলাম, দি গ্রেট আর্ট সারকাসে মেয়ে খেলোয়ার দরকার। বিজয়াকে তাতেই দিতে চেষ্টাও করব।

বিয়ে করলে তো চাকরি থাকবে না।

তা ঠিক। চাকরি থাকবে তবে বাচ্চা হলেই চাকরি খারিজ। বাচ্চার জন্যই তো বিয়ে করা। বিয়ে করবে, বাচ্চা হবে না। এতো কথা নয়। মালিকরা পয়সা চায়, পয়সা পেতে অসুবিধা হলেই চাকরি খতম।

ননীবালা সব না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝেছিল।

তোমরা কি কর? প্রশ্ন করেছিল বালাম্মা। কোথায় থাক?

তোমরা ময়দানে ঝুপড়ি বেঁধে থাক। আমরা থাকি ফুটপাতে। আমার কোন কাজ নেই। আমার স্বামী কাজ করে।

আমরা ময়দানে থাকি। পাশে থাকে বাঁদরওলা মির্জা আলি আর তার ছেলে। ওরা বিহারের লোক বিবি আর অন্য সব বাচ্চারা থাকে মুলুকে। মাথার দিকে থাকে ভালুকওলা। খেলা দেখায়। রাতের বেলায় একগাদা পচাপচকি ভালুকগুলোকে খাওয়ায়। ভালুক মেহনত করে অথচ খেতে পায় না। খিদের জ্বালায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে। নাকের মাঝ দিয়ে মোটা রশি ঢুকিয়ে মুখটা এমন ভাবে বাঁধা থাকে, যার জন্য ভালুকের চিৎকারটা

গোঙ্গানি মনে হয়।

ননীবালা বলল, ওদের কষ্ট তো হয়।

কি করব। আমাদের পেট তো ভর্তি করতে হবে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। ওরাও নিজের পেট ভরায় জানোয়ারকে শুকিয়ে রেখে।

ভালুকটা মরে গেলে তখন কি করবে?

আরেকটা কিনতে হবে।

বলেই বালাম্মা গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষ জাতটাই এই রকম। দেখ না, আমাদের চাকরি গেল, কেউ ভাবল না আমরা কি খাব! ওরা দরকার হলে খোশামোদ করে, দরকার না মেটালে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। ভালুকটাও বোধহয় মানুষের কথা বোঝে। তাই দরকার মেটায়। বোধহয় জানে দরকার না মেটালে তার জীবনের কোন দামই আমরা দেব না। ওকে আমার মত না খেয়ে থাকতে হবে! তাই আধা পেট খেয়েও মনিবের হুকুমে খেলা দেখায়।

ননীবালা শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ বলে উঠল, ঠিকই বলেছ। আমরা হলাম জোয়ারের ভাসা ময়লা। জোয়ারে ভাসতে ভাসতে উজানে যাই আবার ভাটার টানে নিচে নেমে আসি। তোমাদের দেশে আমাদের মত লোক বোধহয় নেই।

বালাম্মা হেসে বলল, আছে গো আছে। বড় শহরের ফুটপাতে হাজার হাজার মানুষ তোমাদের মতই ফুটপাতের জমিদার। ফুটপাতে সংসার সাজায়, ফুটপাতে মা হয়। ফুটপাতেই মরে। তাদের হিসাব কেউ নেয় না, আহাও বলে না। তুমি তো সব দেখলে, আমরা পেটের দায়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াই, আমরা দেখি, জানি, চোখ মুছি কিন্তু ভরসা করি নিজেদের হিম্মতের ওপর। ভিখ্ মাংবো না, রোজগার করব কষ্ট করে। যা আমাদের পেশা তাই আঁকড়ে ধরে থাকি।

তাদের গল্পের মাঝে বাধা পড়ল।

কয়েক হাজার মানুষের চিৎকারে পাশের লোকের গলার শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। দুইজনে চুপ করে গেল।

চিৎকার থামতেই বালাম্মা বলল, উঃ বাপ্। আমাদের কোন শহরে এত লোক কখনও দেখিনি। মানুষ আর মানুষ। ভাল। এত মানুষ আছে তাই পেটের ভাত জুটছে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে রাস্তার আলো জ্বলে উঠল।

ননীবালা উঠে গিয়ে খুঁজতে থাকে তার সঙ্গীদের। রাস্তাঘাট তার চেনা নেই। দলের সঙ্গে এসেছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আস্তানায় ফিরে যাওয়া

কঠিন। তাই সঙ্গীদের খোঁজ করতে ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বালাম্মা তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে অনেকটা হাল্কা করে নিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ননীবালা দেখা পেল অজিতের। অজিত তার গাঁয়ের ছেলে। সেও এসেছে দলের সঙ্গে। অজিতকে ননীবালা চিনতে পারেনি কিন্তু অজিত ঠিকই চিনেছিল। অজিত চালের ব্যবসা করে। মাঝে মাঝেই সে কলকাতায় আসে কিন্তু তার দৌড় বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি। সেখানকার পাইকারদের ঘরে চাল জমা দিয়ে নগদ কড়ি বুঝে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আজ তার আসার কথা ছিল না। কিন্তু গাঁয়ের মোড়লরা চাপাচাপি করে তাকে মিছিলে এনেছে। তার সঙ্গীরা কোথাও থেকে গেছে। একাই ফিরছিল। ময়দান পেরিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল বালিগঞ্জ যাবার বাসের আশায়। রাস্তার ঝকঝকে আলোতে ননীবালাকে দেখেই চিনতে পেরে বলল, নোন্যা না।

ননীবালা ছেলেমেয়ের হাত ধরে থমকে দাঁড়াল। অত ভিড়ে তাকে নোন্যা বলে ডাকতে পারে তার গাঁয়ের মানুষ। মুখ ফিরিয়ে দেখল প্রশ্ন কর্তাকে।

চিনতি পারলি নি? আমি অজিত খালের পাড়ে থাকি তোর বাপের গাঁয়ে।

অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, আরে তাইতো। হেলুকাকার ব্যাটা, কোথায় এইছিলি।

মাঠে মিটিং শুনতে। তুই এখানে কেন—

মিছিলে ছিলুম। সবাই চলে গেছে। ভাবছিলাম কি করে যাব। ভালই হল, তোর সঙ্গেই যেতি পারব বো-বাজারে।

বউবাজারে থাকিস বুঝি?

অজিত ইতস্তত করে বলল, আমি তো বালিগঞ্জ যাব।

যাবি যাবি। আমাকে পেঁছে দিয়ে যা। শ্যালদ থেকে তো যেতে পারবি।

বেশ চল। আজকাল রাজকুমার কি করছে?

ঠেলা কিনেছে। তাতেই চলে যায়। তুই তো গাঁয়েই আছিস, কি করিস? বিয়ে টিয়ে করেছিস? ছেলেপুলে কটা?

আর বলিসনি। শালা শুয়োরের পাল। তিনটে মেয়ে। একটু আস্তে চল। বড়ই ভিড়।

ভালই। তিনটে মেয়ে।

তুই তো বললি ভালই। কি করি জানিস। চাল বেলাক করি। কামটা কি ভাল? বামুনের ছেলে, কোন কাজ পাইনি তাই, ভাল কাজ পাইনি তাই ছোট কাজ করি।

কি জানি, তোরাই জানিস।

আর বলিস নি। আমাদের নিরোদাকে চিনিস, তার বৌটি অমলা। তার কপালে কি জুটেছে জানিস? ওরা দল বেঁধে চাল আনত। তারপর একদিন পুলিশে ধরল অমলা আর নেড়ীকে। তারপর?

তারপর কি? জেলে গেছে বুঝি।

তুই ওসব বুঝবি নে। থানায় নিয়ে যাবার নাম করে টানতে টানতে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যা হয়। ও কথা মুখে বলা যায় না। অমলা তো কুমারী মেয়ে। এখন পুলিশের ছেলে পেটে করে কেঁদে বেড়াচ্ছে। নেড়ীর মরদ আছে, সে তো ধুয়ে মুছে ভাল মানুষ হয়ে রইছে।

বলিস কিরে। তা হবে। আমাদের ফুট থেকে মাঝে মাঝে সেয়ানা মেয়েদের টানতে টানতে নিয়ে যায় গুণ্ডোরা। সবই কপাল। এখন বুঝলাম, পুলিশেও গুণ্ডা আছে।

নারে কপাল নয়। এটা হল পাপীর কাজ। সামলে চল। ছেলেটার হাত ভাল করে ধর, মেয়েটাকে আমি ধরছি। ভীড়ে হারিয়ে গেলে আর কেঁদে কুল পাবিনে। কলকাতা শহর, আজব শহর। সব ভেজাল, মানুষেও ভেজাল। আমিও ভেজাল, তুইও ভেজাল।

অমলা আছে কোথায়?

উর কপালে দুঃখ আছে। বাপেও স্থান দেয় না। এবার কলকাতায় এসে লাইনে না দাঁড়ায়।

তা করবে কেন? খুঁজে পেতে বে' করবে। সংসার করবে।

কে বে' করবে। তৈরি ছেলের বাবা কি কেউ হতে চায়।

তৈরি ছেলের মা যদি হয় তা হলে তা হবেনি কেন? তোরা তিনটে বে' করিস বউ তাড়িয়ে আর আমরা পারবনি কেন?

অজিত অবাক হয়ে গেল ননীবালার কথা শুনে। কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে ননীবালার মেয়ের হাত ধরে।

ডানে চল্ নোন্যা। এইটি হল বউবাজার। সোজা শেয়ালদ।

ননীবালা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, তুই না থাকলে কি যে হত। আমি হয়ত গাভীন গরুর মত হেলতে দুলতে কোথায় গিয়ে উঠতাম কে জানে। চল আমার আস্তানায়। খুকীর বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণ এসে গেছে।

চল। ওই পথেই তো যেতে হবে। রাজুদা থাকলে দেখা হয়ে যাবে।

আস্তানায় পেঁছিতে বেশ রাত হয়েছে।

ননীবালাকে দেখে রাজকুমার খুশী মনে বলল, এতক্ষণে মিটিং শেষ হল? অজিতকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, একে চিনতে পারলুমনি।

ননীবালা হাসতে হাসতে বলল, পেরথমে আমিও চিনতে পারিনি গো। আমাদের গাঁয়ের বামুনপাড়ার হেলুকাকার ছেলে অজিত। ভাগ্যি উর সাথে দেখা পেয়েছিলুম, নইলে আস্তা হেরিয়ে আসতে পারতুমনি। উঃ বাবা,

কি ভীড়। আমাদের আড্ডার মানুষগুলো কোথায় হেরিয়ে গেল।

রাজকুমার পকেট থেকে বিড়ি বার করতে করতে বলল, বস ভাই। নে, ততক্ষণ একটা বিড়ি খেয়ে জিরিয়ে নে।

অজিত ফুটপাতের ওপর পাতা ছেঁড়া চটের এককোণায় বসে বিড়িতে আগুন দিল। দিতে দিতে বলল, তা হলে ভালই আছ রাজুদা।

তা বলতে পারিস। ঠাকুর বাবা ছিল ফকিরচাঁদ বাবা ছিল নফরচাঁদ আমি হলাম রাজকুমার, কপাল রে কপাল। আমি রাজকুমার কলকাতার ফুট-পাতের রাজা হয়েছি। রাজারা খাজনা দিত সরকারকে, আমরা খাজনা দেই পুলিশকে, মস্তানকে। তাও শালিয়ানা নয়, রোজানা। না দিলে বউ বেটা বেটির এই আস্তানাও থাকবেনি।

ননীবালা সামনের খোট্টার দোকান থেকে দু'ভাঁড় চা এনে দুজনের সামনে রেখে বলল, তোরা খা। তোর জাত যাবে না, খেয়ে নে অজিত।

তুই খাবিনে? জিজ্ঞাসা করল অজিত।

না। আন্না-বান্না করতে হবে। দুপুরে শুকনো রুটি চিবিয়েছি, বাবুরা দিয়েছিল। আর উরতো জোটে নি। পাঁউরুটি আর চা খেয়েই কাটিয়েছে। চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দি। তোরা কথা বল।

অনেকক্ষণ রাজকুমারের সঙ্গে দেশের ও নিজের ঘর সংসারের গল্প করে অজিত রওনা দিল। শেষ ট্রেনটা না পেলে বড়ই কষ্ট হবে। যাবার সময় ননীবালাকে বলল, চললাম রে নোন্যা।

আবার আসিস। বলে ননীবালা মৃদু হেসে তার কৃতজ্ঞতা জানাল।

দেখি, বলে অজিত স্টেশনের দিকে জোর হাঁটা দিল। রাত দশটা তখন পেরিয়ে গেছে।

সকালবেলায় রাজকুমার ঠেলা নিয়ে বেরিয়ে গেল রাতের পান্তা পেট ভর্তি করে খেয়ে।

ননীবালা তখন ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে।

বাজারে যাব মা? ছেলের প্রশ্ন শুনেই ননীবালা মুখ ফিরিয়ে বলল, একা যাসনি, খুকীকে সঙ্গে করে নে যা।

ছেলেমেয়ে বাজার কুড়াতে গেল।

ননীবালা ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে বসল। সামনের শীতে গায়ে দেবার মত কিছু নেই। এই সময় মেরামত করে রাখলে ছেলেমেয়েরা শীতে কষ্ট পাবে না। রাজকুমারের পিছারি তারকের কাকিমা মরিবালা এসে বসল ননীবালার পাশে।

আজ কাজে যাওনি কাকী?

ন্না, দেহটা ভাল নেই। তিন বাড়ির কাজ আর করতে পারছি না। পায়ে পা লেগে যায় রে নোন্যা। ভাবছি একটা কাজ ছেড়ে দেব।

তুই কাজ ছেড়ে দিলে পেট চলবে কি? তোর বর তো ঠ্যাং ভেঙ্গে পড়ে আছে

গাঁয়ে। তাকেই বা খাওয়াবি কি? তাও যদি একটা ছেলে থাকত।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মিরবালাও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোথায় যে শূন্যতা তা মিরবালা স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে উপলব্ধি করে চুপ করে গেল। হঠাৎ বলে উঠল, মামা। মামার জন্যই আমার এই দশা।

কপাল রে কাকী। ওটা কারও দোষ নয়। খোঁড়া লোকটা তো কম কামাই করে নি, তুই রাঁখতে পারিসনি। কলকাতা চষে বেরিয়ে ভিক্ষা করে মাসে মাসে কয়েক কুড়ি টাকা তোকে দিত। শুনেছিলাম কয়েক বিঘে জমিও করেছিল সেই টাকা থেকে। এখন তো বিছানায়, জমির ধানেই তো চলে যেত। তা না, তুই রোজগার করে টাকা পাঠাস। এটাই তো কপাল।

মরদটা কামাই ঠিক করেছিল বিস্তু ওর ভাইরা সব খেয়ে দিলে। জমিনের ধান তো বর্গাদার ভাইরা খায়। নাম নিকিয়ে নিয়েছে ভাইরা। দুটি খেতে দেয় তাও কখনও দুই সন্দে দেয়, কখনও দেয় না। তাইতো আমাকে কলকাতা আসতে হয়েছে। বেমারী লোক, চিকিচ্চে করতে হয়। পুরনো কাপড় জোটাতে হয়, বিড়ি তামাকের পয়সা জোটাতে হয়। নইলে কি এই দেহ নিয়ে বাবুদের বাড়িতে বাসন মেজে বেড়াতুম। তুই ঠিকই বলেছিস, কপাল।

ছেলেমেয়েরা বাজার কুড়িয়ে ফিরেছে তখন।

ননীবালা বাছতে বসল। মিরবালা উঠে যাচ্ছিল।

যাসনি কাকী। আজ আর আন্না করতে হবেনি। এখানেই দুটো মুখে দিস।

খেতে ইচ্ছে নেই। মুখটা তেতো। গলা দিয়ে কিছুই নামতে চাইছেনি।

হাসপাতালে যাসনি কেন? ওমা, তোর গা পুড়ে বাচ্ছে। তারকটা এলে তোর যা হোক ব্যবস্থা করব। শুয়ে থাক। ঘাম দিলে উঠে মুখে কিছু দিস।

মিরবালার জ্বর ক্রমেই বাড়তে থাকে। ইসারা করে বলল, একটু জল দে।

ননীবালা এক বাটি জল তাকে দিয়ে বলল, তোর মাথাটা খুব গরম। একটু মাথা ধুইয়ে দি। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি জল আনছি।

মিরবালা ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়েই বমি করে ফেলল।

ননীবালা কিছুই বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি জল এনে মাথা ধোয়াতে আরম্ভ করল, ছেলেমেয়েকে বলল বাজার কুড়ানোগুলো বাছাই করতে।

কোনরকমে রান্না শেষ করে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ননীবালা বসে রইল রাজকুমারের জন্য। খেটে এসে খেতে যদি না পায় তা হলে লোকটা রোজগার করবে কি করে।

তিনটের পর রাজকুমার আর তারক ফিরে এল। ননীবালার কাছে সব শুনে তারক গেল পাশের ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তার তখন নেই। মুখ শুকিয়ে ফিরে এসে বলল, সন্দের আগে কিছু করা যাবেনি। ততক্ষণ ওর মাথায় জল দি।

কি বললি বউদি ? আজ আর খাওয়া হবেনি। তুই রাজুদাকে ভাত দে। আমি কাকীকে দেখছি।

সন্ধ্যাবেলায় ধরাধরি করে মরিবালাকে পাশের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার দেখে শুনে বলল, মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া। রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। কালকে রক্ত পরীক্ষা করবে। এই ওষুধটা লিখে দিলাম কিনে নিও।

ডাক্তারকে দক্ষিণা দিয়ে ওষুধ কিনে তারক ফিরে এল রাজকুমারের আস্তানায়। মরিবালা তখনও শুয়ে।

শেষ রাতে মরিবালার জ্বরের বেগ কমল।

সবাই রাত জেগে তার পাশে বসেছিল। ভোর হতেই রাজকুমার তারককে জিজ্ঞেস করল, তুই কি যেতে পারবি রে তারু ?

যাবই মনে করছি। কাকীর তাপ তো কম। বউদির হেপাজতে থাকুক। পয়সা না হলে কাকীর ব্যবস্থা করতে পারবনি। আজ ডবল খেপ। তাই না রাজুদা ?

রাজু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ঠেলা আনতে গেল।

পোস্তা থেকে ফেরবার সময় রঘুয়ার সঙ্গে দেখা। রঘুয়া এখন ছোটখাট মহাজন। তবে তার অবস্থার পরিবর্তন হলেও রাজকুমারকে ভুলতে পারে নি।

আরে রাজকুমার ভেইয়া, বলে গদি থেকে নেমে এসে বলল, কোথায় আছিস আজকাল ?

ওই ফুটের জমিদারীতে। বলেই রাজকুমার হাসল।

কাজ কাম চলছে কেমন ?

ভালই। এই ঠেলাটা আমার। কিনেছি।

বহুত খুব। তোর ভাগ ভাল হবে রে রাজকুমার। দো-তিন সাল মে তোর নসীব বদল করবে এই ঠেলা। ওহি তুহার লছমি আছে। এই গিরিধারী তিন ভাঁড় চা দে। চা পিকে তব্ তুহার ছুটি। ভাবী ক্যায়সা ? ভাল। বহুত খুব। বেটা বেটি ? ও ভি আচ্ছা। বহুত খুব। লেকিন হামার দিন আর গুজরান হচ্ছে না রে।

কেন তোমার ব্যবসা তো ভালই চলছে।

তা ঠিক। রুপেয়া পয়সা মে আরাম নেহি ভাইয়া। হামার ফুকাকা বেটি আইছে। মাথা মে গোলমাল হো গিয়া।

কেন ? কেন ?

দেশ মে হামিলোক তো ছোটজাত পারিয়া। হামারা মুলুকমে হামারা হাতসে কোহি লোক পানি ভি পিতা নেই। জমিন উমিন কুছু নেহি আছে। গয়া সালমে বহুত শুখা গিয়া। বহিন কা মরদকো বেমার হো গেইলো। বহিন কো একঠো বাচ্চা ভি পয়দা হোল।

তারপর ?

বেমার মরদকে ছোড়কে আনে না সাকা। ঘরমে না ছিল চাউল আটা। সব ভুখমে মরতে বসেছিল। দেহাত মে ডাক্তার দাওয়াই নেহি মিলে। আদমিটা তিন রোজ সিরেফ পানি পিকে রহা। বহিন ভি কোন কাম করতে নেহি পারি ল। গোদ মে দো মাহিনা কা বাচ্চা। নিজে ভুখে থাকলে ভুখা মরদকো কি খিলাবে।

তারপর ?

তিন রোজ বাদ। হায় রামজী। বহিন মরদ কো বাঁচানে কো লিয়ে আসলো। বাচ্চা কো ভুখে রেখে আপনা ছাতিকা দুধ মরদ কো পিলালো, কুছুই হল না। মরদ ভি মরল আট রোজ বাদ। আর বাচ্চা? উ মরল না। বাচ্চাকো গোদমে লিয়ে হামারা পাশ আইলো। লেকিন দেমাক মে গরবর হয়ে গেল। বাচ্চা কো দুধ ভি দিচ্ছে না, নিজে ভি ঠিকমত খাচ্ছে না।

রাজকুমার চমকে উঠল।

ক্ষুধার তাড়না মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। তা এমন যে করুণ হতে পারে তা রাজকুমারের মত অভাবী দরিদ্র মানুষও চিন্তা করতে পারে না। গিরিধারীর চা-টা কেমন তেতো মনে হল তার কাছে।

কি শোচচিস রাজকুমার। বিশোয়াস না হইল? হামারা মুলুক মে ছোট জাতকা এইসাই হাল হোয়। রামজীকা দয়া বুঝলি।

রামজীর দয়াটা রাজকুমার ঠিক বুঝতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় মা সন্তানের হাত থেকে আহার্য কেড়ে খায় এটা কে না জানে, কিন্তু রুগ্ন স্বামী তার স্ত্রীর সদ্যজাত সন্তানকে বঞ্চনা করে স্ত্রীর বুকের দুধ খায় এটা একটা অভাবিত ঘটনা। কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল তার দেহ আর মনটা। ননীবালা যখন তার সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতো কত বড় পরিতৃপ্তির ছায়া ভেসে উঠত ননীবালার চোখে মুখে, রাজকুমার নিজেও অপলকে তাকিয়ে থাকত মায়ের করুণাময় দৃষ্টির দিকে। তাই অবাক হয়ে রঘুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চ তারু, আর দেরি করিসনি। মহাজনের ঘরে মাল তুলে দিতে হবে সুয্যি ডোবার আগেই।

রঘুয়া বুঝতে পারল, এই কাহিনী রাজকুমারকে বলা ঠিক হয়নি। নিচু গলায় বলল, কুছু মনে করিস না রাজকুমার। হামারা মুলুকমে এইসাই কভি কভি হোতা হ্যায়। মরদকা জান বাঁচাতে বহুকে বহুত কষ্ট করতে হয়। পোস্তায় যব আইবু তখন হামার কাছে মুলাকাত করবু।

মহাজনের মাল নামিয়ে রাজকুমার তারককে নিয়ে যেন ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আস্তানায়। মরিবালার জ্বর ছেড়েছে। ননীবালা রান্নার জোগাড় করছে। ছেলেটা নেই, মেয়েটা বসে বসে বাজার কুড়ানো শাকপাতা পরিষ্কার করছে।

অমর কোথায় গেছে রে বউ?

ননীবালা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ক্রাসিনের নাইন দেছে।

তোর আবার কেরাসিন দরকার হল ক্যেন ?

আমার নয় গো, উই বাবুদের। একটা টাকা লগদ দেবে বলেছে।

ওঃ বলে রাজকুমার ছেঁড়া মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে তারককে বলল, কয়েক ভাঁড় চা নিয়ে আয় তারু। আজ বড়ই মেহনত গেছে। একটা পাঁউরুটিও আনিস। বড় দেখে আনিস। সবাই ভাগ করে খেতে পারব। ও ঘটিটা নিয়ে যা। চা ভর্তি করে আনবি।

তারক এবার মরিবালার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু খেয়েছিস কাকী ?

নোন্যা দুধ দিছিল।

তারক আর কোন কথা না বলে ঘটি হাতে করে সামনের খোট্টার দোকানের দিকে গেল।

॥ ছয় ॥

সেদিনকার মত জ্বর ছাড়লেও পরদিন আবার জ্বর দেখা দিল। মরিবালা কাতরাতে কাতরাতে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আগের দিনের ওষুধ আবার খাওয়ানো হল। আশা করেছিল জ্বর ছাড়বে কিন্তু এবার জ্বর আর ছাড়ল না। জ্বর বেশি নয়। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল মরিবালা। ননীবালাও বেশ চিন্তায় পড়ল। রাজকুমার আর তারকের সঙ্গে কথা বলে পরের দিন সকালে মরিবালাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে ফিরল বেলা দুটোর পর।

রাজকুমার সবে ঠেলা নিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার কি বলল ?

মরিবালা বলল, বুকের ছবি তুলতে হবে। তারিখ দিয়েছে। তারিখে গেলে ছবি তুলবে। কপালে কত যে দুঃখ আছে কে জানে।

মরিবালার আফশোসের হেতু অনেক। তারকের কাকা বিপিন ছিল পাকা মাঝি। তার হাতে হাল থাকলে নৌকা কখনও টালমাটাল হত না। রিয়াজুদ্দির খপ্পরে পরে তার আখেরে লেখা ছিল মৃত্যু। রিয়াজুদ্দির দুর্নাম অনেক। পাঁচ গাঁয়ের মানুষ রিয়াজকে জানত পাকা ডাকাত বলে। রায়মঙ্গলের জলে রাতের বেলায় নৌকা ভাসাতে সাহস পেত না কোন ব্যাপারী, রাতের বেলায় রিয়াজুদ্দির জমিদারী কায়েম হত নদীর বুকে, বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে যারা আসত তাদের নৌকা লুট হত মাঝে মাঝেই। নৌকা লুটের পর জোর গলায় বলে যেত রিয়াজুদ্দিন তার ক্ষমতার কথা। সে যে নদীর বুকে একমাত্র মালগুজারি আদায়ের অধিকারী তা জানিয়ে বলত, আমার নাম রিয়াজুদ্দি। যাদের নৌকা লুট হত তারাও চোরাকারবারী। তারা সাহস করে এপারের অথবা ওপারের থানায় যেত না। রিয়াজুদ্দিও বিনা বাধায় তার রাজত্ব কায়েম রেখেছিল। বছরের পর বছর কাটলেও পুলিশের নজর

পড়ল রিয়াজুদ্দির দলের ওপর কিন্তু কে যে রিয়াজুদ্দি আর কে যে নয় তা সনাক্ত করা ছিল কঠিন। কারণ কেউ জানত না রিয়াজুদ্দির বাড়ি কোথায় আর তার চেহারাই বা কেমন। অথচ প্রত্যেকবার ডাকাতির সময় রিয়াজুদ্দি হাজির থাকত তার দলে। মাত্র চারজন অন্তরঙ্গ তাকে চিনত ও জানত কিন্তু বেশভুষা এমন ভাবে বদল করে প্রত্যেকে বার ডাকাতি করত যার জন্য দলের অন্যলোকেরা তাকে সনাক্ত করতে পারত না। পাকাপাকি কাউকে দলেও রাখত না। নতুন নতুন লোক নিয়ে দল গড়ত।

একদিন সকালবেলায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জোব্বা আর লুঙ্গি পরা একজন মধ্যবয়সী মুসলমান এল বিপিনের বাড়ি। মিঞা সাহেবের হাতে তসবী। তসবী ঘোরাতে ঘোরাতে ডাকল বিপিনকে। লোকটা যে ধার্মিক আর বিশিষ্ট ব্যক্তি তা বুঝতে বিপিনের মোটেই দেরি হল না। হাঁক ডাক শুনে বিপিন বাইরে আসতেই বলল, তুই বিপিন মাঝি।

বিপিন গদগদ হয়ে বলল, হাঁ, পীরসাহেব।

তোর নৌকাটা দরকার। আজ রাতে খেপ দিতে হবে হিঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকা রাখতে পারবি ?

বিপিন ইতস্তত করে বলল, আজ কোটালে নৌকা ছাড়তে পারবনি পীরসায়েব।

আজ কোটালের বান বলেই তো তোর কাছে এসেছি। তোর মত পাকা মাঝি না হলে হালে পানি পাওয়া কঠিন। আমার যে জরুরী কাম। তোকে যেতেই হবে। যত চাস তাই দেব।

বিপিন রাজি হয়ে গেল। ভাড়া ঠিক হল তিরিশ টাকা।

. ঘাটে ঠিক থাকিস। আমার লোক যাবে। তোর নাম ধরে ডাকলেই বুঝতে পারবি আমার লোক। চার পাঁচজন থাকবে। আমি হয়ত থাকব না। কিন্তু মালপত্তর ঠিক পেঁাছে দিবি ভাণ্ডারহাটিতে। বুঝলি তো ? এই নে পনের টাকা। কাজ শেষ হলে বাকি টাকা ওরাই দেবে।

বিপিন সন্ধ্যাবেলায় হিঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণপক্ষের ঘোরতর অন্ধকার। জলপুলিশের স্টিমার দুবার আসা যাওয়া করল। কিন্তু মালপত্তর নিয়ে কেউ তো এল না। বিপিন পাটাতনের ওপর গামছা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন বারটা—একটা। গোটা তল্লাট তখন ঘুমে অচৈতন্য। এমন সময় ডাক শুনল এই বিপিন ওঠ। নৌকা ছাড়তে হবে। ঘুমের ঘোরে বিপিন উঠে বসার আগেই পাঁচ-ছয়জন জোয়ান মরদ নৌকায় চেপে বসল। বিপিন নৌকার দড়ি খুলতে খুলতে বলল, কোথায় যেতে হবে গো কর্তা।

ভাটিতে চল।

ভাটিতে চলতেচলতে হঠাৎ একজন বলল, ওই যে নাওটা আছে ওখানে চল।

বিপিন সরল মনে নৌকার মুখ সেই নৌকার দিকে ঘুরিয়ে দিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার নৌকার সোয়ারিরা দুটো বন্দুক নিয়ে তাক করছে ওই নৌকাটার দিকে।

বিপিন ভয় পেয়ে গেল। তার হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করলেও হালটা শক্ত করে ধরে থাকতে চেষ্টা করছিল।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নবাগত নৌকার সব মালপত্র এমন কি খাবার জল পর্যন্ত লুট করে বিপিনের নৌকায় এসে উঠল ডাকাতরা। হুকুম করল নৌকার মুখ ঘোরাতে। জোয়ারের টানে নৌকা সাঁই সাঁই করে ছুটে চলল। লুণ্ঠিত নৌকার দিকে কেউ একবারও ফিরে তাকাল না। নৌকা লুটের সময় শুনল রিয়াজুদ্দির নাম। কিন্তু কে রিয়াজুদ্দি স্থির করতে পারেনি।

সকাল হল। সূর্য উঠল। প্রায় এক প্রহর বেলায় আঘাটায় নৌকা থামাতে বলল ডাকাতরা। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই সবাই লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়। বিপিনের হাতে ভাড়ার পনের টাকা আর বখশিষ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলল, কাউকে বলিসনি যেন, তা হলে তোর জান যাবে।

বিপিন বাড়ি ফিরে এল।

ভয়ে সে তিন দিন ঘরের বাইরে যেতে পারেনি। মরিবালা জিজ্ঞেস করলেও কোন জবাব দিতে পারেনি। ঘরের বাইরে যেতেও তার ভয়। আবার যদি পীরসাহেব এসে দাঁড়ায় তা হলে রক্ষা নেই, তাকে নিশ্চয়ই টেনে নিয়ে যাবে ডাকাতি করতে।

একটু সুস্থ হয়ে মরিবালাকে বলল সব কথা।

তুই থানায় যা। নইলে তোকেও পুলিশ ধরবে।

পাগল! পুলিশে গেলে ডাকাতরা টের পাবে, আমার প্রাণ যাবে। তার চেয়ে এই গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

বিপিনের যুক্তি মরিবালা স্বীকার করল না। বলল, এখানেই থাকব। কোন চুলোয় যাব। পেটটা তো সঙ্গে যাবে। খাবি কি?

তাও বটে। তবে কেউ খুঁজতে এলে বলবি ঘরে নেই।

মাস দুয়েক বেশ নিশ্চিন্তে কাটল।

পীরসাহেব আর তার দলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। হলেও কাউকে চিনতে পারত না। রাতের অন্ধকারে কারও মুখ ভাল করে দেখতেও পায় নি।

নদীর ঘাটে একজন নবাগত এসে বলল, পীরসাহেব আজ নৌকা ঠিক রাখতে বলেছে।

চমকে উঠল বিপিন।

নিমেষে তার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বুকের ভেতরে ভীষণ তোলপাড় হতে থাকে। নিচু গলায় বলল, দেহটা ঠিক নেই। বউটারও জ্বর। যেতে পারবনি।

পীরসায়েবের অনুচর বলল, তোকে যেতে হবে। পীরসাহেবের হুকুম। পীরসাহেবের সঙ্গে বেইমানী করলে কঠিন দণ্ড পাবি।

বিপিন শুধু মাথা নাড়ল।

পীরসাহেবের পেয়াদা ফিরে যেতেই মরিবালাকে ডেকে বলল, আবার পীরসাহেবের হুকুম এসেছে। আজ রাতে নৌকা নিয়ে যেতে হবে।

মরিবালা উদাসভাবে বলল, যাবি।

বিপিন ভীত কণ্ঠে বলল, যদি ফেঁসে যাই, কোথায় যাবি তুই?

ভগবান দেখবে। তোর কাজ তুই করবি। আমার কাজ আমি করব। তুই খেয়ে নে, আমি একটু কাজে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।

কোথায় যাবি মরি? সন্ধ্যার আগেই ফিরিস। আঁধার নামলে ওরা আসবে।

আচ্ছা আচ্ছা, বলে মরিবালা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এসে বলল, ওরা এলে ওদের নাওতে বসতে বলবি। তুই বলবি বউ নেই, এলে খেয়েদেয়ে যাব। বুঝলি!

আচ্ছা। তাড়াতাড়ি আসিস।

রাত নটা নাগাদ পীরের দল নদীর ঘাট হাজির। পীরের পেয়াদা আসতেই বিপিন বলল তোরা নৌকাতে বস, আমি চাট্টি খেয়েই আসছি।

দেরি করিসনি যেন, অনেকটা দূরে যেতে হবে।

আজ রাতে ফিরতে পারব কি? তা হলে বউকে ঘুমাতে বলব। নৌকার হালটা শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। ভাটার টান আসবে রাত দশটার পর। তখনই নৌকা ছাড়ব।

পীরসাহেবের পেয়াদা বলল, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে। আমি বাইরে বসছি। তুই খেয়ে নে।

বিপিন আশা করছিল মরিবালা ফিরে আসবে কিন্তু কোথায় মরিবালা। সেই দুপুরে বেরিয়েছে, এখনও তার টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। বিপিন খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল। সবে মাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এমন সময় গুলির শব্দ শোনা গেল পর পর। চমকে উঠে বিপিন বলল, নদীর ঘাট থেকে বন্দুকের শব্দ আসছে। ওখানে কে আছে রে পেয়াদা।

ঠিক বুঝতে পারছি না। চল এগিয়ে দেখি।

চল।

বলতে আর হল না। বোমা ফাটার শব্দ, বন্দুকের গুলির শব্দ, চিৎকারে গ্রামের সব মানুষ হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও একটা যে কিছু নদীর ঘাটে ঘটছে তা সবাই বুঝল। গ্রামের লোকেরা কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ বর্শা নিয়ে টর্চের আলো জেলে এগিয়ে চলছিল। চিৎকার আর হৈ-চৈ-তে বিশেষ কিছু শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু বন্দুকের গুলি

আর বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় চুপি চুপি মরিবালা এসে দাঁড়াল বিপিনের পেছনে। বিপিনের ছেড়া গেঞ্জিতে টান দিয়ে বলল, যাসনি। পুলিশ।

বিপিন থমকে গেল। কোন প্রশ্ন করল না।

পুলিশ শব্দটা পেয়াদাটাও শুনতে পেয়ে দিল দৌড়। বিপিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মরিবালার পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল। ততক্ষণে গ্রামের সবাই জেনে গেছে ঘটনা। বিপিন সাহস করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে বাইরে বের হতে পারেনি।

মরিবালা চুপি চুপি বলল, এবাব থেকে আর তোর পীরসাহেব আসবে না, বুঝলি।

মানে?

ওদের দফা রফা করে এসেছি। ভাল ভাল মানুষগুলোকে তোর পীরসাহেব শয়তান করেছে। তোকে বলেই আমি থানায় গেলাম। বড়বাবুকে বললাম, আজ রাতে নৌকা করে তোর পীরসাহেব দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে যাবে। প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। পরে বুঝিয়ে বলতেই পুলিশ দারোগা বন্দুক দিয়ে ঘাটে ওত পেতে বসেছিল। তারপর কি হল জানি না? বন্দুক আব বোমার শব্দই শুনলাম। কাল সকালে জানা যাবে কি হয়েছে।

পুলিশ তো আমাকেও ধরবে।

বড়বাবুকে বলেছি আমার সোয়ামীকে জোর করে ওরা ধরে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে। হুজুর ওকে মাপ করতে হবে। বড়বাবু কথা দিয়েছে, তোর কোন ভয় নেই।

পুলিশকে বিশ্বাস করলি কেন? ওরা আমাকেও ছাড়বে না। সাক্ষী দিলে আর প্রাণ থাকবে না, বুঝলি। দলের কেউ না কেউ বাইরে থাকবে ওদের দলের, তারা আমাকে শেষ করবে।

মরিবালা চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, চল শুয়ে পড়ি। কাল সকালে সব জানা যাবে।

বিপিন মাববালার পাশে শুলেও তার চোখে ঘুম ছিল না।

এমন চালাক চতুর মরিবালাকেও কলকাতার ফুটপাতে আসতে হয়েছে। রিয়াজুদ্দির দল সে রাতে পুলিশের হাতে পড়লেও ছিটকে পড়েছিল দু-চারজন। তারা বুঝেই নিয়েছিল পুলিশী হামলার পেছনে বিপিনের হাত আছে। তারাও তক্কে তক্কে ছিল। সুযোগ মত বিপিনকে পেয়ে এমন মেরেছিল যাতে তার একটা পা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বিপিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, তখনই বলেছিলাম, চল গাঁ ছেড়ে চলে যাই। শুনলি নি তো। এখন দেখ কি হয়েছে। জানে মারেনি, কিন্তু কাজ করে আর খেতে হবে না।

মরিবালা বলল, আমাদের ছেলে-মেয়ে নেই। আমরা দুটো পেট চালিয়ে নেব ভিক্ষেটিক্ষে করে।

বিপিন আর কোন আলোচনা করেনি। পাশের বাড়ির দুলাল মেন্দাকে বলে বাঁশের একটা ক্র্যাচ তৈরি করে বেরিয়ে পড়ল গ্রাম ছেড়ে। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, খালি পা। ভাগ্যের পরিহাস জোয়ান মরদ চলল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভিক্ষে করতে। মরিবালা রয়ে গেল বাড়িতে।

মাস শেষ না হতেই বিপিন মরিবালার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, চাল কিনে রাখ। আরও টাকা এনে দেব।

টাকা পেলি কোথায় ?

ভিক্ষে করে। এবার একটা টুপি কিনতে হবে রে মরি। রমজান মাসে মোল্লারা গরীব মিচকিনকে দান খয়রাত করে। সামনে রমজান মাস। টুপি মাথায় দিয়ে খোঁড়া মানুষ আল্লার নাম করলে মোল্লারা অনেক ভিক্ষে দেবে।

মরিবালা বুঝল।

তারপর প্রতি মাসেই টাকা নিয়ে আসে বিপিন। রমজান মাস শেষ। ঈদের সময় বিপিন গেল ঘুটিয়ারি শরীফে। ফিরে এল কয়েক শ' টাকা, আঠারখানা লুঙ্গি আর সাতটা গেঞ্জি পোঁটলা বেঁধে। সব কিছু মরিবালার হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্য দুখানা শাড়িও এনেছি। টাকা গুনে নে। ওই যে হাজুদের জমিটা নাকি বিক্রি হবে। ইচ্ছে আছে জমিটা কিনব।

এতগুলো লুঙ্গি আর গেঞ্জি দিয়ে কি করবি ?

বিক্রি করব। যাই বলিস্ ঈদের সময় মোল্লারা খুব দানখয়রাত করে। এইবার থেকে রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছি। তোর আর দুঃখ থাকবে না রে।

মরিবালা সব বুঝেও খুশি হতে পারেনি। বিপিন যে ভিক্ষে করে তাকে খাওয়াবে তা কখনও মনে করেনি। জমি কেনার কথায় একটু উৎসাহ বোধ করল। যদি এইভাবে বিঘে পাঁচেক জমি করতে পারে তাহলে আর বিপিনকে ভিক্ষে করতে হবে না।

বিপিন তিন বছরেই পাঁচ বিঘে জমি কিনেছিল কিন্তু সেটা ভোগ করতে পারেনি। ভাইয়েরা চাষ করে যা দিত তাতে তাদের চলে যেত কোনরকমে। বিপিন আর ভিক্ষেয় বের হয় না। কিন্তু সব কিছু মনে করলেই তো হয় না। ভাইয়েরা বর্গা চাষের রেকর্ড করার পর আর ঠিক মত ধান দিত না। যা দিত তাতে মরিবালার ছমাসও তো চলত না। বিপিন বেরিয়ে যে তদারক করবে তা সম্ভব হত না। এর মধ্যেই হাঁপানিতে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল।

মরিবালাকে মাঝে মাঝেই বলত জানিস বউ ভাল হবার অনেক ঝামেলা। ভাল হতে চেয়েই আমাদের এই দুর্দশা। রিয়াজুদ্দি ডাকাত হলেও দলের লোকদের ভাগ দিত। বেশ মোটা হাতেই দিত।

রিয়াজ্বদ্দির দল ভেঙ্গে গেছে। বিপিনও ভাল হয়ে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছে। বিধি বাম।

মরিবালা বলল, পাপ তো তুইও করেছিস। জেনেই করিস আর না জেনেই করিস শয়তানদের খপ্পরে তোর আখের নষ্ট হয়েছে। তুই ভয় পাস না আমি বেঁচে থাকলে তোর পেটের ভাতের কথা ভাবতে হবে না রে।

অক্ষম স্বামীকে রেখে মরিবালা কলকাতায় এসেছিল। কাজও জুটিয়েছিল কিন্তু তাতেও বাগড়া দিচ্ছে তার দেহ। তারক তাকে তার সামর্থ মত সাহায্য করছে। ননীবালা তাকে আগলে বেখেছে তবুও তার জীবনশক্তি ফিরে পাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আমি আব বাঁচবনিরে তারক। মবণে দুঃখ নেই, তোর ঠ্যাং ভাঙ্গা কাকাব কথা ভেবেই মরতে পারছি না।

তারক কোন উত্তর খুঁজে পায় নি। ফুটপাতের কোথায় পড়ে রয়েছে অর্ধমৃত মরিবালা। হাতের শাঁখা মাথার সিঁদুরটুকুই তার সম্বল। পরনের কাপড়খানাও লজ্জা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও বাঁচার জন্য মরিবালা লড়াই করছে। অশক্ত স্বামীর মুখে খুদকুঁড়ো দেবার এও এক প্রচন্ড লড়াই।

বুকের ফটো তোলা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ওষুধও দিয়েছে।

এরপরই মরিবালাকে ভর্তি কবে নিল হাসপাতাল।

অনেক দিন মরিবালার খবর কেউ জানে না। তারক গ্রামে গিয়ে বিপিনকে বলে এসেছে, মরিবালার কথা। বিপিন কেঁদেছে কিন্তু সেও নিরুপায়।

অবশেষে একদিন বিপিন পাড়ার জওয়ান ছেলে পঞ্চুকে ডেকে বলল, আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারিস পঞ্চু।

তুমি কি স্টেশন অবধি যেতে পারবে কাকা? তারপর কাকীকে খুঁজে বের করতে খুবই হয়রান হতে হবে। এত ধকল সহ্য করতে পারবে কি কাকা?

খুব পারব। তুই আমাকে নিয়ে চল পঞ্চু। মরিবালার জন্য আমার জিউটা হাঁকুপাঁকু করছে। তোর দোহাই, তুই আমাকে নিয়ে চল।

পঞ্চু বলল, গাড়িতে খুবই ভিড় হয়, তোমাকে নিয়ে আরেক বিপদ না হয়।

কিছু হবে না। তুই আমাকে নিয়ে চল।

পঞ্চু রাজি হল। পরের দিন সকালবেলায় সাইকেল ভ্যানে চেপে বিপিন এল স্টেশনে।

তারপর ট্রেনে কলকাতা।

বিপিনের হাত ধরে কোনরকমে পঞ্চু খুঁজে পেতে রাজকুমারের আস্তানায় এসে হাজির। তারক বিপিনকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি কেন এসেছ কাকা?

একবার মরিবালাকে দেখতে চাই রে তারক। তুই আমাকে তার কাছে নিয়ে চ।

এ বেলায় তো হবে না কাকা, ও বেলায়। বেলা চারটের পর। কাকী মোটামুটি ভালই আছে। কদিন আগে আমি গিয়েছিলাম। কাকী বলল, অনেক ইনজেকসন দিয়েছে। দু'বেলা ওষুধ খাচ্ছে। জ্বরটা নেই। উঠে বসে পায়খানা যাচ্ছে। শীগ্‌গীরই ছাড়া পাবে। বলছে, তবে ওষুধ খেতে হবে দুটো বছর। বুঝলে।

দু'বছর ওষুধ খেতে হবে। এত দিন। কত পয়সা দরকার। পাব কোথায়। তা হোক মরিবালাকে ঘরে নিয়ে যাব রে তারক। ও যদি মরে তা হলে আমার কাছেই মরবে। আর যদি বাঁচে তা হলে তো সুখেই থাকব আমরা।

মরিবালা বিপিনের কথায় সায় দিতে পারল না। কিন্তু ননীবালা বিপিনের মতে মত দিয়ে বেশ জোর দিয়েই মরিবালাকে বলল, তুই ঘরেই যা মরি। এখানে ফুটে পড়ে থেকে মরবি কেন? কাজ করতে তো পারসি না, পেটই বা চলবে কি করে।

তারক কিন্তু বিপিনের কথা মানতে চাইল না। বলল, কাকীকে আমি খাওয়াব। দেশের ঘরে ওষুধ পাবে না। মরতেই হবে। এখানে বিনি পয়সার হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাচ্ছে। জ্বরও নেই, চলতে ফিরতে পারছে। আর কটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুই একটু কষ্ট করে কটা মাস কাটা কাকা। আমি কাকীর সেবা করব।

সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে স্থির করল, বিপিন আর মরিবালা দু' জনেই থাকবে ফুটপাতে। মরিবালা বিশ্রাম করবে, রান্না করবে, তারক যা পায় তা দিয়ে আর বিপিন বসবে ফুটপাতের ভিড়ে, হাত পেতে যা কিছু পায় তাতেই চলে যাবে।

এমন সহজ হিসাবটা বিপিনের বুঝতে কষ্ট হল না, মনে মনে তার বড় ক্ষোভ তার পাঁচ বিঘে জমির উপসত্ত্ব যা পেত তাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, তবুও সবার যুক্তি বুদ্ধি শুনে বিপিন থেকে গেল কলকাতায়। আশ্রয় নিল হাওড়ার ফ্লাইওভারের তলায়। প্রতিবেশি সবাই বিহারী অন্ত্যজ, বাঙ্গালী কয়েকটা মোল্লাও আছে সেখানে। সবাই তাদের করুণার চোখেই দেখত। কিন্তু কারও কোন জীবিকার স্থিরতা নেই, তাই সকাল হলেই সবাই বেরিয়ে পড়ে রুজি-রোজগারের ধান্দায়। জওয়ান ছেলেরা যায় রিক্সা টানতে, ঠেলা ঠেলতে অথবা মুটেগিরি করতে। মেয়েরা ফুটপাতের জমিদারী সব সময় তদ্বির করে। তবে দশ বার বছরের মেয়েরা আর ছেলেরা মায়ের কাছে থাকে না। তারাও ছোটে যায় পয়সা উপায়ের ধান্দায়। বিপিনের রোজগার খুব কম নয়। আট থেকে দশ টাকা উপায় করে একই জায়গায় বসে। আগের মত ঘুরতে পারে না, তেমন মুসলমানী পরবে বড় মসজিদের দরজাতেও যেতে পারে না। [illegible] [illegible] জো অনেক দূরে। তারক দুদিন চারদিন পর মরিবালাকে দু দশ টাকা [illegible]

যায়। মরিবালা যায় হাসপাতালে বিনি পয়সার ওষুধ আনতে।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল।

ঠিক এই জীবনটা বিপিন আর মরিবালা চায়নি। দুজনেরই ইচ্ছে ছিল বাড়ি ফিরে যাবে কিন্তু মরিবালার শরীরটা ভাল না হওয়া অবধি আর যাবার কথা কেউ বলে না। তারকও ঘরে ফেরার কথা কখনও বলে না। বিপিন ক্র্যাচ্ কিনেছে। ক্র্যাচ্ বগলে দিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরতেও পারে। তাতে তার ভিক্ষার ঝুলিটা খুব খালি থাকে না।

একদিন মরিবালা বলল, চ আমরা শ্যামবাজারে যাই।

এই তো বেশ আছি।

নারে না। এখানে থাকা যাবে না। খোট্টা মোল্লাবা ভিড় করেছে। ওদের নজর বড় খারাপ। তুই তো সাঁঝ নামলেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়িস। আমার চোখে তো ঘুম নেই। শেষরাতে কতকগুলো লোক এসে পাশের আজম মিঞার আস্তায় শুয়ে থাকে। সারারাত কোথায় থাকে তা ওরাই জানে। শেষ রাতে কোথা থেকে আসে তাও কেউ জানে না। জানে আজম মোল্লা।

বিপিন হেসে বলল, ওরা রাতের ব্যাপারী। পুলিশ তাড়া করলে দলের মধ্যে এসে শুয়ে পড়ে।

তুই বলতে পারিস, তোরও তো অমনি দশা হয়েছিল। তবে দশদিন চোরের একদিন সাধুকারের। ওরা ফাঁদে পড়বেই। ওদের সঙ্গে আমরাও জড়িয়ে পড়তে পারি। জানিস, পরশু রাতে সিয়ারাম ঘুমোচ্ছিল, ওর ট্যাঁকে ছিল টাকা, ওই দলের কেউ না কেউ ট্যাঁক হাতড়ে টাকা কটা বের করে নিচ্ছিল এমন সময় সিয়ারাম জেগে উঠে চিৎকার করে।

চিৎকার শুনেছিলাম। তবে আমি তো খোঁড়া মানুষ। পাশ ফিরে শুয়ে পিট পিটিয়ে দেখলাম। একটা লোক দৌড়ে পালাল। চেনা গেল না।

তাই তো বলছি, চল অন্য কোথাও যাই। এরা মোটেই ভাল লোক নয়।

আমরাও নই।

চুপ করে গেল মরিবালা। কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছিল না।

বিপিন বলল, তারক আজ আসবে। তার সাথে কথা বলে যা হয় করব।

নারে দেরি করব না। আমি তারকের খোঁজে ননীবালার কাছে যাব। এখানে ইজ্জত নিয়ে এই পুলের তলায় আর বেশিদিন থাকা যাবে না। এরা মা বোন মানে না। কদিন আগে বাসনীর মরদটা রাতে ছিল না। বাসনী তো আমার মায়ের বয়সী। তাকে তিন চারজন মিলে টানতে টানতে গলির ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। বদমাইশগুলো আসে পোস্তার দিক থেকে। ওরা তোর কাছ থেকে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলে তুই কি বাঁচাতে পারবি?

বিপিন আমতা আমতা করে বলল, তা তো ঠিক। সেদিনের বিপিন আজ আর বেঁচে নেই। নইলে বিপিনের নাম শুনেই বদমাশরা গর্তে ঢুকে যেত।

তবুও তারকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তোকে তারকই বাঁচিয়ে তুলল। ওকে না জানিয়ে কিছু করলে বেইমানী হবে। আর যাই করি, বেইমানী করতে পারব না রে মরি।

পরদিন সকালে বড়বাজারে মাল নামিয়ে তারক আসতেই সব কথা বলে মরিবালা বলল, অন্য কোন আস্তানা দেখ তারক। এখানে মান নিয়ে থাকা যাবে না। বদমাইশদের এটা আড্ডাখানা।

বিকেল বেলায় আসব কাকী। তখন বলব। জায়গাটা তো ভাল হতে হবে। দেখেশুনে কাল তোদের নিয়ে যাব।

বিপিন বলল, মরিবালা তো ভাল হয়েছে, এবার ঘরে গেলে কেমন হয়?

ভালই হয়, কিন্তু তোরা খাবি কি? হাতে কিছু নিয়ে যাবি কাকা। জানিস তো, দেশের মানুষ পেটের দায়ে ছুটে আসছে কলকাতায়। তোর তো তাও জমি আছে। ফসল পাস না, ওদের তো জমিও নেই। খেত মজুর ওরা। বছরে তিন মাসের খাবার জোটে না। তাই ছুটতে থাকে নানা দিকে বুঝলি। তুই যদি ফসল না পাস তা হলে খাবি কি? তোর গতরও নেই।

অনায্য কথা তো নয়। এই শহরে আমাদের লোকদের পেটের ভাত জুটলেও মান থাকে না রে। তোর কাকী যা বলল, দেখা যাচ্ছে মেয়েরা তো! যাক্। তুই দেখ, কোথায় থাকতে পারি।

বিপিন আর মরিবালাকে নিয়ে তারক গিয়ে উঠল শোভাবাজারের পার্কের পাশে। বেশ খোলামেলা জায়গা। অনেকগুলো ঝুপড়ি বেঁধে তাদের মত অনেক মানুষ বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করছে সেখানে। অনেকে তো দশ বছরের বেশি রয়েছে। বিপিনও ভাবছিল একটা ঝুপড়ি বাঁধলে কেমন হয়। তারক তার মনের কথা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। বলল, এক টুকরো বাঁশ আর কয়েকটা বাতা এনে দিচ্ছি, কিছু পলি কাগজও আনব। তোরা ঝুপড়ি বেঁধে থাকিস এখানে। ভালই থাকবি। বাইরের কাউকেই থাকতে দিস না যেন। তা হলে গোলমাল হবে।

তারক আর মরিবালা মেহনত করে এক ঘন্টার মধ্যেই ঝুপড়ি বাঁধা শেষ করে সংসার পেতে বসল সেখানে। মরিবালা খুশী না হলেও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মনে করে চুপ করেই ছিল। বিপিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝুপড়ির তলায় ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

মরিবালা রাতের অন্ধকার নামবার আগেই বিপিনকে ডেকে তুলে খাইয়ে দিল।

রাজকুমারের মেয়ে নমিতা বেশ ডাগর হয়েছে। কদিন আগে মরিবালা বউবাজারে গিয়েছিল। নমিতাকে দেখে চিনতেই পারেনি। ননীবালাকে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটা কে রে ননী?

ওমা চিনতে পারলিনি ? আমার বড় খুকি নমি, যাকে মেন্তি বলতাম।

বেশ বড় হয়েছে তো। দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়েছে।

তা হবেনি। সেই যেবার এসেছিলাম, সেবারই তো উই আসপাতালে উর জন্ম। তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে। কতদিন আর ছোট থাকবে।

তোর ছেলে কোথায় ?

বে' করে আলাদা হয়েছে।

বলিস কিরে ? তোর খোকা তা হলে লায়েক হয়েছে। থাকে কোথায় ?

জানি না।

তোর কাছে আসে না ?

আসে তবে খুবই কম। বউটা আসতে দেয় না। তবে টাকা দরকার হলে বাপের কাছে আসে। কিছু হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কাজকাম করে না বুঝি ?

ঠিক জানি না। মোল্লাদের মেয়ে বে' করেছে, ওর কি আর জাত আছে। থাকে কোথা নারকেলডাঙ্গায়। জানি না বাপ। ওর কথা মনে হলে ঘেন্না ধরে যায়।

মরিবালা খুবই বুদ্ধিমতী। মানুষের দুর্বল স্থানে আঘাত দিলে মানুষ দুঃখ পায় তা সে বোঝে। তাই ছেলেমেয়ের কথা আর না তুলে অন্য প্রসঙ্গ তুলল। সুবিধে করে দিল ননীবালা।

আজকাল থাকিস কোথায় ?

শোভাবাজার। ঘর করেছি, যাবি একদিন।

চিনে যাব কি করে ?

কলকাতায় আছিস, কলকাতাটাই কি চিনতিস ? এসে তো দিব্যি রয়েছিস। জিজ্ঞেস করতে করতে লোকে ইল্লি দিল্লি যায়। আর শোভাবাজার ? পার্কের ধারে ঘর করেছি। খুঁজে নিবি। বলবি খোঁড়া বিপনে কোথায় থাকে। চিনিয়ে দেবে। বুঝলি।

তোর দেহটা কেমন আছে রে মরি ?

না মরে বেঁচে আছি। বেমার কিন্তু সেরে গেছে। ওরা ফটোক্ তুলে বলল, যা সেরে গেছিস। সাবধানে থাকিস। যা তা খাবি না, যেখানে সেখানে খাবি না। আমার জান ফেরত দিয়েছে তারক। তারক না থাকলে মরেই যেতাম। নিজের পেটে না ধরলে কি হবে। ও আমার ছেলের বাড়া। মজাটা দেখ ওর বাবাই আমাদের ফাঁকি দিয়ে জমি ভোগ করছে ওর বড় জ্যাঠার সঙ্গে যুক্তি করে। একেই বলে অসুরের ঘরে মানুষ জন্মায়।

ননীবালা মাথা নেড়ে সায় দিল। নমিতাকে ডেকে পয়সা দিয়ে বলল, ওই খোট্টার দোকান থেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে আয় নমি।

মরিবালা বাধা দিয়ে বলল, আবার চা কেন!

কেন রে? তুই তো রোজ রোজ আসিস না। যেদিন তোর বেমার হয়েছিল সেদিন ননীবালাই তোর মুখে দানাপানি তুলে দিয়েছিল। আজ কেন লজ্জা?

মরিবালা লজ্জিত হল। সে তারকের কথাই বলেছে, ননীবালার কথা বলা উচিত ছিল।

আমার একটা হিল্লে হল। রাজুদা কোথায় গেছে আজ?

ওর কি ঠিক থাকে। কখনও চৌঘরিয়া, কখনও বেহালা, কখনও কসবা, ভাড়া পেলেই তারককে নিয়ে দৌড়ায়। বলেও যায় না। বলে যায় ফিরতে দেরি হবে।

তোদের কষ্ট তো নেই তা হলে।

আছে রে আছে। পুলিশের জুলুমে সব টাকা কি ঘরে আসে। বাইরে খেতে হয়। জলপান দরকার হয়। বিশ টাকা উপায় করলে পনের টাকাই তো খরচ হয়ে যায়। সব খরচ করে কোন দিন দশ কোন দিন পনের টাকা হাতে এনে দেয়। তাই দিয়ে চারজনের খোরাক চালিয়ে আর কিছু থাকে না। আগে থাকত কিছু আজকাল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পুলিশকে দিতে দিতে পয়মাল হয়ে গেছে। না দিলেই টানতে টানতে হাজতে। তখন আরও কষ্ট। তখন বড়বাবু ছোটবাবুকে প্রণামী দিতে হয়।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নমিতা চা এনে দুটো ভাঁড় দুজনের সামনে রেখে বলল, তোরা খা, আমি আসছি।

কোথায় যাবে কেন যাবে তা না বলেই নমিতা উল্টো পথ ধরল।

মরিবালা চা খেয়ে ফিরে গেল।

রাজকুমার মনে করেছিল এই পরিশ্রমের ফল পাবে কিন্তু তার স্বপ্ন সফল হয়নি। যতই পরিশ্রম করুক আগে যখন খোরাক জোটার পরও কিছু বাঁচত হাতে থাকত। বর্তমানে খোরাক চালিয়ে মোটামুটি দিনগুলো কেটে যায় কিন্তু সব কিছু দাঁড়াতে পারে, অপেক্ষা করতে পারে, বয়স দাঁড়ায় না কারও জন্য অপেক্ষাও করে না। বয়স আনে দৈহিক অথর্বতা। রাজকুমারও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করতে করতে ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। আজকাল তারককে ঠেলা টানতে দেয় মাঝে মাঝে আর নিজেই পিছারি হয়ে ঠেলা ঠেলতে থাকে। রাস্তা চলতে চলতে হাঁপিয়ে পড়ে। গাছের ছায়া পেলে ঠেলা থামিয়ে বিশ্রাম করে। তারক বুঝতে পারে রাজকুমারের অবস্থা। বার বার নিষেধ করে, বলে কাউকে ঠেলা ঠিকায় দিয়ে দাও রাজুদা। রাজকুমার রাজি হয় না। অনেক কষ্টের অনেক মেহনতের এই ঠেলা অন্যের হাতে তুলে দিতে তার মন চায় না। বলে, ওটা আমার একটা ছেলে। নিজের ছেলে তো পর হয়ে গেছে, এই ছেলেটা নিয়েই সুখে আছি রে তারু।

ঠেলাটার ওপর কত যে মমতা তা তারক মনে মনে অনুভব করে, ঠেলা শুধু তাদের রুটি রুজি এনে দেয় তা নয় ঠেলা তাদের আশ্রয়ও দেয় অনেক সময়। ঠেলার বাঁশ ভাঙলে চাকা কচ্ কচ্ শব্দ করলে রাজকুমার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনও বেশি মাল ওঠায় না।

মহাজন বেশি পয়সা দিলেও বেশি বোঝা নেয় না।

রাজকুমারের দেহের সামর্থ কমছে, আজকাল কানেও কম শুনছে, চোখটাও কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। সারা দেহের মধ্যে তার বিশাল গোঁফজোড়া তাকে পরিচয় দিতে সাহায্য করে। কাঁচা পাকা গোঁফের তলায় তার মিষ্টি হাসিটা কখনও ম্লান হয়নি।

কদিন ধরেই খোকা আসছে।

তার ছেলে হয়েছে।

ছেলে হবার পর তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে।

খোকা ছেলের নাম রাখতে চায় নারায়ণ। তার বউ রাখতে চায় হানিফ। ঝগড়ার শুরু এখানেই। শেষ পর্যন্ত তা চরমে উঠেছে।

খোকা বলে, তোকে বিয়ে করলাম কালীঘাটে আর আমার ছেলের নাম হবে হানিফ। আমি কি মোল্লা?

ওর বউ বলে, বিয়ে করেছিস মোল্লাকে, ছেলে মোল্লাই হবে। ওর নাম থাকবে হানিফ, নারায়ণ নাম দেওয়া চলবে না।

কালীঘাটে যারা বিয়ে করে তারা হিন্দু। তুই হিন্দু হয়ে গেছিস। আর তুই মোল্লা নস।

কে বলল? আমি আমি-ই আছি। তোর কথা শুনবনি।

খোকা ঝগড়া-ঝাটি করে তার ছেলেকে কোলে নিয়ে চলে এসেছিল ননীবালার কাছে।

ননীবালা পড়ল বিপদে।

একেবারে আট মাসের শিশু। মায়ের বুকের দুধ না পেলে বাঁচবে না। ননীবালা নিজেই গেল পচিবিবির কাছে।

তোদের ঝগড়া কাজিয়াতে আমরা যে পাগল হয়ে যাব রে বউ।

ননীবালার কথা শুনে পচিবিবি খেঁকিয়ে উঠল।

তোর ছেলেকে বলিস। ওর ঘর আমি করবনি।

ছেলেটা যে মরে যাবে।

ওর ছেলে ও বুঝবে। আমি হলাম মোল্লা আর ও হল তোদের জাত। আমার সঙ্গে কালীঘাটে ওর বিয়ে হতে পারে না। পাড়ার অসিমুদ্দিন বলেছে এ বিয়ে খারিজ।

মানে?

ওর সঙ্গে আমার বিয়েই হয়নি।

তা হলে দু'বছর ঘর করলি কি করে? তুই কি রাখা মেয়েমানুষ।

হাঁ, হাঁ, আমি রাখা মেয়েমানুষ। ওরকম মরদ আমি অনেক পাব তুই যা। তোর সোহাগের ছেলেকে বুকে ধরে শুয়ে থাক।

ননীবালা সমস্যা সমাধান করতে পারল না। খোকাকে কি বলবে ভেবে পেল না। অমর যখন জিজ্ঞেস করল তখন ননীবালা চোখ মুছতে মুছতে বলল ও আর তোর সঙ্গে ঘর করবে নি। অসিমুদ্দিন নাকি বলেছে, তোদের বিয়ে খারিজ।

বুঝেছি অসিমুদ্দিন ওকে শলা-পরামর্শ দিচ্ছে। ওর মতলব আমি জানি পাঁচিকে ফুসলে নিজেই ঘর বাঁধবে। শালা কম শয়তান। শালাকে দেখে নেব। বাগে পেলে শালার লাশ ফেলে দেব।

আর দেখতে হবেনি। তোর ছেলেকে রেখে যা, কাজকর্ম কর। দেখ ওরা কি করে।

খোকা তার ছেলেকে ননীবালার কাছে রেখে চলে গেল। ঝঞ্ঝাট বাড়ল ননীবালার। রাজকুমার একটা কথাও বলেনি। একবার শুধু বলেছিল, এ কি রকম মা।

রাজকুমার নিজেও জানে না। মানুষ আবেগের ও উত্তেজনার শিকার হলে ন্যায়-ধর্ম, ভাল-মন্দ সব কিছুই ভুলে যায়। তখন যুক্তি-বুদ্ধি, মায়া-মমতা, দায়-দায়িত্ব কোথায় যেন বিলীন হয়।

খবরটা সংগ্রহ করে এনেছিল খোকা নিজেই।

পাঁচিবিবি অসিমুদ্দিনকে নিকা করেছে।

ননীবালা হাঁফ ছেড়ে বলল, বেশ করেছে। তোকে কিছু টাকা দিতে হবে রে খোকা। খোকাকে কৌটোর দুধ কিনে না খাওয়ালে ও বাঁচবে না। মায়ের দুধ তো পায় না। আর কিছু খাওয়ানোও যায় না। তুই এককৌটা দুধ কিনে আন, না হয় টাকা দিয়ে যা তোর বাবাকে দিয়ে আনিয়ে নেব।

অমর তার পকেট খুঁজে কয়েকটি টাকা দিয়ে বলল, এই নে। মাগীটা আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে রে বাপু। ঘর করবি না তোর বাচ্চার কি দরকার ছিল। আগে বললেই পারতি।

বেশিদিন নয় পাঁচিবিবির সঙ্গে মারামারি লেগে গেল অসিমুদ্দিনের। চ্যালা কাঠ পিটিয়ে অসিমুদ্দিনের মাথা ফাটিয়ে পাঁচিবিবি পাড়া ছেড়ে পালিয়ে গেল। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

অসিমুদ্দিন নাকি তালাক দিয়েছে পাঁচিবিবিকে। বন্ধন মুক্ত পাঁচিবিবি ঘুরতে ঘুরতে একদিন হাজির হল ননীবালার কাছে। পাশে ছেঁড়া কাঁথায় তখন তার ছেলে বসে রয়েছে কতকগুলো ভাঙ্গা খেলনা নিয়ে। ছেলেকে আদর করে কাছে টেনে নিতেই ছেলে কেঁদে উঠল। ছুটে এল ননীবালা। পাঁচিকে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে নিয়ে বলল, তুই বুঝি ছেলে

চুরি করতে এসেছিস ?

পচিবিবি কেঁদে ফেলল। না। ছেলে তো আমার নয়, তোর খোকার ছেলে। ওতো আমাকে চিনতেই পারেনি। মাকে ভুলেই গেছে।

কি মনে করে এসেছিস ?

তোর অমর কোথায় ?

কাজে বেরিয়েছে। কেন এসেছিস বল। তোর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।

মতলব খারাপ নয় মা। আমি তোদের সঙ্গে থাকব।

মানে ?

আমি তো তোর বেটার বউ।

ছিলি এক সময়, এখন কেউ নোস। তুই আর এখানে আসিস না। খোকা তোকে দেখলে খুন করে ফেলবে।

আমি যাব না। তোর কাছেই থাকব। ছেলে ছেড়ে থাকতে পারবনি। খোকার সঙ্গেই ঘর করব। অসিমুদ্দিন আমার সর্বনাশ করেছিল। তাকে চ্যালাকাঠ মেরে মাথা ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। তালাক পেয়েছি। ভুল করেছিলাম মা, তুই ক্ষেমাঘেন্না করলে আবার অমরের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারি। আমার ছেলে আমিই মানুষ করব, তোকে কষ্ট করতে হবে না।

এসব কথা তোর শউরকে বলিস, অমরকে বলিস। আমি কিছু জানি না। ওরা না এলে ছেলের গায়ে হাত দিসনি পচি। তা হলে লোক ডেকে জড় করব। হাঙ্গামা হবে।

পচি চুপ করে ফুটপাতের এক পাশে বসে রইল।

রাতের বেলায় রাজকুমার ফিরে এসেই পচিকে দেখে জানতে চাইল সব কিছু। সব শুনে বলল, আমি কিছু বলতে পারব না, খোকা এলে তার সঙ্গে কথা বলবি।

অমর রোজদিন আসে না। মাঝে মাঝেই তার আড্ডায় রাত কাটায়। সেদিন সে এসেছিল। অনেক রাত অবধি আলাপ আলোচনা করে স্থির হল ছেলে ননীবালার কাছেই থাকবে। অমর পচিকে নিয়ে আগের মতই সংসার করবে। তবে উল্টোডাঙ্গায় নয়, দক্ষিণে ভবানীপুরে। মাঝে মাঝে পচি আসবে, ছেলেকে দেখবে। অমর ঘর করতে রাজি হলেও রাজকুমার ও ননীবালা পচিকে তখনও সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। কোন মতেই ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজি হল না তারা।

রোজকার মত তারক ঠেলা ধুয়ে-মুছে যখন বের হবার উপক্রম করছে তখন রাজকুমার বলল, তুই তোর কাকীকে সেই কথাটা বলেছিস ?

কোন্ কথা ? ও মনে পড়েছে। নমির বিয়ের কথা। না বলা হয়নি। ছেলেটার খোঁজ নিয়েছি কাকা। খারাপ ছেলে নয়। মাড়োয়ারীর দোকানে বাঁধা চাকর। পাকা চাকরি। ছেলে দেখতেও ভাল। দেশে দু'বিঘা চাষের

জমি আছে, বাড়ি আছে। দু'ভাই। দুজনেই এক জায়গায় কাজ করে। একটা বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। দায়-দেনা নেই। তবে বউ থাকবে দেশের বাড়িতে।

তোর কাকীর মতটা শুনে নে। তারপর আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব।

তা হলে আজই রাতে বলব।

কিন্তু নমিকেও জিজ্ঞেস করতে হবে রে তারু। কলকাতায় থেকে থেকে খুবই সেয়ানা হয়েছে। তার মত না নিয়ে কিছু করলে শেষ অবধি পালিয়ে যাবে। মেয়েটাও ভেসে যাবে ছেলেটারও সর্বনাশ হবে।

তা বটে, তা বটে, তাকেও বলব।

নমিতার বিয়েটা প্রায় ঠিক হওয়ার দিকে এমন সময় বাদ সাধল নমিতা নিজেই। মেয়ে দেখতে এসেছিল ছেলের মা ও বাবা। নমিতাকে দেখে তাদের পছন্দ হয়েছে। অতি নিকট আত্মীয়ের কথাবার্তায় নমিতাও অভিভূত হয়ে বিয়েতে মত দিয়েছিল। তবে কথা ছিল, ছেলে নিজেই আসবে মেয়ে দেখতে। রাজকুমারও সেইমত প্রস্তুত ছিল। ছেলে তার দুজন বন্ধু নিয়ে এল নমিতাকে দেখতে। তারাও পছন্দ করেছিল নমিতাকে। নমিতার সারা দেহে ছিল যৌবনের জৌলুষ, গায়ের রংটাও মেটে-মেটে, মাথায় উঁচু অনেকটা। পছন্দ হবার মতই মেয়ে। ছেলে আর তার বন্ধুরা নমিতাকে পছন্দ করে যাবার পর নমিতা বলল, ওকে আমি বে করবনি মা।

কেন রে? এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবি?

ছেলে ট্যারা, ওকে আমি বে করব না।

ননীবালা হতাশভাবে বলল, পুরুষ মানুষ ট্যারা আর রোগা কখনো দেখলে চলে না। ওর বাড়ি আছে, জমি আছে, তোকে তো ফুটপাতে আর থাকতে হবে না। দু'মুঠো খেতেও পাবি, বছর গেলে কাপড়জামারও অভাব থাকবে না। এতে তোর আপত্তি কেন?

বললাম তো ট্যারাকে আমি বে করব না। তার ওপর ওকে তিনটি জিনিস দিতে হবে তাকি শুনেছিস? ট্যাকা পাবি কোথায়? বাবুর সাইকেল চাই। বাবুর বউয়ের কানের সোনা চাই, আবার নগদ চাই দেড় হাজার টাকা। পারবি দিতে? এ বিয়ে আমি করব না।

থেমে গেল ননীবালা আর রাজকুমার, পছন্দের চেয়ে নগদ টাকার কথাটাই বড্ড বেশি চিন্তায় ফেলেছিল তাদের। তাও অনেক দাম-দর করে দেড় হাজার। কথা ছিল আড়াই হাজার ট্যকার। যারা ফুটপাতের জমিদার তাদের ট্যাঁকে অত টাকা থাকে কি কখনও। এইসব জমিদাররা কি করে অন্ন সংস্থান করে তা শহরের সব লোকেরাই জানে।

অবশেষে একদিন ননীবালা বলল, তা হলে কি করবি। সেয়ানা মেয়ে নিয়ে এই ফুটপাতে থাকা তো ভাল নয়। যে কোন সময় হাঙ্গামা হতে পারে।

তোর একটা হিল্লে হলে আমরা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচব। তোর বাবার দেহের অবস্থাটা দেখছিস তো, এরপর মেহনত করে পেটের খোরাক মেটাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

নমিতা খেঁকিয়ে উঠে বলল, বিয়ে আমি করব আমার পছন্দ মত, বুঝলি।

এর কিছুদিন পরেই নমিতা কাউকে কিছু না বলে বেড়িয়ে পড়ল কজন সঙ্গীর সাথে। জিজ্ঞেস করতে বলল, চাকরি পেয়েছি বড়বাজারে কারখানায়। সেখানে কাজে যাই। কোন কোন দিন রাতের বেলায় ফিরত না। রাজকুমার মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ করলেও ননীবালা কোন কথাই বলত না। নমিতা এখন বেপরোয়া। তার দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর পেত না রাজকুমার। কিন্তু ননীবালা খুবই ভীত হয়ে পড়েছিল। নমিতাকে স্বমতে আনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতেই সে হাল ছেড়ে দিল।

॥ সাত ॥

অমর পচিবিবিকে নিয়ে অন্ধকার গলিতে প্লাসটিকের কাগজ দিয়ে তাঁবুর মত ঝুপড়ি তৈরি করল রাতের বেলায়। থাকত গাঁজা পার্কের পেছন দিকে? পচি রান্নাবান্না করত, মাঝে মাঝে বস্তা কাঁধে করে রাস্তায় রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে এক জায়গায় গাদা দিত। সকালবেলায় প্ল্যাস্টিক কাগজের তাঁবু গুটিয়ে অমর বের হত। তার ফিরে আসার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কোন কোন দিন অনেক রাতেও ফিরত। পচি সকাল নটার আগেই যা কাগজ পেত তাই জমা করত, আর বের হত না। তিনখানা ইঁট সাজিয়ে কুড়িয়ে আনা কুটো জেলে রান্না করতে বসত। রান্নাটা সকালের দিকে কমই করত। বিকেলবেলায় যা রান্না করত তা রাতের বেলায় দুজনে পাশাপাশি বসে খেত যা বাঁচত তা পান্তা করে রাখত। সকালে দুজনেই পান্তা খেয়ে নিজের নিজের কাজে যেত। এ যেন একটা রুটিন বাঁধা জীবন। পচি আজকাল আর ঝগড়া করে না। ছেঁড়া কাগজ বিক্রির পয়সা সঞ্চয় করে ছেলের জন্য জামাপ্যাণ্ট কিছু খাবার কিনে শাশুড়ির কাছে যেত কোন কোন দিন। যেদিন সকালে যেত সেদিন সে ছেলেকে নিয়েই দিন কাটাতো। অমর কিন্তু প্রতিদিনই কাজের শেষে একবার করে ছেলেকে দেখে আসত। ছেলের খবরটা পচিকে দিয়ে মন হালকা করত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শাশুড়ির কাছ থেকে ফিরে এসে পচি রান্না শেষ করে প্ল্যাসটিকের কাগজটা টাঙিয়ে বসেছিল। আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। যে কোন সময় মুষল ধারে বৃষ্টি নামতেও পারে। অমর তখনও ফেরেনি। পচি তার প্রতীক্ষা করছিল। অমর যখন ফিরল তখন রাত নটা বেজে গেছে। এসেই ছেঁড়া মাদুরটা টেনে বসে পড়ল।

এখন চুপ করে বসে আছিস কেন ?

আজ বড়ই মেহনত গেছে। শরীরটা আর চলতে চায় না। আমি শুয়ে পড়ছি।

জ্বরটর হয়নি তো ? না তো। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। খেলেই শরীরে জোর পাবি। যা হাতমুখ ধুয়ে আয়। দেরি করিস না, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুই দেরি করে এলে ভর লাগে।

দৈবাৎ দেরি হয়। ভয় করিস না। মরদের মতই তোকে লড়তে হবে রে পচি। কলকাতা শহরটা তো ভাল নয়। তাই শক্ত মন নিয়ে লড়তে হবে, বুঝলি।

অমর যখন খেয়ে উঠল তখন মাঝরাত। পচিকে বলল, তুই শুয়ে পড়। আমি একটু বাতাসে বসে থাকি। যা শুয়ে পড়।

রাস্তার লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গাঁজা পার্কে তখনও গাঁজা খোররা গাছের আড়ালে বসে মৌতাত করছিল। কয়েকটা দোকানের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। সামনের গলির রোয়াকে বসে একদল লোক চোলাই ঢক্ ঢক্ করে গিলছিল। পচি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অমর একাই চুপ করে বসে সবই দেখছিল। কি যে ভাবছিল তা বলা কঠিন। এমন সময় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কে যেন এসে দাঁড়াল তার তাঁবুর সামনে।

অমর সতর্ক হল। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ?

আগন্তুক সামনে দাঁড়িয়ে বলল, জোরে কথা বল না। আমার খুবই বিপদ।

বিপদ ! পুলিশ তাড়িয়েছে কি ? চুরিটুরি করে এসেছ কি ?

না। না। পুলিশ তাড়ায় নি। গুণ্ডা। এখুনি খুঁজে খুঁজে এদিকে এসে যাবে। তোমার প্লাসটিকের পেছনে একটু বসছি কেউ এলে আমার কথা যেন বল না। বেশিক্ষণ থাকব না, ওরা এদিকে না এলে তো কথাই নেই।

অমর ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। পকেট থেকে বিড়ি বের করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দেশলাই জ্বালাতেই আগন্তুকের চেহারাটা মোটামুটি দেখতে পেল। কেমন একটা ভয়ের চিহ্ন তার চেহারায়। ঠিক তাদের মত ফুটপাতের জমিদারের চেহারা নয়। কোন ভদ্রপরিবারের সন্তান বলেই মনে হল। অমর কিছু বলবার আগেই বলল, ওই বোধহয় ওরা। বলেই আগন্তুক অমরের পাশে বসে পড়ল। অমরও লক্ষ্য করল ছয়-সাতজন লোক যমদূতের মত এগিয়ে আসছে পার্কের পেছন দিকে। তাড়াতাড়ি প্লাসটিকের কাগজটা উঁচিয়ে বলল, এর মধ্যে ঢুকে পড়। ভিতরে তখন পচি বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। অমর তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে চুপ করে বসে বিড়িতে টান দিতে থাকে।

লোকগুলো এগিয়ে এল।

অমরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এদিকে একটা বাবু মত লোককে যেতে দেখেছিস ?

কিছু যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে অমর নির্বিকার ভাবে বিড়ি টানতে থাকে। যমদূতের মত লোকগুলো হুমকি দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করতেই অমর বলল, আঁ ?

এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছিস ?

হাঁ সেপাই, তিনজন।

অন্য কাউকে ?

না। এই আঁধারে কে যাবে ? সেপাই তিনটে ম্যাচিস চাইলে তাই চিনেছিলুম।

একজন বলল, তা হলে শালা গেল কোথায় ?

আরেকজন বলল এদিকেই তো আসতে দেখেছি।

তাহলে সামনের গলি দিয়ে গেছে। চল ওদিকে। শালাকে ধরতে হবে। আমাদের মানিকদার হুকুম। শালাকে খতম করতেই হবে।

বলতে বলতে গোটা দলটা সামনের গলির দিকে এগিয়ে গেল। তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই আগন্তুককে ডেকে বের করল অমর।

পচির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার পায়ের কাছে একজনকে বসে থাকতে দেখে হাউ হাউ করে উঠতেই অমর বলল, চুপ কর পচি।

আগন্তুক বেরিয়ে এল, পেছন পেছন কাপড় সামলাতে সামলাতে পচিও বেরিয়ে পড়ল। পচির মুখে চোখে ভয়ের ছাপ, গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না।

আগন্তুককে কাছে ডেকে নিয়ে পচিকে চুপ করে বসতে বলে অমর জিজ্ঞাসা করল, তোমার ব্যাপারটা কি বলত।

মন্ত্রী।

মন্ত্রী আবার কি ?

মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ে আজ। লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিয়ে দিচ্ছে মেয়ের। এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল। আমরা বিয়ে করব ঠিক করে-ছিলাম। তা আর হল না। আমার তো চালচুলো নেই তাই খুঁজে পেতে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছে।

তারপর ?

তারপর! আমি গিয়েছিলাম বিয়ে দেখতে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার চোখের সামনে আমার কথা দেওয়া বউকে আরেকজনের গলায় মালা দিতে দেখলাম। ওরাও আমাকে দেখল। যদি আমি কিছু বলে ফেলি তাই আমাকে তাড়া করল মন্ত্রীর পোষা গুণ্ডারা। পালালাম। পালাতে পালাতে তোমার আশ্রয়ে।

অমর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর শুনে কাজ নেই। নিজের বউটা অন্যের ঘরে গিয়ে উঠলে খুবই কষ্টের হয় বাবু। তবে তোমরা ভদ্দরলোক তোমাদের

কথাই আলাদা। আমরাও এমনটা সহ্য করতে পারি না। এই যে আমার বউ পাঁচ। এও আমার ওপর রাগ করে আমার চোখের সামনেই অসিমুদ্দিনকে নিকে করেছিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অমর।

এতক্ষণ পাঁচ কোন কথা বলেনি। এবার সে মুখ খুলল, মিছে কথা বাবু। রাগ করে অসিমুদ্দিনকে নিকে করিনি। অসিমুদ্দিন আমাকে ফুসলে ছিল। যখন বুঝলাম অসি ঠগ, জুয়োরী আর চোলাই খায় তখন পথ প্রায় বন্ধ। বললাম, তালাক দে অসি। কিন্তু অসি কিছুতেই তালাক দিলে না।

তারপর ?

আর বলে দরকার নেই পাঁচ।

আগন্তুক অমলেন্দু বিশ্বাস বলল, তালাক পেয়েছিলে ?

না। একদিন চ্যালাকাঠ মেরে অসিমুদ্দিনের মাথা ফাটিয়ে দিলাম। ওদের দলবল এল। পঞ্চায়েত বসল। সবাই বলল, এই বিবি নিয়ে ঘর করতে পারবি নি অসি, ওকে তালাক দে। বাস্। আবার ফিরে এলাম অমরার কাছে।

তুই সহজে কি আসতি। ছেলেটা কেড়ে এনেছিলাম তাই এসেছিস।

তাও ঠিক।

অমলেন্দু জিজ্ঞেস করল, ছেলে কোথায় ?

অমর উত্তর দিল, আমার মায়ের কাছে। যাই বাবু। তুমি একেবারে মন্ত্রীর ঘরে হামলা করেছিলে এটা ঠিক নয়।

তুমি বুঝতে পারবে না অমর। আমি আর মন্ত্রী একই দলের লোক। এক সময় আমরা দুজন ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে দিয়ে, ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে ফটর ফটর করে পার্টি করতাম। সে সময় মানিকদার বউ কত যত্ন করে আমাদের খাওয়াতো, অনেক রাত অবধি আমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকত। খেতে বসলে মানিকদার মেয়ে ইলা পরিবেশন করত। তখন থেকেই তো ইলার সঙ্গে আমার পরিচয়। মানিকদা হলেন নেতা, আমি তার প্রথম ও প্রিয় তল্পীবাহক। ইলাও ছিল আমাদের দলের মেয়ে। সেই সময় থেকে ওঠা-বসা করতে করতে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দলের জন্য প্রাণ দিতে হয় তাই দেব। বেঁচে থাকলে কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না।

অমর হেসে বলল, ওসব তোমাদের বাবু ভদ্দরলোকদের কথা।

আমি ঠিক বাবু ভদ্দরলোক নই। তোমাদের মত একজন। না আছে বাড়িঘর, না আছে সহায় সম্পদ। ছোটবেলায় পড়াশোনা ছেড়ে পার্টি করতে এসেছিলাম। তখন মানিকদা আর তার বউ অনিমাবউদির কোলে সাত বছরের ইলা। ওরা সবাই জানে আমার চালচুলো নেই কিন্তু আমি দল গড়তে

ওস্তাদ তাই আমার কাঁধে পা দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে মানিকদা।

হঠাৎ তোমার মানিকদা মন্ত্রী হল কি করে?

সে অনেক কথা। আমরা শ্রমিক আন্দোলন করতাম। ইউনিয়নের চাঁদা উঠত। মানিকদা সেক্রেটারি। তার ভাগ পেত। দল থেকে মাইনেও পেত। আর আমি? সামান্য কিছু হাত খরচ দিত মানিকদা, আর দু'বেলা খেতে পেতাম তার বাড়িতে। সে সব কথা না-ই বা শুনলে ভাই। এরপর এল ইলেকশন। স্বাধীন দেশের ইলেকশন। মানিকদাকে দাঁড় করালো পার্টি। মানিকদা পাশ করল। মন্ত্রী হল। তখন অমলেন্দুব কথা ভুলে গেল। আমি আর আমার দলবল বুক পেতে দিয়েছিলাম। তার ওপর পা দিয়ে ধাপে ধাপে মানিকদা উপবে উঠে এখন সে মন্ত্রী। আব! বলতে বলতে থেমে গেল অমলেন্দু।

গল্প শুনতে শুনতে পাঁচ মজে গিয়েছিল। তাব আনন্দ, তার মত অনেক মেয়েই যা কবা সহজ তা ছেড়ে কঠিন পথে পা বাড়ায়। ভুল সে একাই করেনি, অনেকেই করে। বড় ঘবের মেয়েরাও কবে। লোভ। লোভে পড়েই পাঁচ গিয়েছিল অসিমুদ্দিনেব ঘব করতে, মন্ত্রীর মেয়েও লোভে পড়ে এই বাবুকে খাবিজ করে আবেক বাবুব গলায় মালা দিযেছে। আবার মুখ খুলল পাঁচ। বলল, থামলে কেন বাবু? শেষ গল্পটা শোনাও।

গল্প নয় বোন দুঃখেব কথা।

অমব বিমর্ষভাবে বলল, আমবা ভিক্ষে কবি না দাদা, তবে ভিখারীরা দশ দুয়ার ঘুবেই পেট ভরায়। আমবা দশ ঘণ্টা গরুমোষেব মত মেহনত করেও ভরাতে পাবি না। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আব কি শোনাবে বাবু। তোমাদের মত উ'চু দিকে তাকাতে পাবি না, তাই দুঃখটা হজম করতে কষ্ট হয় না।

ঠিক বলেছ ভাই। ছোটবেলা থেকে ভাবতাম আমার তোমার মত মানুষরা কাজ করবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে দু'মুঠো খেতে পাবে। বড় হয়ে সেই চেষ্টাই করে এসেছি কিন্তু আমার মনটা বিষিয়ে গেল যখন দেখলাম, যারা আমাদের বুকের ওপর পা দিয়ে ক্ষমতা হাতিয়ে নিয়েছে, তাদের চারিদিকে যারা আছে তাবা ধান্দাবাজ, নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে চায়, সমষ্টির চিন্তা তাবা ভুলে গেছে। আর ক্ষমতাবানরা এই স্তাবকদের পাইয়ে দেবার জন্য সব সময় আগ্রহী এবং এইসব স্তাবকদের অকাজকে সমর্থন করে যাচ্ছে তখন মনে হয়েছে এদের কোন আদর্শ তো নেই, বরং আদর্শের গলা টিপে ধরে ওরা সবাই মিলে সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে বেশ সভ্যভব্য মুখোশ পরে, তখন ঘেন্না ধরে গেল। আদর্শের প্রতি ঘেন্না নয়, ওদের প্রতি ঘেন্না।

আর কথা নয় বাবু। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এবার আমাদের কাজে বেরতে হবে। যেতে হবে সেই রিক্সার আড্ডায়। চুক্তিমত রিক্সা নিয়ে বের হব। আর পাঁচ যাবে কাগজ কুড়াতে। একটু চায়ের ব্যবস্থা কর

পাঁচ। বাবুকে শুধু মুখে যেতে দিস না। আমি টিউকল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

অমলেন্দু বলল, আমি আর দেরি করব না। প্রথম ট্রামটা গিয়ে ধরব। সোজা চলে যাব হাওড়া। তারপর যে কি হবে তা জানি না।

তাহলে আর দেখা হবে না বাবু। মনে ক্ষোভ রাখবেন না।

কিসের ক্ষোভ ভাই। তুমি তো কাল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, এ কথাটা কখনও ভুলতে পারব না। তবে আবার হয়ত দেখা হবে। সেদিন অনেক দূরে গিয়ে ময়দানে বসে কথা বলব।

অমলেন্দু আর দেরি করল না।

অমর তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচকে বলল, শুনলি বাবুর কথা। বাবু আর মন্ত্রী একসময় বন্ধু ছিল। মন্ত্রী হয়ে ভুলে গেছে বন্ধুকে। কিন্তু ওদের ঘরের কথা আর বাইরের কথা এক নয়। ঘরে ওরা আমাদের মতই বড়লোক হবার চিন্তা করে, বাইরে এসে আমাদের শোনায় ওরা আমাদের জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করছে। ওরা যেন দরদী গরীবের বন্ধু। ছ্যাঃ।

কয়েক বছর পরের ঘটনা।

বোমার আওয়াজে শহরের মানুষ সন্ত্রস্ত।

একদল আদর্শ পাগল জওয়ান ছেলেমেয়ে ছুটে বেরিয়েছে দেশের গরীব মানুষদের মুক্তি এনে দিতে। পুলিশও আদাজল খেয়ে নেমেছে এদের নির্মূল করতে।

ঝুপড়ির বাসিন্দারা ভয়ে সিঁটকে থাকে। কখন যে তাদের ওপর পুলিশের হামলা হবে তারই বা ঠিক কি।

অনেক রাতে গুলির শব্দে অমরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাঁচ ভয়ের চোটে আঁকড়ে ধরল অমরকে। অমর যে কি করবে ভেবে পেল না। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। দুজনেই উঠে বসেছিল। পাশের কটা ঝুপড়ির মানুষরাও জেগে উঠেছে। কারও মুখে কথা নেই।

সৌর জগতের তো কোন পরিবর্তন নেই। আবার সকাল হল। গাঁজা পার্কের গাছের মাথায় কাকরা সকালের সিগন্যাল দিল। ক্রমেই ট্রাম-বাস চলতে থাকে। পাশের ঝুপড়ির মাদারী ছুটে এসে বলল, থানার দেওয়ালের পাশে একটা লাশ পড়ে আছে। পুলিশ ভর্তি হয়েছে জায়গাটা। সবাই বলছে, ছেলেটা নকশাল। কাল শেষ রাতে থানা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ তাকে গুলি করেছে।

অমর পাঁচকে বলল, তুই চায়ের জোগাড় কর আমি একটু দেখে আসি।

পাঁচ ভীতভাবে বলল, ওখানে যাসনি।

ভয় নেই। আমাদের সবাই চেনে। সেপাইরা আমার কাছ থেকে মাসে মাসে পয়সা নেয়। আমাকে চেনে। থানার মেথরটা তো আমাকে দেখলেই বিড়ি চায়। আমি যাব আর আসব।

অমর চলে যেতেই পচি চায়ের কোন জোগাড় না করে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। একবার সদর রাস্তায় বেরিয়ে দেখে এল অমর আসছে কিনা। অমরকে দেখতে না পেয়ে ঘুরে এসে তাঁবুর তলায় বসল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অমর হাসতে হাসতে ফিরে এল।

হাসছিস কেন? লাশ দেখে তোর হাসি পায় বুঝি?

নারে না। কেচ্ছা শুনে এলাম। তাই হাসছি। সেই যে বাবুটা মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার মতই ঘটনা। বাবুটা প্রাণে মরেনি। এ বেটা প্রাণে মরেছে। বাবুটা বিয়ে করতে না পেরে মস্তানের ভয়ে পালিয়েছিল, এবেটা বিয়ে করেই প্রাণ হারাল।

তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

বলছি। ওই যে থানার মেথর অবনে, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম। সহজে কি বলতে চায়। এক ভাঁড় চা খাইয়ে আর বিড়ি দিয়ে খুশি করে তবেই কথা আদায় করেছি। লোকটা খুব ভাল। একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, কাউকে বলিস না যেন।

আমি বললাম, খুব গোপন কথা বুঝি?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। দারোগাবাবুর মেয়ের কেচ্ছা। দারোগাবাবুর মেয়ে আর ওই লাশটা নাকি এক কেলাসে পড়ত। আস্নাই হল। চুপি চুপি দুজনে বিয়ে করল। দারোগাবাবু জানত না। একদল বাবু এল দারোগাবাবুর মেয়ে দেখতে। তখন মেয়ে সোজাসুজি বলল, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কারও সামনে যাব না। বাস্, গোলমাল ওখানেই।

দারোগাবাবু খোঁজ নিয়ে ছেলের হদিস করল। ছেলেকে বলল, তালাক দে। ছেলে রাজি নয়। মেয়েকে বলল, তালাক দে। মেয়ে রাজি হল না। কাল রাতে ছেলেটাকে নকশাল বলে ধরে এনে গুলি করে মেরে দেওয়ালের ওপারে ফেলে দিয়েছে।

অবনের কথা শুনে দুঃখও হল, হাসিও পেল। ভাবলাম সেই বাবুটার কথা। দারোগার মেয়েকে বিয়ে করবে চালচুলোহীন বিধবা মায়ের একটাই ছেলে, তা সহ্য করবে কেন দারোগা বাপ্। এখন নকশালদের বোমা ফাটছে। এই সুযোগে নকশাল বলে ছেলেটাকে ধরে এনে গুলি করে মারল। কেমন পাকা ব্যবস্থা। বাবু ভদ্দরলোকদের কথাই আলাদা। তুই যখন অসিমুদ্দিনকে নিকে করলি তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানিস?

পচি বাধা দিয়ে বলল, ওর কথা আর বলিসনি। একটা জুয়ারী, চোলাইখোর সেটা আবার মানুষ নাকি। তোর অবনে তো মিছে কথাও বলতে

পারে। এরাও মানুষ নয়। তুই বস, আমি মেরুয়ার দোকান থেকে এখুনি চা নিয়ে আসছি। আজ বিকেলে বউবাজার যাব ছেলেটাকে দেখতে বুঝলি।

অমর আর পচির জীবনপ্রবাহ একই খাতে বইতে থাকে।

তাদের মনে সেই বাবুটা আর দারোগার জামাইটার ঘটনা কোন রেখাপাত করেনি। সব কথাও বিশ্বাস করেনি। নিজেদের জীবন-যন্ত্রণায় তারা কাতর। অন্যের জীবন-যন্ত্রণাটা মনে রাখার কোন সুযোগই তাদের ছিল না। হাসির খোরাক জোটাবার মত দুটো ঘটনা, বুদবুদের মত মনেই মিলিয়ে গেছে।

বিকেলবেলায় পচি গিয়েছিল বউবাজারে।

এখন তার ছেলে বেশ ডাগর হয়েছে, নমিতার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। নমিতা যখন থাকে না তখন ননীবালার কাছ ছাড়া হয় না।

গতরাতের ঘটনা ব্যাখ্যান করে শোনাল পচি তার শাশুড়িকে।

ননীবালা গালে হাত দিয়ে বলল, কি বলছিস রে বউ। এমন ঘটনা কি কখনও হয়।

হাঁ মা। তোর ছেলেই খবরটা নিয়ে এসেছে।

ননীবালা অবাক হয়ে বলল, এমনভাবে মানুষ মারা যায় কি? আজকাল মানুষগুলোন কেমন তরো যেন হয়ে গেছে।

যাই তার মনে হোক, সে শঙ্কিত হল তার নিজের মেয়েকে নিয়ে। এখন থেকে রাজকুমারকে বার বার তাগাদা দিতে আরম্ভ করল খুকির বিয়ে দেবার জন্য। রাজকুমারও চায় তার মেয়ের বিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

সুদিনের আড়ালে দুর্দিনের চেহারা শীগ্‌গিরই দেখা দিল।

নমিতা এল অনেকটা রাতে সঙ্গে একজন ধোয়া জামাকাপড় পরা জওয়ান ছেলে। নমিতার পরনে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ আর পায়ে নতুন জুতো। এসেই মাকে বলল, এই তো নেত্যলাল এসেছে মা।

কে নেত্যলাল ননীবালা জানে না। কোনদিন তার নামও শোনেনি। নিত্যলালের মুখখানা রাস্তার আলোতে ভাল করে দেখে বলল, কেন এসেছে রে খুকি?

নেত্যলালকে সামনে বসিয়ে নমিতা বলল, আমরা আজ বে করেছি।

বিস্মিত ভাবে ননীবালা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছিস? নেত্যলাল বড়বাজারে কাজ করে। ভাল উপায় করে। সুতোপট্টির গলিতে ঘর আছে। কথা বল।

কি কথা বলব। বে করার আগে আমাদের বলতে পারতি। সব শেষ করে এসে তবে বলছিস। খোঁজ খবর নিতে হয়।

তা আর নিতে হবেনি। আমাদের কারখানায় কাজ করে।

নিত্যলাল বলল, হামরা দোনোজন এক সাথে কাম করছি মাইজি। আজ কালীঘাটমে সাদী করল। এবার আঁমার বাপ মাকো পাশ নিয়ে যাব, বউকে

দেখাব। ফিন কলকাতা লোটবো।

কোথায় তোমার দেশ।

হামারা মুলুক আছে বানারস জিলামে। গঙ্গাজীকা কিনারা মে গাঁও।

ননীবালা আর কি বলবে ভেবে পেল না। চুপ করেই বসে রইল। নমিতা বলল, তা হলে আমরা চললাম। বাবাকে বলিস। কাল সকালে গাড়ি, আবার যখন ফিরে আসব তখন দেখা হবে।

নমিতা নিত্যলালের হাত ধরে ফিরে গেল।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাজকুমার সব শুনে বলল, ব্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না।

তুই একবার খোঁজ নিয়ে আয় সুতাপাট্টিতে।

কলকাতার সুতাপাট্টিতে কয়েক শ' নিত্যলাল আছে তাদের খোঁজা সহজ কাজ। ছেলেটার নাম নিত্যলাল কিনা তা কে জানে। বাঙ্গালী নয়। খুবই ভয়ের। মেয়ে যখন লায়েক তখন বলার কিছু নেই। নমিতা যাবার পর রাজকুমার বিশেষ চিন্তিত না হলেও ননীবালা কেমন একটা আতঙ্কে দিন কাটায়। রাজকুমারের মাথার চুল বেশ সাদা হয়ে এসেছে। দেহের শক্তিও কমে এসেছে। তারকই তার ভরসা। কোনরকমে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিন কাটায়। অমর মাঝে মাঝে বউ নিয়ে আসে। কয়েকমাস পাঁচ আসতে পারেনি। তার আবার ছেলে হবে। হাসপাতাল থেকে বলেছে, বেশি নড়াচড়া না করতে। খাওয়াদাওয়াটা যেন ভাল করে। ছেলেটার জন্য তার মন উতলা হয়। অমর এসে খবর দেয় ছেলে ভালই আছে। কবে যে তারা কলকাতায় এসেছিল তা ভুলে গেছে রাজকুমার আর ননীবালা। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে এসেছিল। অনেক কিছু দেখলেও শুধু মনে আছে এক পয়সার লড়াইয়ের কথা। মনে আছে রাস্তায় অনেকগুলো ট্রাম পুড়েছিল। সে সময় ফুটপাত খালি ছিল, ফুটপাতে জায়গা পেতে আজকের মত লড়াই করতে হত না। একটা না একটা কাজও জুটে যেত। তারপর জোয়ান বয়সে যখন এসেছিল তখন দেহে শক্তি ছিল। লড়াই করেছিল বাঁচার তাগাদায়।

তারপর ধীরে ধীরে সব বদলে যাচ্ছে। আগে ফুটপাতটা ছিল দক্ষিণের মানুষের, এখন খোট্টার সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ওড়িয়াও আছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। গঙ্গার ওপারের জেলা থেকে কম মানুষই আসে। যারা আসে তারা ফিরে যায় নিজেদের ঘরে। স্থানীয় বাসিন্দা হল খোট্টা আর দক্ষিণের ছিন্নমূল বাঙ্গালীরা আর কিছু বাংলাদেশী।

আবার নতুন একদল এসেছে জমিদারীতে জায়গা পেতে।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোর?

ফ্যালনা। ওরা আমাগো লেগে একটু জাগা কর্যা দে।

জায়গা, তা হবে। তবে মস্তান আর পুলিশের রেট শুনেছিস তো?

দিমু। তগো জাগা যহন হইছে তহন আমাগো হইবো।

নতুন প্রজা ফ্যালনা দেবনাথ বরিশাল থেকে এসেছিল তার বউ ক্ষেমাকে নিয়ে সেই যেবার কাটাকাটি হল সেইবার। ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে এসে হাজির হয়েছে হলদিবাড়ি থেকে বউবাজারের ফুটপাতে। এসেছিল স্বামী-স্ত্রী। কিছুকাল বাদে ক্ষেমা চোখ বুজলেও রেখে গেল অজয়কে তার স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে।

ছেলেকে নিয়ে ফ্যালনা পড়ল বিপদে। এমন সময় পরিচয় হল হরিমতীর সাথে। হরিমতী খুলনা থেকে এসেছিল তার স্বামী নটবরের সঙ্গে। ব্যবসা-বাণিজ্য করত নটবর তবে পরিচ্ছন্ন কোন ব্যবসা নয়। বর্ডারে পুলিশের গুলিতে নটবর প্রাণ হারিয়েছিল। কাওটের মেয়ে ক্যাওটের ঘরের বউ হরিমতী খুব শক্ত মেয়ে। যখন খবর পেল নটবর মরেছে তখনই সে তার ভবিষ্যত চিন্তা করে নেমে পড়েছিল স্বামীর অসমাপ্ত কাজ গুছিয়ে নিতে।

হরিমতী পারেনি গুছিয়ে নিতে। পারবেই বা কেন? পুরুষরা হাল্লাক হচ্ছে সে তো একটা মেয়ে, এই সময় হিলি বর্ডারে ফ্যালনার সঙ্গে পরিচয়। তারপর ভাবসাব। এরপরেই দেখা গেল তারা স্বামী স্ত্রী হয়ে বসবাস করছে।

ষোলটা বছর মুটেমজুরি করে কেটে গেলেও হরিমতীর তিনটে মেয়ে আর দুটো ছেলে নিয়ে দিন কাটানো দায় হয়ে পড়ল।

চল আমরা কলকাতা যাই। প্রস্তাব দিয়েছিল ফ্যালনা।

তারপর একদিন তিন ছেলে আর তিন মেয়ের হাত ধরে ফ্যালনা হরিমতী হাজির হয়েছিল কলকাতার ফুটপাতে।

পথেই পরিচয় হয়েছিল নিজামের পথে। ফলের ব্যবসা করে। নিজামই তাকে ফল বিক্রির কথা দিল। ফ্যালনা ঝুড়িতে ফল নিয়ে বসত ফুটপাতে। দিন তার মন্দ চলছিল না। হরিমতীও গেরস্ত বাড়িতে কাজ খুঁজে নিয়েছিল।

বাদ সাধল তার বড়মেয়ে গঙ্গা।

নিজামের ভাই আকালুর হাত ধরে গঙ্গা হল নিখোঁজ।

ফ্যালনা মুসলমানদের ভয়ে দেশ ছেড়ে এসেছিল। সেই মুসলমানের সঙ্গে নিজের মেয়েকে পালাতে দেখে কেমন ঘাবরে গিয়েছিল।

ফ্যালনা ঠিক করল ফলপট্টির আস্তানা ছেড়ে দেবে। অন্য দুটো মেয়ে আর ছেলে তিনটে নিয়ে হাজির হয়েছিল বউবাজারে।

অজয় তখন জোয়ান মরদ। কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাই করে।

তাদের আস্তানার শেষ কোণায় থাকে বিশু রজক তার ছেলেমেয়ে নিয়ে বিশুর মেয়ে গীতার সঙ্গে ক্রমেই অজয়ের ভাব ভালবাসা জমে উঠল। সারাদিন যা উপায় করে তা চুপি চুপি এনে দেয় গীতার হাতে। বিশু পক্ষাঘাতে পঙ্গু প্রায়। ছেলেটাও ছোট। অজয়ের পয়সাতেই তাদের দিন চলছিল কোনক্রমে।

ফ্যালনা জানতে পেরে অজয়কে ডেকে বলল, শুনলাম তুই বেবাক টাকা ওই ধুপার বেটিরে দিছ্।

হ।

ক্যান?

ওগো রুজগেরে কেউ নাই। আমি দেই তাই খায়।

আমরা যে ভুখে মরছি, হেডা ভাবিস না।

আমি গীতারে বিহা করুম।

তুই ধুবার বিটিরে বিহা করবি। কইতে লাজ লাগলনি।

না। আমি বিহা করুম, করুম।

সত্যি সত্যি একদিন গীতার হাত ধরে অজয় কোথায় গেল তার হদিস কেউ করতে পারেনি। কয়েক বছর অজয় বউবাজারে এসেছিল ফ্যালনার খোঁজে। তাকে দেখেই রাজকুমার চিনতে পেরেছিল। জিজ্ঞাসা করল, ক্যামন আছিস অজয়?

ভাল। আমার বাবা মা কোথায় বলতে পাবিস?

তোর বাপ তো গত সনে মরেছে। তোর মা গেছে ছেলে নিয়ে টালিগঞ্জে তার মোল্লা জামাইয়ের বাসায়।

অজয় কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজকুমার বলল, আমার তারক বলছিল ওর সঙ্গে তোর মার দেখা হয়েছিল রাস্তায়। তোর মা বলছিল, গঙ্গার মত তোর মেজ বোন পদ্মও নাকি একটা মোল্লাকে বিয়ে করেছে। তোর মা আর দুটো ছেলে আর ছোটমেয়ে রেণুকে নিয়ে এদিকে চলে আসতে চায়।

অজয় নিজে নিজেই বলল, এত ঘটনা ঘটে গেছে এরই মধ্যে।

হাঁরে হাঁরে। তোর মা নাকি বলছিল আকানুর সঙ্গে থাকলে তাব ছোটমেয়েটাও কোন মোল্লার সঙ্গে বিয়ে করে বসবে। তাই তাকে নিয়ে এদিকে আসতে চায়। তুই একবার খোঁজ কর। তারক এলে ঠিকানা পাবি।

আমার দায় পড়েছে! সৎমায়ের ছেলেমেয়ে তাদের জন্য আমার মাথা ব্যথা নাই।

তবুও তো তোর বাপের বেটা-বেটি।

কার বেটা-বেটি জানি না। বাপ থাকলে যা হয় করতাম। একা পেটের ধান্দায় খ্যাপা কুত্তার নাকাল পথে পথে ঘুরছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অজয়।

তোর ছেলেমেয়ে কটা?

এক ছেলে এক মেয়ে।

তোর বউ কেমন আছে?

আছে। ধোপার মেয়ে মেহনত করে জাত ব্যবসা করে, পয়সা আনে।

আছিস কোথায় ?

নোনস্যাঠেকে। গোসাবার কাছে। আচ্ছা যাই কাকা। সোডা-সাবান কিনে ঘরে যামু। বেলাবেলি না গেলে ফেরী ধরা হবে না।

রাজকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অজয়ের দিকে। ধীরে ধীরে অজয় মিলিয়ে গেল জনারণ্যে।

সবার মুখে একই কথা। পেট আর পেট। কেউ তার মত ফুটপাতে পড়ে আছে পেটের চিন্তায়, কেউ চুরি ছিনতাই করছে, কেউ মোল্লার ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে। পেটের তাড়নায়। রাজকুমারের আর ভাল লাগে না। কিন্তু সে নিরুপায় করার কিছুই ছিল না, এখনও নাই।

ছমাস না পেরোতেই নমিতা এল পুলিশের সাথে খুব ভোরে।

অবাক কাণ্ড !

এতদিন নমিতার খবর পেতে এত যে মানসিক উদ্বেগ তা নিমেষে ভয়ে পরিণত হল পুলিশ দেখে। রাজকুমারের কদিন থেকেই জ্বর।' কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। ননীবালা এগিয়ে এল ভয়ে ভয়ে।

এ তোমার মেয়ে ?

মাথা নেড়ে ননীবালা সম্মতি জানাল।

বোম্বের পুলিশ একে ধরে এখানে পাঠিয়েছে। ওখানে নোংরা পল্লীতে ওকে বিক্রি করেছিল কোন এক নিত্যলাল। তার সঙ্গে তিনজন ছিল। তাদের কাজ হল মেয়ে চুরি করে বিক্রি করা। দুজনকে বোম্বের পুলিশে ধরে এখানে পাঠিয়েছে। বলতে পার নেত্যলাল কোথায় থাকে ?

না বাবু মেয়ে এসে বলল, এই হল নেত্যলাল। এর সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে বে' করেছি। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। বলল, সুতা-পট্টিতে থাকি, বেনারসে বাড়ি। বউ নিয়ে বেনারসে যাবে বলে খুকিকে নিয়ে সেই রাতেই চলে গেছে। তারপর আর কোন খবর জানি না।'

নমিতার চেহারার জৌলুষ আর নেই। ছয় মাসে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নমিতা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কোন কথা বলতে পারছিল না।

পুলিশ বলল আমরা তদন্ত করছি। তোমরা আজ আদালতে যেও। মেয়েকে জামিন করে নিয়ে আসবে। কোথাও যেও না যেন। এখানেই থেক। লোকটাকে সনাক্ত করতে মেয়েটাকে দরকার হবে। জামিন পেলে হাসপাতালে নিয়ে যেও।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেও রাজকুমার সবই শুনেছে। পুলিশ চলে যেতেই উঠে বসল, এমন সময় তারক এল ঠেলা বের করতে। রাজকুমার তারককে বলল অমরকে খবর দিতে। তারক ছুটল অমরের খোঁজে।

সন্ধ্যার আগেই অমর আর তারক ফিরে এল নমিতাকে নিয়ে।

ঘটনাটা জানার জন্য সবাই ঘিরে বসল।

নমিতা যা বলল তা হল: যেদিন আমার বিয়ে হল সে রাতে রইলাম বড়বাজারের অন্ধকার একটা সিঁড়ির তলার ঘরে। আমি আর নেত্যলাল পাশাপাশি শুয়েছিলাম, শেষ রাতে মনে হল দু-তিনজন লোক ঘরে। আমি নেত্যলালের নাম ধরে ডাকলাম। কোন উত্তর পেলাম না।

তারপর। ওদের অত্যাচার সহ্য করেই রাত কাটাতে হল। এমনই সেই ঘর যেখানে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পায় না। দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। সকাল হবার অপেক্ষা। সকাল আর হল না। সকাল হবার আগেই টানতে টানতে আমাকে তুলল একটা গাড়িতে।

গাড়িতে নেত্যলালও ছিল। আমি কাঁদছিলাম। ওদের কথায় বুঝলাম, বিয়েটা সবই ফাঁকি। মাথায় সিঁদুর দিয়ে নেত্যলাল রাস্তা পরিষ্কার করে আমাকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি করেছিল অর্জুনরামকে। আমাকে নিয়ে চলেছে বোম্বেতে আরও বেশি দামে বিক্রি করতে।

বোম্বের নোংরা পল্লীতে দেখলাম আমার মত আরও কতকগুলো দেশের মেয়ে আছে। সবাই যুক্তি করলাম পালিয়ে যাবার কিন্তু বাড়ির গেট পার হওয়াটা ছিল কঠিন? কেউ ওই জেলখানা থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। সব রকম ব্যবস্থা ওরা পাকা করে রেখেছিল। গুণ্ডা বদমাইশরা আমাদের ওপর নজর রাখত।

একটা অল্প বয়সী মোল্লার ছেলে এসেছিল। দেখলাম, আমার মাথায় মাথায় উঁচু। ওকে মদ খাওয়াতে খাওয়াতে প্রায় বেহুঁশ করে ওর প্যান্টসার্ট পরলাম, মাথায় বাঁধলাম পাগড়ি আর বেহুঁশ ছোঁড়াটাকে আমার শাড়ি পড়িয়ে শুইয়ে রাখলাম।

মেয়েদের বেরুতে দেয় না ঠিকই, পুরুষদের পকেটে পয়সা থাকলে বের হতে কোন অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে না বলে দরজায় শেকল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মাঝরাতে। গেটের পাহারা বদমাশরা হাত পাততেই দিলাম তাদের হাতে এক গোছা টাকা। তারপর রাস্তা। ঠিক করলাম রাস্তায় যখন নেমেছি তখন যেমন করে হোক পালাব।

একটা অটো যাচ্ছিল। থামালাম। বললাম থানায় চল।

এরপর থেকেই আমি পুলিশ হেপাজতে। পুলিশ হামলা করে বের করে আনল আরও ছয়জনকে। তবে এদের সবাই ঘরে ফিরতে রাজি হল না। তিনজন থেকেই গেল। কজন বদমাশকে আটক করল। আমাদের চারজনকে ফিরিয়ে এনেছে কলকাতায়।

সবাই অবাক হয়ে শুনছিল।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

অমর বলল, তোকে পালাবার বুদ্ধি কে দিয়েছিল?

ভগবান। ফুটপাতে বড় হয়েছি। পেটের ভাত যোগাতে প্রতিদিন লড়াই করেছি। আর যতটা বোকা ছিলাম সে বোকামি আমার সেই কালীঘাট যাবার রাতেই শেষ হয়েছিল। তখন থেকেই পালাবার চেষ্টায় ছিলাম। পথও খ‍ুঁজছিলাম। সেদিন সরাফআলি আমার ফাঁদে পড়েছিল বলেই ফিরে এসেছি। এতকাল ওরা মেয়েদের ফাঁদে আটকায়। এবার উল্টোটা ঘটিয়েছি।

নমিতার কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি।

খবর পেয়ে মরিবালা এসেছিল শোভাবাজার থেকে। আগাগোড়া শ‍ুনে মরিবালা কোন মন্তব্য করল না। ননীবালাকে বলল, আমি খ‍ুকুকে নিয়ে যাচ্ছি। ও আমার কাছে থাকবে।

নমিতাও যেতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু বিকেলবেলায় তার বেগে জ্বর আসতেই যাওয়া আর হল না।

ডাক্তার দেখাবার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল পরদিন সকালে। অনেক দেখেশ‍ুনে ডাক্তার বলল, এর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার।

অনিমার সঙ্গে মরিবালা ছিল। সে বলল, কত টাকা লাগবে ডাক্তারবাব‍ু।

এখানে কোন টাকার দরকার হয় না। বাইরে রক্ত পরীক্ষা করলে টাকার দরকার হবে। কত হবে তা জানি না।

কি করবি খ‍ুকি?

বাইরেই করব। কাগজটা নিয়ে চল বাবা!

সেইদিনই খ‍ুঁজে পেতে রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে এল। পরের দিন বিকেলে রক্তের রিপোর্ট নিয়ে গেল হাসপাতালে। তখন হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরের দিন রক্তের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার শ‍ুধ‍ু পাশের ডাক্তারকে বলল ভি ডি।

হাসপাতালেই বিনা পয়সার চিকিৎসা করে নমিতা অনেকটা স‍ুস্থ হবার পর গেল মরিবালার কাছে।

বিপিন সবে ভিক্ষা করে ফিরে হাতম‍ুখ ধ‍ুয়ে তার ঝুপড়ির সামনে এসে বসেছে এমন সময় নমিতা আর মরিবালা হাজির হল।

বিপিন বলল, কেমন আছিস খ‍ুকি?

এখন ভালই আছি। বাপ‍্রে! হাতে আর কোমরের লোমে লোমে স‍ুঁচ ফুটিয়ে আর কিছ‍ু রাখেনি কাকা। আরও কটা স‍ুঁচ ফোটাতে বলেছে।

মরিবালা নমিতাকে ঝুপড়ির ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজে বসল রান্না করতে।

কটা দিন মরিবালার সঙ্গে বেশ কেটে গেল।

একদিন রাতে চোর চোর চিৎকারে ঘ‍ুম ভেঙ্গে গেল। নমিতা জেগেই ছিল। ছেঁড়া পলি কাগজের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার বাঁক ঘ‍ুরে এসে শ‍ুয়ে পড়ল ফুটপাতের অন্যান্য ঘ‍ুমন্ত লোকদের মধ্যে। যারা চোর-চোর করে তেড়ে এসেছিল তারা আর চোরকে

দেখতে না পেয়ে অনেক কিছু বলাবলি করে ফিরে গেল। নমিতা সব কিছু দেখেও চুপটি করে শুয়ে রইল। সবাই যখন ফিরে গেল তখন মরিবালাকে বলল, চোরটা ওই দলের মধ্যে এসে শুয়ে পড়েছে।

তাই নাকি! চুপ করে যা। কাউকে বলিসনি যেন। ওরা চুরি করে, ছিনতাই করে। গলায় ছুড়ি বসিয়ে দিতে পারে।

নমিতা কাউকে না বললেও আর দু-একজন চোরকে গা-ঢাকা দিতে দেখেছে। সকালবেলায় সবার অজান্তে চোর উঠে চলে গেলেও ঘটনাটা নিয়ে ফিস্ ফিস্ চলছিল।

ওপাশের জমিদার হরদয়ালরাম সবাইকে বলল, লাজুয়াকে আড্ডা মে চোর ঘুষল। হামলোগ্ দেখলো। এসা কাম বহুত খারাপ। কোহি রোজ পুলিশ হামিলোগের উপর ভি ঝামেলা করতে পারে।

হরদয়াল মুঙ্গের থেকে এসেছিল বছর দশেক আগে। প্রথমে মুঠিয়াগিরি করত। তারপর এল তার জরু বাচ্চা। পাকা বন্দোবস্ত করে পার্কের ধারে ঝুপড়ি বেঁধেছে। বাচ্চারা বড় হয়েছে। মেয়েটা তো বেশ সেয়ানা। হরদয়াল সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে মেয়েটার জন্য। গাঁয়ে যখন ছিল তখন বয়সটা কম ছিল, ক্ষেত মজুরের কাম করত, মরা গরু মোষের চামড়া কেটে দু'পয়সা আয়ও হত। কিন্তু ভূমিহারদের জুলুমে ঘর ছেড়ে পালিয়ে ছিল। হরদয়ালের বাবা ভূমিহার রাঘব সিংহের কাছ থেকে দুশ টাকা কর্জা নিয়েছিল বোনের বিয়ে দিতে। সেই টাকা তার জীবনে শোধ করতে পারেনি। হরদয়ালের বাবার মৃত্যুর সময় সেই কর্জা সুদে আসলে দু'হাজার টাকা পেরিয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা শোধ দিতে হরদয়ালকে ভূমিদাসের মত পেটভাতায় কাজ করতে হত রাঘবের জমিতে। কাজ করতে করতে একসময় রাঘব বলল, আরে বেটা, তুমার বাপকা কর্জা অভি তিনহাজার হো চুকা। নয়া খৎ করনে হোগা।

হরদয়াল কোন জবাব দেয়নি। বাবার ঋণ শোধ দেবার কতটা দায়িত্ব তার ছিল তা সে নিজেও জানত না। কি করে দুশ টাকা তিন হাজার হল তা রাঘব জানে আর জানে ওই সব জুলুমবাজ ভূমিহাররা। গোলমাল হল টিপ ছাপ দেবার সময়। হরদয়াল বলল, হামি টিপ ছাপ নেহি দেগা মালিক। বাপকা কর্জ। হামি নেহি দেখা।

রাঘবের মুখের ওপর এমন কথা বলার সাহস একটা গরীব মুচির আছে তা ছিল কল্পনাতীত। রাঘব চোখ পাকিয়ে বলল, তোর বাপ্ দিয়া। তুভি দেগা।

মাপ কর মালিক। হামি নেহি সাকেগা।

রাঘব চুপ করে গেল। তখন কোনরকম উষ্মা প্রকাশ করেনি তবে হরদয়াল বুঝেছিল রাঘব সহজ লোক নয়। এর বদলা সে নেবেই। কদিন সে নজর রাখল রাঘবের লোকজনের ওপর। এর মধ্যেই মুচিপাড়ায় জানাজানি হয়ে গেছে হরদয়াল আর রাঘবসিংহের লড়াই আসন্ন। হরদয়ালও চিন্তিত। মুচি--

পাড়ার সবাই চিন্তিত। সবাই জানে হরদয়াল যদিও লক্ষ্যস্থল তবুও মুচিপাড়ার লোকরা কেউই রেহাই পাবে না।

সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে স্থির করল জওয়ান মেয়েদের সবার আগে গ্রাম থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে হবে। ভূমিহারদের গুণ্ডাদের প্রথম লক্ষ্য বস্তু হল জওয়ান মেয়েরা। তাদের ওপর জুলুম হবে বেশি, তাদের মর্যাদা লুণ্ঠন করাই হবে গুণ্ডাদের কাজ।

হরদয়াল তার বউ আর ছয় বছরের মেয়েকে পাঠিয়ে দিল তার শ্বশুরের কাছে। একাই রয়ে গেল তার বাড়িতে। অন্যান্য মুচি পরিবারও তাদের মেয়েদের ভিন গাঁয়ে পাঠাতে থাকে। যাদের কেউ নেই তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হল।

কিন্তু রাঘব সিংহের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সবাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। সবাই ভাবছিল তাদের বউ ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে আনবে ঘরে। এমন সময় ঘটল ঘটনা। গভীর রাতে এক দল লোকের আনাগোনায় হরদয়ালের ঘুম গেল ভেঙ্গে। উঠে বসবার আগেই লক্ষ্য করল তার বাড়ির ছাউনি আগুনে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। হরদয়াল ছুটে বের হল ঘর থেকে। চিৎকার করে ডাকল সবাইকে। মুচিপাড়া হৈ-হৈ করে জেগে উঠল। তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি ছুটে আসতে থাকে। হরদয়ালের পাশেই ছিল বনোয়ারী। তার বুকে গুলি লাগতেই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হরদয়াল উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা গ্রাম জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। কে মরল, কে জখম হল তা আর দেখার সময় ছিল না কারও। যে যেমন পারল প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে লাগল। হরদয়ালও ছুটছে। ঘণ্টা খানেক ছোটার পর মনে হল এবার সে নিরাপদে আর ছুটবার দরকার নেই। খোলা মাঠের ধারে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল।

এরপর কি হয়েছে তা দেখতে আর হরদয়াল ফিরে আসেনি গ্রামে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এসেছিল কলকাতায়। খুঁজে পেতে শোভাবাজারের পার্কের ফুটপাতেই গামছা পেতে রাত কাটাতে থাকে। এরপর দশ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে শ্বশুরাল গিয়ে বউ মেয়ে আর ছেলেকে নিয়ে এসেছে। এখন আর খোলা আকাশের তলায় রাত কাটায় না। চাটাই আর চট কিনে একটা ঝুপড়ি তৈরি করে নতুন করে সংসার পেতেছে।

হরদয়াল ভীরু নয় কিন্তু পরিবার পরিজনকে নিরাপদ রাখতে সে সব সময় চিন্তা করে। চোর এসে যাদের আড্ডায় শুয়ে পড়েছিল তাদের ডেকে বলল, তুম লোগ ইস্‌মে নজর দেও নেহি তো পুলিশকা ঝামেলা হোগা।

সবাই একমত হলেও আড্ডার লোকেরা স্বীকার করল না চোর এসে তাদের মধ্যে শুয়েছিল পাড়ার লোকের তাড়া খেয়ে।

যে বাড়িতে চুরি হয়েছিল সে বাড়ির লোকেরা থানায় ডাইরি করেছিল।

কোথাও চোর তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশ বুঝেছিল চোরের সাঙ্গাত রয়েছে ফুটপাতে। তাদের মধ্যে আত্মগোপন করেছে।

কদিন পরে দুই লরী বোঝাই পুলিশ এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলে ফুট পাতের পুরুষ জমিদারদের টেনে তুলে বেধড়ক পেটাতে পেটাতে বেছে বেছে বজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। নমিতা লক্ষ্য করল যেখানে চোর গিয়ে শুয়ে পড়েছিল সেখান থেকেই দুজনকে পুলিশ গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ বোধহয় ভুল করেনি কিন্তু আসল চোরকে ধরতে পারেনি। সেই রাতেই সে হাওয়া হয়ে গেছে।

হরদয়াল সকালে আর কাজে বের হয়নি।

রাস্তায় পায়চারি করছিল।

শিবানীর মা আসছিল শিবানীর ছেলেকে কোলে করে। শিবানী গেছে গঙ্গার ঘাটে। শিবানীর মাকে দেখে হরদয়াল জিজ্ঞেস করল, তুহার দামাদ কো তো নেহি লে গিয়া ?

আমার জামাই তো এখানে থাকে না। ছয় মাস হয়ে গেল সে পালিয়েছে।

ভাগ গিয়া কাহেরে ?

ও কথা শুনে লাভ নেই। তোরা ওসব বুঝিবনে।

শিবানীর বিধবা মা নতুনবাজারের ফুটপাতে বসে তরকারি বিক্রি করত। তার পাশে বসে শিবানী ছোটবেলা থেকেই মাকে সাহায্য করত। মায়ের পাশে বসে থাকতে থাকতে শিবানী ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে উঠল। নানা জাতের খদ্দের আসত, তাদের মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে ব্যবসাটা মন্দ চলছিল না, এমন সময় দেখা হল দুলালের সঙ্গে শিবানীর। বাজার করতে এসে শিবানীর সঙ্গে কয়েক দণ্ড কথা না বলে দুলাল কোন দিনই ফিরে যেত না। শিবানীর মা এগুলো লক্ষ্য করেও কিছু বলত না। ফুটপাতের জমিদারদের দেমাক নিয়ে থাকলে পেটের ভাত জোটা মুস্কিল। সেই মুস্কিল আসান করত শিবানীই। বলল তার মাকে, আমি বিয়ে করব মা।

শিবানীর মা চমকে ওঠেনি তবে মেয়েটা যাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে নজর না দিলে শিবানীর ভবিষ্যত অন্ধকার হতেও তো পারে। শিবানীর মা বলল, পাত্রটি কে—

কেন ? ওই দুলালবাবু।

দুলাল তোকে বিয়ে করতে চায় বুঝি ? কি কাজ করে দুলাল ?

দুলাল মোটর গ্যারেজে কাজ করে। মেকানিক দুলালই তো বিয়ে করতে চেয়েছে।

বেশ। তবে দুলালের সঙ্গে আমি কথা বলব।

দুলালের সঙ্গে কথা বলেছিল শিবানীর মা। বিশেষ কোন গলদ খুঁজে পায় নি। তাই রাজি হয়ে গেল। বিয়েও হল কালীঘাটে।

দুলাল শিবানীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

একমাস না যেতেই শিবানী মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। শিবানীর জবানীতে জানা গেল দুলালের আগে বিয়ে হয়েছে, সে বউ বর্তমান। শিবানী সতীনের ঘর করতে রাজি নয়।

শিবানীর মা গেল দুলালের বাড়িতে।

বেশ অশান্তি দেখা দিল শাশুড়ি জামাইয়ে।

দুলাল বলল, অত ভাবছ কেন মা? এই বউ শিবানীর ঝিয়ের কাজ করবে এ বাড়িতে ঝিয়ের মত থাকবে ওই হারামজাদী। আমি নিজে গিয়ে শিবানীকে নিয়ে এসে বাড়ির সব কিছু ওর হাতে তুলে দেব। তুমি ভয় পেওনা মা।

কিন্তু তুমি আগে কেন বলনি তোমার বউ আছে।

বউ থাকলে বিয়ে করা যায় না। আমি তো শিবানীকে রাজার হালে রেখেছি। ওর চলে যাবার কোন কারণ নেই। মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট করে কি লাভ।

দুলালকে সঙ্গে করে শিবানীর মা ফিরে এল। অনেক আলোচনার পর শিবানী গেল দুলালের সঙ্গে সংসার করতে। এবার শিবানী ফিরে এল আট মাস পরে। এসে বলল, দুলালের কথা বিশ্বাস করিস না মা। ও হল পাকা বদমাশ। আগের বউটাকে তাড়িয়েছে, আবার গোপনে শেয়ালদহের একটা মেয়েকে বিয়ে করে হাজির হয়েছে। পর পর দুজনের সর্বনাশ করে ওর শান্তি হয়নি, আরেকটা মেয়েরও সর্বনাশ করল। ওর সঙ্গে ঘর করব না।

শিবানীর মা তার দিকে তাকিয়ে বলল, তাতো বুঝলাম। কিন্তু তোর তো প্রায় পুরো সময় হয়ে এসেছে। ছেলেটা কে দেখবে।

আমি তুই। আমি জেনেছি দুলাল মরেছে, তার ছেলে যদি বাঁচে তাকে কোলে নিয়েই জীবন কাটাব। মরুক দুলাল। ওই শয়তানকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের বিয়ে না ছাঁই। কালীঘাটে যা বিয়ে হয় তা বিয়েই নয়। মাগী পোষার লাইসেন্স। কালীঘাট তীর্থ নয় পাপপুরী।

শিবানী সংসার পেল না, স্বামী পেল না, পেল একটা ছেলে।

দুলাল একবার এল না ছেলে দেখতে।

আপশোষ নেই, শিবানী ছেলে পেয়েই সে সব ভুলে গেছে। আপশোষ করে শিবানীর মা। মাঝে মাঝেই বলে, তোদের আচ্ছা ভাব ভালবাসা। নিজের পেট চালাতেই হয়রান, এখন আরেকটা পেট চালাতে নাকাল হতে হবে।

হরদয়ালের কথায় তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। যেটা ছিল ব্যথা তা পরিণত হয়েছিল জাতক্রোধে। জামাইয়ের কথা কেউ বললেই তেতো

বিরক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকত। হরদয়াল অত সব বোঝে না। দরকারও হয় না সব কিছু জানার।

রাতের বেলায় পুলিশের হামলায় সবাই কেমন ভীত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে পুরুষরা। নমিতা ঝুপড়ির সামনে বসে রাতের এঁটো থালাবাসন মাজছিল। বিপিন তার ক্র্যাচ নিয়ে বের হবে এমন সময় বাচ্চা ছেলের কান্নায় কেমন থমকে গেল সবাই।

মরিবালা বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল হরদয়ালের ঝুপড়ির দিকে। হরদয়ালের ঝুপড়ির পেছনেই শিবানীর মা থাকে। ছেলের চিৎকার শুনে শিবানীর মা-ও ছুটে এসেছে। এতক্ষণ শিশুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, এবার শোনা গেল শিবানীর কান্না।

শিবানীর চার মাসের ছেলেটা বিকট চিৎকার করছে আর ছটফট করছে কাঁথার ওপর।

হরদয়ালের বউ বেরিয়ে এসে বাচ্চাটা ওভাবে ছটফট্ করতে দেখে গালে হাত দিয়ে তার পাশে বসে কিছুক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মালুম হোতা বিচনি পাকড় লিয়া।

কিচনি মানে ভূত।

সর্বনাশ!

ওঝা দেখতে হবে। কোথায় ওঝা থাকে কেউ জানে না।

হরদয়াল গম্ভীর ভাবে বলল, হায় একঠো গুণিন। বোলাকে আনেগা। লেকিন দু দশ রুপেয়া তো লাগে গা।

শিবানীর মা ব্যস্ত ভাবে বলল, তাই দেব। তুই গুণিন খুঁজে আন হরদয়াল।

মরিবালা আর নমিতা দাঁড়িয়েছিল। সব কিছু দেখে বলল, শোন্ মাসী তুই হাসপাতালে নিয়ে যা। গুণিন দিয়ে কিছু হবে না। টাকাই নষ্ট হবে।

হরদয়াল চটে উঠল। বলল, কা কহিলু রে, মরিবালা, গুণিনসে কুছ হোবে না। আরে হামারা মুলুক মে ডাংগদর কাঁহা, হামি লোক ওঝাসে বেমার কা এলাজ বানাতে হ্যায়। সমঝি। হামার বেটিকা এ্যাসা হুয়া থা। ওঝা পানি নে মন্তর দিয়া। উসকি বুঁদ বুঁদ করকে পিলায়া, বেটি হামার আরাম হো গেইলো।

শিবানীর মা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

সমস্যা সমাধান করল শিবানী। বলল, আমি ডাক্তারের কাছেই যাব খোকাকে নিয়ে। ওঝা ডাকতে হবে না। তোরা যা। ছেলেটার তারাস লেগেছে। ডাক্তার দেখাতে যাব। তুই আমার সঙ্গে চল দিদি। মা তুই আজ দোকান লাগা, ঘরে যা আছে তাতেই চলবে।

শিবানী ছেলে নিয়ে গেল হাসপাতালে। মরিবালা দুপুরবেলায় ফিরে এসে বলল, বাচ্চাকে বেড়ে দিয়েছে।

বিকেলবেলায় শিবানী একাই ফিরে এল।

বাচ্চা কইরে শিবানী? জানতে চাইল সবাই।

রেখে দিল। চাট্টি খেতে দে মা। আমাকে হাসপাতালেই রাতের বেলায় থাকতে হবে।

শিবানীর মা কিছু বলবার আগেই শিবানী বলল, তোদের কাউকে থাকতে দেবে না রাতে। আমাকে থাকতে দেবে। তুই ভাত দে, আমি টিউকল থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসি।

এই ভাবেই দুটো রাত জাগার পর আলুথালু বেশে সকাল বেলায় শিবানী ছুটে এল। শীগ্‌গীর চল মা, বলে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবানী।

অমন করছিস কেন?

খোকা কাঁদছে না। খাচ্ছেও না।

ফুটপাতের জমিদাররা দল বেঁধে গেল হাসপাতালে। নিশুতি রাত। সবাই হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছে খবরের।

খবর এল, তখন তিনটে বেজে গেছে।

খোকা আর বেঁচে নেই।

পাগলের মত শিবানী আঙ্গিনায় লুটোপুটি করে কাঁদতে থাকে। হরদয়ালের মেয়ে লোতিয়া আর নমিতা কোনরকমে শিবানীকে মাটি থেকে তুলে নিল রিক্সায়। অনেকেই থেকে গেল বাচ্চাটার সদগতি করতে।

শিবানীর কান্নার শব্দে সবাইয়ের চোখেই জল।

সারাদিন শিবানীকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

সন্ধ্যায় অন্ধকার নামতেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে ফুটপাতের জমিদার পল্লীতে। রোজকার স্বাভাবিক ঘটনাগুলো আজ নিঝুম হয়ে গেছে। কেউ কেউ রান্নায় ব্যস্ত কিন্তু তাদের মুখে কথা নেই। শিবানীর ব্যথা সবাই সমানভাবে অনুভব করছে, সবাই যেন শোক সন্তপ্ত।

নমিতা চুপ করে মরিবালার রান্নার পাশে বসেছিল। চুপি চুপি লোতিয়া এসে বসল নমিতার পাশে। নমিতা অথবা মরিবালা কোন কথা না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল কয়েকবার, লোতিয়া যদি কিছু বলে তারই অপেক্ষা করছিল।

লোতিয়া শিবানীর বিষয় উল্লেখ করল না। ফিস্ ফিস্ করে বলল, ওই দুই আদমির কয়েদ হয়ে গেছে দুই সালকা লিয়ে।

নমিতা জিজ্ঞেস করল, কোন দুইজনের?

ওহি, জিসকো পুলিশ ধরে লিয়ে গেল।

হুঁ, বলে মরিবালা উনুন থেকে ভাত নামাল।

আর কিছু জানতে চাইল না নমিতা।

ওহি যে কোণে মে ঝুপড়ি। উস মে দু তিন মরদ রহে, সামকা বাদ বাবুলোক আসে। ঝুপড়ি মে হাত ঘুষে দেয়, পুড়িয়া নেয় চলে যায়।

কিছু সওদা করে।

নেহি দিদি, উ লোক কোহি খারাপ চিজ বেচা-কেনা করে।

মরবে। পুলিশ খবর পাবে ঠিকই।

মরণে দাও। লেকিন, যব সব আদমি নিকাল যায় উস্ বখত ছুকড়ি লোক ভি যাতা হ্যায়।

মরিবালা সব বোঝে ও জানে। ফুটপাতে বাস করে দু'জনের সঙ্গে কাজিয়া করা তো সম্ভব নয়, উচিত নয়। তাই সব জেনেও কিছু বলে না। নমিতা ঘর পোড়া গরু। সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, জেনেছে তাই সতর্ক দৃষ্টি তার। সে জানে এই ভাবে তাকে বুদ্ধি দিতে আসত নেত্যলাল। উঃ! কি শয়তান হারামজাদা! নেত্যলাল পালিয়েছে, পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি, ওর সাঙ্গাতরা এখনও কয়েদ আছে। নমিতার আর কোন আপশোষ নেই। অতীত জীবনটা তার মনে কোন ছাপ না রাখলেও প্রবল ঘৃণা তার মনে ছিল পুরুষজাতটার ওপর। তবুও আসঙ্গ লিপ্সা তার যায় নি। রোগমুক্ত হয়ে মরিবালার কাছে এসেছিল, ভেবেছিল সে বোধহয় পারবে সংযত জীবন যাপন করতে।

নমিতা ভেবে দেখেছে, মরিবালাই বা কতদিন তার খোরাক জোটাবে। বাসন মেজে কাপড় কেচে পেটের ভাত কোনরকমে সংগ্রহ হলেও এই বিরাট বিশাল বিলাসবহুল শহরের উপরতলার দিকে তাকিয়ে লোভ সম্বরণ করা তো সহজ নয়। যৌবন তার দেহে, সেই যৌবনের জৌলুষ ঢাকা পড়েছে দারিদ্রের নিষ্ঠুর চাপে। বোম্বেতে সে বুঝে এসেছে নারীমাংস ভোগকারীদের মানসিকতা, কয়েক মাসে সে রোগাক্রান্ত হলেও ছলাকলায় সে পিছিয়ে ছিল না। সত্যিই একদিন সে লাগাম ছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত নর্তন আরম্ভ করল।

মরিবালা বলল, একি করছিস বিস্তি?

নমিতা প্রথমে কোন উত্তর দেয়নি। পরে বলেছিল, পেটের খিদে, মনের খিদে, দেহের খিদে, বুঝলী কাকী।

তা হলে ও-পাড়ায় ঘর বাঁধিস না কেন! এই ফুটপাতে বাস করে কেন সবাইকে মারবি।

জানিস কাকী তোর মত স্বামী সোয়াগী এই ফুটে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। পেটের দায়ে, দেহের দায়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চায় ফুটের সব মেয়েরা। যাদের ভাতার নেই যাদের ভাতার পাওয়ার আশা নেই তারা মরদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে!

তবে কি?

মাগনা মাগনি নয়। পয়সা না দিলে কেউ খাতির করে না।

মরিবালা সব শুনে চুপ করে গেছে।

নমিতা পাশেই একটা ঝুপড়িতে জায়গা করে নিয়েছে সুখচাঁদের সঙ্গে।

তারপর?

দেশে মুল্লুকে নিয়ে যাব।

খেঁকিয়ে উঠে নমিতা বলে, ঝাঁটা মার তোর মুল্লুকে। শোন্, যা পয়সা কামাই করবি এনে দিবি আমার হাতে। যদি তাড়ি খাস তা হলে বুঝবি মজা!

তাড়ি আর চোলাই না খেয়ে সুখচাঁদ পোস্তার বাজার থেকে কোনদিনই ফেরে না। সেটাও হয়ত নমিতা সহ্য করত। কয়েক মাস পরে দেখল সুখচাঁদ রোজ ঝুপড়িতে অনেক রাতে ফিরছে। তক্কে তক্কে থেকে খবর নিয়ে জানল, কলুটোলার ফুটে আসিয়া নামের একটা মোল্লার মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছে সুখচাঁদ।

দুদিন সুখচাঁদের দেখা নেই।

সে রাতে সুখচাঁদ ফিরে এসেছে টলতে টলতে। নমিতা প্রস্তুত ছিল। সুখচাঁদ গুঁড়িমেরে ঝুপড়িতে ঢুকতেই চ্যালা কাঠ নিয়ে তেড়ে ধরল।

কোথায় ছিলি বিটলে?

বন্দরমে। দো রোজ রাত ভর কাম হইলো রে।

তোর মুখে আগুন। বের হ, শীগ্‌গীর বের হ। মোল্লা মাগীটা বুঝি তাড়িয়েছে তোকে। আর আসিস না। বের হয়ে যা। নইলে দেখছিস চ্যালা কাঠ, তোর হাড় পাঁজরা দেব গুঁড়িয়ে।

নমিতার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে ঘাবরে গেল সুখচাঁদ। মিনতি করে বলল, মাপ করদে নমি।

দো রাত বন্দরে কাম করলি তো টাকা কোথায়, দে।

রুপায়া। হ্যায়। লেকিন।

লেকিন মেকিন বুঝি না। দু'রাত কাম করলে কমসে কম তোর পকেটে তিরিশ টাকা থাকবে। দে টাকা।

ছিল রে। দারু পিয়ে নিলাম। রোটি উটি খাইলাম। এই যে এক রুপায়া কম বিশ।

বেশ। রাতে তোকে থাকতে দেব না। টাকাটা দে। বাইরের ফুটে শুয়ে থাকবি। কাল সকালে ফয়সালা হবে।

নমিতা টাকা কয়টা সুখচাঁদের হাত থেকে নিয়ে বাইরে একটা চট ছুড়ে দিয়ে বলল, য়া। আজ রাতে তোকে ফুটপাতেই শুতে হবে। যা।

॥ আট ॥

অমরের ছেলেটা বড় হয়েছে।

রাজকুমার তার নাম রেখেছে নদেরচাঁদ।

অমর তার বউ নিয়ে গাঁজা পার্ক ছেড়ে চিড়িয়াখানার দিকে খালের ধারে ঝুপড়িতে থাকে। তার বউয়ের কোলে নতুন খোকা আর নতুন খুকী। তাদের নিয়ে তার বউ বেশ মনের আনন্দে আছে। রাজকুমার ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম তাকে ক্রমেই পঙ্গু করে তুলেছে। ননীবালা এখনও কিছুটা শক্ত সমর্থ থাকলেও তার বেশির ভাগ কাজই করে দেয় নদেরচাঁদ। অমর জিজ্ঞেস করেছিল, খোকার নাম নদেরচাঁদ রাখলি কেন রে মা ?

উত্তর দিয়েছিল রাজকুমার।

আমি রাজকুমার। কেমন আমার রাজত্ব দেখছিস তো ? আমার ঠাকুরদার বাবার ছিল কয়েক বিঘে জমি জিরেত। ঠাকুরদা ফকিরচাঁদ লাটের চাকরি করত, সে হয়েছিল ফকির। ঠাকুরদা মরলে তিনটে বোনের বিয়ে দিতে, বাপের ঋণ কর্জা শোধ দিতে দিতে বাবা হয়েছিল নফরচাঁদ। বাবা ভেবেছিল, নফর আর ফকির সবই তো নামের সঙ্গে মিশে গেছে, তাই আমার নাম রেখেছিল রাজকুমার। নফর আর ফকির যাতে না হতে হয় তাই আমার নামের সঙ্গে কাজের মিল রাখতে চেয়েছিল। আমি রাজকুমার হলাম ফুটপাতের জমিদার। ভাবলাম, আমার তিনপুরুষের অনেক কথা বলার লোক তো চাই, তাই তোর নাম রাখলাম অমরচাঁদ। অমর হয়ে আমাদের কথা শোনাবি।

রাজকুমারের কথা শুনে অমর হেসে উঠল।

হাসছিস বেটা। একে বলে কপাল। তাই কপাল যারা মানে তারা ধর্মকর্ম করে। তোর ব্যাটাকে ধর্মকর্ম করার রাস্তা খুলে দিতে নাম দিয়েছি নদেরচাঁদ।

রাজকুমারের কথার গুরুত্ব অমর বুঝলেও, যেন ভাবতেও পারে নি, তার ছেলে কোন দিন ধর্মকর্ম করবে।

নদেরচাঁদ তার নদেরচাঁদ নামটা ধরে রাখতে পারে নি। তাঁর নাম হয়েছে চাঁদু। সকালবেলায় উঠেই দশ বছরের চাঁদু ঠাকুরদাকে এক ভার গরম চা এনে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাগজ কুড়াতে। ননীবালা তার সঙ্গে সঙ্গে যায় পোড়া কয়লা ডাস্টবিন থেকে কুড়াতে। দুজনেই সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসে। রান্না করে। রাতের খাওয়া শেষ করে পান্তা রেখে শুয়ে পড়ে।

প্রতিদিন তারক আসে ঠেলা নিয়ে। পুরানো ঠেলা বার বার মেরামত করতে হয়। পুরকর দিতে হয় আর রাজবাড়ির খোট্টা পেয়াদাদের হাতে গুঁজে

দিতে হয় রোজকার ট্যাক্স, সেটাও কম নয়, কম করেও আটটা টাকা দিয়ে যখন ঘরে ফেরে তখনও তারকের হাতে যে টাকা থাকে তার তিনভাগ হয়। দুভাগ তারক নেয়, একভাগ দেয় রাজকুমারকে।

তারক বিয়ে করেনি।

মেয়েমানুষ তার আছে গোটা তিনেক। কাউকে জানায় না কোনটা কোথায় থাকে।

একজনের বয়স তারকের চেয়ে বেশি। তার বিয়ের স্বামীর তিনটে ছেলে মেয়ে। তাদের পেট চালাতে সরিতার টাকার দরকার। তাই তারক তার খদ্দের। সপ্তাহে দুদিন আসে তারক। দশ বিশ টাকা দিয়ে সরিতাকে হাতে রাখে। সরিতাও ওতেই খুশী। তার খদ্দের ধরার বয়স নেই। তারক তাকে দয়া করেই কিছু কিছু দেয়।

সরিতার ছেলেরাও কিছু কিছু উপায় করে।

সরিতা ভাবে তার মেয়েটা ডাগর হলে তার কষ্ট কমবে। সরিতা বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজে, তার মেয়ে সুবলা তার সঙ্গে কাজ করে। ডাগর হলে মেয়েটাই একক ভাবে কাজ করতে পারবে, তা হলে একটা পেট আর তাকে পুষতে হবে না।

সরিতার মেয়েকে নাম জিজ্ঞেস করলে বলে সুবলা।

তুই কার মেয়ে?

সরিতার মেয়ে।

তোর বাবার নাম কি?

সুবলা বলতে পারে না তার বাবার নাম, বলতে পারে না তার গ্রামের নাম, বলতে পারে শুধু তাদের ঘর ছিল ডায়মন হারবার নাইনে। এইটুকু পরিচয় সম্বল করে ওরা এসেছে কলকাতায়। এই পরিচয় ওরা হারিয়ে ফেলে যৌবন প্রাপ্তির সময় থেকে। ওরাও ভোগ করতে চায়, বাঁচতে চায়, ওদের যারা সঙ্গী জোটে তারাও ভোগ করতে চায় বাঁচতে চায়। বাঁচার লড়াইটাই ওদের আসল পরিচয়।

সরিতা থাকে পাতিপুকুরের জলা জমিটার পাশে যে বস্তি তার পাশে ছোট একটা দরমার ছাউনীর তলায়। ছাউনীটা পলি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখে বর্ষাকালে।

বামনী হল তারকের প্রিয় মেয়েমানুষ।

বড় মসজিদ পেরিয়ে নতুন সড়কের দিকে গলি দিয়ে যেতে যে সব ফুটপাতের জমিদার সম্পত্তি আগলে বসে আছে, তাদের মধ্যে থাকে বামনী। রাজকুমার বামনীকে চেনে। সাত আট বছরের আগে যাদবপুর স্টেশনের পাশে বামনী বসেছিল। ফ্রক পড়া বেশ আঁটোসাটো তের চোদ্দ বছরের মেয়ে। তার সঙ্গে তারকের কি ভাবে পরিচয় হয়েছিল তা কেউ জানে না। তারক তাকে নিয়ে

বউবাজারের ফুটপাতে ননীবালার কাছে আসে নি। তার মহাজন ঝাগরমলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের বোন বলে বাড়ির ঝিয়ের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল।

বামনী নামটা মাড়োয়ারি বাড়িতে বেশ পছন্দ সই, সেজন্য বামনীর পরিচয় নিয়ে তারা বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেনি। রাতের বেলায় মহাজনের বাড়ির বারান্দার একপাশে শুয়ে কাটাত। দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল, বামনী মাইনে পেল। সেই মাইনের টাকায় বামনীর নতুন শাড়ি পেটিকোট-ব্লাউজ হল।

মাড়োয়ারি বাড়ির বাসন মাজা আর বামনীর পছন্দ নয়।

বামনী জিজ্ঞেস করেছিল, কি রে তারক, এবার বিয়ে করবি ?

না। তোকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

আমার চাল চুলোর ঠিকানা নেই, তোকে বিয়ে করে শেষে দুজনেই শুকিয়ে মরব নাকি।

তুই কেমন মরদ রে, দুজনে মেহনত করব। তাতেই চলবে।

দেখ বামনী বলাটা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। এতকাল কাকীকে টাকা দিয়েছি, এখন কিছু কিছু টাকা বুড়ো মা-বাবাকে দিচ্ছি। নিজের পেটই চলে না। তার ওপর! উরে বাসরে। এরপর তোদের পেট তো, একবার বাচ্চা আসতে আরম্ভ করলে আর থামবি না। অন্য পাত্র দেখ বামনী। আমার দ্বারা ওসব হবে না।

বামনী রাগ করল না। মনে মনে হাসল। পুরুষদের কতটা মুরোদ তা ওর ভাল ভাবেই জানা আছে। ফুটপাতের জমিদারদের তো আর ঘরের ঠিকানা কোন দিনই হবে না। ঘর না পেয়েও ওরা ঘরণী হতে চায়, নিজের আশ্রয় না থাকলেও ওরা সন্তান পেতে চায় সবার আগে। সে কামনা তাদের পূরণ করার সঙ্গী ওদের না থাকলেও সংগ্রহ হয়। তবে সবাই চায় সন্তানদের পরিচয় দেবার মত পরিবেশ। তাই বিয়ে করার আগ্রহই বেশি। এ বিয়ের স্থায়িত্ব নিয়ে কেউ ভাবনা চিন্তা করে না।

ও পাশের চপলা তার স্বামী হরিহরকে নিয়ে সুন্দর ঘর করছে। চপলা বাবুদের বাড়িতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে মাসে একশ টাকা তো পায়। জল খাবার পায় আর হরিহর সারাদিন ঝুড়ি বোঝাই কাঠ দরজায় দরজায় বিক্রি করে। তাতে তার দিনের আয় মন্দ হয় না। দশ বারো টাকা তো হয়। চপলার দুটো ছেলে আর শাশুড়ি নিয়ে সংসার। স্বচ্ছন্দে তাদের সংসার চলছে। হরিহর কাঠ কল থেকে কাঠের টুকরো কিনে আনে, ঠিকে কাজ শেষ করে চপলা রাতের বেলায় সেগুলো টুকরো করে ঝুড়ি সাজিয়ে রাখে। সকালবেলায় পান্তা খেয়ে হরিহর বের হয়। দুপুরবেলায় কাঠ বিক্রি করে নতুন করে কাঠকল থেকে আবার কাঠ কিনে ফিরে আসে ঝুপড়িতে, চপলা সন্ধ্যাবেলায় বসে রান্না করতে। তার সংসারে একটা মাটির কলসী আর

এ্যালুমিনিয়মের একটা হাঁড়ি আর গোটা দুয়েক থালা বাদ দিলে রয়েছে কয়েকটি টিনের ছোট বড় কৌটা। সারাদিন রাতে একবারই রান্না করে সন্ধ্যাবেলায়। রাতের খাওয়ার পর যা ভাত বাঁচে তা পান্তা করে রাখে সকালের জন্য।

ওরা কি এর বেশি কিছু চায় না ? চায় কিন্তু পায় না।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটা মাথা গোঁজার মত স্থান।

ওদের যা উপার্জন তা দিয়ে কোন শহরে মাথা গোঁজার জায়গা পাওয়া যায় না।

এখনও তারকের সঙ্গে তার গ্রামের কিছুটা সম্বন্ধ থেকে গেছে। বিপিনের কয়েক বিঘা জমি তার বাবা কাকারা ভোগ করছে, আর বিপিন পথে হাত পেতে ভিক্ষে করছে। তারক সহ্য করতে পারে না। কিন্তু করার কিছু নেই। যা উপায় করে তা দিয়ে তার পেট চলে, বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে কিছু কিছু পাঠায়। একটা ট্রানজিসটার কিনেছে। রাতে ও অবসর সময়ে গান শোনে, নাটক শোনে। তখন তারককে ঘিরে বেশ আড্ডা বসে। তারকের পাশেই দু'তিনটে মেয়ে কুড়িয়ে আনা ছেঁড়া লুডোর ছক নিয়ে বসে। গুটি নেই তাই মোটা কাগজ কেটে গুটি করে নিয়েছে, দান দেবার ঘুটি বাবুদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছে। এদের খেলা চলে রাস্তার লাইট পোস্টের তলায়। বেশ শান্ত শিষ্ট পরিবেশ থাকে তবে মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দেয়। কারও স্বামী মাঝরাতে চোলাই খেয়ে এসে হৈ-হল্লা করে, মারপিটও হয়। মাঝে মাঝে পুলিশ এসে এদের টানতে টানতে নিয়ে যায় থানায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসে পকেট খালি করে, শুয়ে পড়ে নিজের নিজের আস্তানায়।

পুলিশের সেপাইরা জানে, ফুটপাতের এই লোকগুলো পুলিশের কামধেনু। এদের কোন একটা অজুহাতে থানায় নিতে পাড়লেই এদের সারাদিনের মেহনতী টাকা জোর করে আদায় করবে, তাই পুলিশী হল্লা প্রায় মাসেই দু-তিনবার হয় এক একটা রাস্তার ফুটপাতে। এমন সহজে বিনা ব্যয়ে খাজনা আদায় করে পুলিশ, যার জন্য মাল গুজারি দিতে হয় না। এ বাদেও পাড়ার মস্তানরা আছে, তাদের ট্যাকস দিতে হয় কখনও মাসোহারা, কখনও চাঁদা, কখনও চোলাইয়ের পয়সা, কখনও কখনও দৈহিক সুখের খোরাক জোটাতে হয়।

এই জীবন এরা কি ভালবাসে। ভাল কেউ বাসে না। কিন্তু নিরুপায়। শহরের বস্তির চেয়ে খোলা আকাশের তলায় এরা ভাল থাকে, আলো বাতাসের অভাব হয় না, রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম। কঠিন যক্ষ্মা বা পেটের রোগ হয় কিন্তু তাদের তুলনায় বস্তির মানুষরা বেশি রোগে ভোগে।

জিজ্ঞেস করলে বলে, আমরা ছিলাম চাষা। জমি না থাকলেও চাষের মাঠে গতর খাটিয়ে আমাদের বাপ ঠাকুর্দা বেঁচেছে কিন্তু আজকাল আর চাষের কাজ জোটে না। জোতদারেরা জমি বেহাত হবার ভয়ে জমি নিজেদের ব্যবস্থা-

মত চাষ করে। চাষীর কোন উন্নতি হয়নি বাবু। আমরা হরসালে তিন মাসের খোরাকও পাইনা। চাষে পেট ভরলে এই শহরের নোংরা নর্দমার পাশে কি পড়ে থাকতাম।

ময়না প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল মৌলালিতে।

গ্রামেই তার বিয়ে হয়েছিল বিপদতারণের সঙ্গে।

বন্যায় গ্রাম গেল ভেসে। বিপদতারণের মাটির একখানা ঘর ছিল তাও ভেঙ্গে পড়ল। ময়নার হাত ধরে ছয় মাইল পথ জল কাদা ভেঙ্গে এসেছিল মগরাহাট স্টেশনে।

সম্বল তাদের কিছুই নেই। ময়নার সম্বল বিপদতারণ। আবার বিপদ-তারণের সম্বল ময়না। রেলস্টেশনের ছাউনির তলায় রাত কাটলেও, পেটে এক দানাও পড়েনি তাদের। ময়না বারবার তাগাদা দিতে থাকে কিছু খাবার সংগ্রহ করতে।

খাবার আগে, খাবার কেনার পয়সা নেই। ছিনিয়ে খাওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় তো নেই। বিপদতারণের সাহস নেই ছিনিয়ে নেবার। ময়না তাগাদা দিলেও নিরুপায়ের মত বিপদতারণ চুপ করেই বসে থাকে।

স্টেশনের মিটিমিটি আলোতে ময়না দেখতে পেল তাদেরই গ্রামের রতন কেরেস্তানকে।

ময়না ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল তার কাছে। হাঁ ঠিকই চিনেছে। বলল, রতন না ?

রতন মুখ তুলে তাকাল। তারও অসহায় অবস্থা। তার গায়ে গা দিয়ে শুয়েছিল তার বউ ডালিয়া। ময়নার গলার শব্দ চিনতে পেরে ডালিয়া বলল, ময়না, না ? ঠিক। তোর সোয়ামী কোথায় ?

ওই তো ঘাড় গুঁজে বসে আছে।

কিছু আনতে পেরেছিস ?

নারে, কাল থেকে শুকিয়ে আছি।

চাট্টি মুড়ি খাবি। শুকনো মুড়ি আছে, তবে মিইয়ে গেছে।

ময়না যেন হাতে স্বর্গ পেল।

দে, কিছু মুখে না দিলে তো বাঁচব না। ওই পোড়ারমুখোকে বললাম, শুনেও শোনে না। আমার সব কিছু ভেসে গেছে রে। ভাবলাম কলকাতা যাই। কষ্ট করলে কলকাতায় কিছু খেতে পাব। তারণের কাপড় ছাড়া আর কিছু আনতে পারিনি।

আমাদেরও একই অবস্থা হাতের কাছে এক সেরটেক মুড়ি ছিল তাই নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। তাও তো একটা দিন কিছু গালে দিতে পারব। তাও কি ভাল আছে।

নে কোঁচড় পাত। খেতে খেতে নিজের জায়গায় ফিরে যা।

ময়না বোধহয় মনে মনে হেসেছিল। নিজের জায়গা! কোথায় যে হারিয়ে গেছে তা সে ভাল করে মনে করতেই পারছে না। মাটির দেওয়ালটা গলে গলে ধ্বসে পড়ল চোখের সামনে। তখনও খড়ের ছাউনিটার কাঠামোটার কিছু অংশ ছিল, বিপদতারণ ময়নার হাত ধরে টেনে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মাঠেতে নিয়ে এসে বলল, এখুনি মাথার ওপর ওটা ভেঙ্গে পড়ত। ওই দেখ ভেঙ্গে পড়ল।

ময়না কেঁদে উঠল।

কাঁদছিস কেন ময়না ?

সবই যে গেল। কাঁথা কাপড়, থালা বাটি সবই যে ভেসে গেল। তারপর ?

তারপর আর নেই। চল পালিয়ে চল। ক মাইল হেঁটে পার হতে পারলেই রেলের বাঁধ। সেখানে গিয়ে উঠতে পারলে জীবনটা তো বাঁচবে।

ময়না বলল, জীবনটাও বাঁচবে না রে। খালি পেটটা তো ভর্তি করতে হবে। কোথায় পাব।

সে ভাবনা পরে। ছুটে চল প্রাণটা আগে বাঁচাই তারপর অন্য কথা।

দৌড়তে থাকে দুজনেই। কখনও ময়না আগে বিপদতারণ পেছন। আবার কখনও বিপদতারণ আগে, ময়না পেছনে। কখনও খোলা মাঠ দিয়ে জল কাদা ভেঙ্গে, কখনও নোনা জলের বাঁধের ওপর দিয়ে। আকাশ ভেঙ্গে জল নেমেছে। একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। পথও ভুল হতে পারে। অন্ধকারে আন্দাজে চলতে হচ্ছে।

অনেকটা দূর দিয়ে আরেকটা দল টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে যাচ্ছিল। ওই মৃদু আলোকে লক্ষ্য স্থির করে ময়না আর বিপদতারণ ছুটছিল। রাত কতটা জানা নেই। অবশেষে তাদের নিশ্চিন্ত করল গ্রামের দু-একটা ঘরের আলো। এখানেও মানুষ পাহারা দিচ্ছে। পাহারা দিচ্ছে জলকে, জলের গতিকে, জলের গভীরতাকে। জানালায় বসে দেখছে বৃষ্টির তান্ডবকে, পাশে জ্বলছে কেরাসিনের কুপি। ওদের কেউ কেউ তারই আলো দেখে আশ্বস্ত হল দুজন।

মগরহাট স্টেশনে এর আগেও এসেছে তারা। দিনের বেলায় খোলা আলো বাতাসে। কিন্তু আজ! বাতাস ? আছে। দমকা। ঘরের চাল উড়িয়ে নেবার বাতাস। বাতাসের গোঙানি মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে, বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

সামনেই রেলের উঁচু বাঁধ।

বাঁধের ওপর উঠে নিশ্চিন্ত হল। পায়ের তলায় পাথর ফুটছে, বিদ্যুতের ঝলকানিতে লোহার রেলপথ মাঝে মাঝে চিক্ চিক্ করছে। অনেকটা দূরে সিগন্যালের আলোটা মনে হচ্ছিল কোন দৈত্যের অগ্নিবর্ষী চোখ। সেটাই নিশানা।

রেল স্টেশনের মুসাফিরখানায় আশ্রয় নেবার পর পেটের জ্বালায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত। কেরেস্তানদের ডালিয়া যখন শুকনো মুড়ি দেবার কথা বলল, তখন ময়না যেন হাতে চাঁদ পেল। আঁচল বিছিয়ে মুড়ি কটা নিয়ে নিজের জায়গাতে ফিরে এসে বিপদতারণকে ডেকে তুলল।

মুড়ি পেয়েছি। এক গাল খেয়ে পেট ভর্তি জল খেয়ে নে।

তুই খাবি না ময়না।

আমিও দু এক গাল খাব। তুই আগে খা।

না। দুজনে এক সঙ্গে খাব।

আঁচল বিছিয়ে মুড়ি খেতে থাকে দুজনেই। মুড়ি কটা তাদের কাছে অমৃত মনে হল। তারপর টিউবওয়েলে গিয়ে ভরপেট জল খেয়ে মুশাফির খানার শেষ কোণায় দুজন শুয়ে পড়ল। ভিজে কাপড় জামা গায়েই শুকোতে থাকে, ঘুম আসে না কারও চোখে।

শেষরাতে কলকাতা যাবার প্রথম গাড়িটা আসতেই সবাই হুরমুর করে উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়িতে উঠে ময়না বলল, কোথায় যাবি ঠিক করেছিস?

কলকাতা। শহরে। শহরে গেলে কিছু খেতে পাব।

ময়না কোন কথা বলল না।

পাশেই ভেন্ডারের গাড়ি।

প্রত্যেক স্টেশনে মাল উঠানো হচ্ছে। গ্রাম বাংলার মানুষ তাদের মেহনতের ফসল সামান্য মূল্যে তুলে দিয়েছে দালালদের হাতে, সেই মাল হাত ঘুরে পেঁছিবে কলকাতায় এক টাকার মাল তিন টাকা হবে। চাষী মেহনত করে পায় এক টাকা। দালালরা পায় দু'টাকা বিনা মেহনতে। চিরকাল এই অবিচার ও শোষণ চলে আসছে। কেউ কখনও প্রতিবাদও করে না। বঞ্চিত মানুষেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের দয়া পেতে চায় দুর্ভাগ্যকে ভাগ্য তথা ঈশ্বরের দান বলে মেনে নিয়ে।

আজও এর ব্যতিক্রমে হচ্ছে না, হয়নি, হবেও না।

কলকাতায় গিয়ে থাকব কোথায়?

জানতে চেয়েছিল ময়না। বিপদতারণ বলেছিল, থাকার চেয়ে খাবার চিন্তাই বড় চিন্তা।

তুই মেহনত করবি, খাওয়াবি, আমি মেহনত করব তোকেও খাওয়াব।

বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে শেয়ালদ স্টেশনে নেমে আশ্রয় ও রোজগারের কথা ভাববার সময় ছিল না। তখন ভগবানের নাম করে স্টেশনের ছাদের তলায় মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

তুই এখানে শক্ত হয়ে বোস্ আমি দেখি কিছু রোজগার করতে পারি কিনা?

ময়না চুপ করে বসে রইল।

বিপদতারণ বেরিয়ে পড়ল! যাবার সময় আবার বলল, কোথাও যাস্‌নে যেন। রাস্তাঘাট চিনিস না। জল থৈ-থৈ করছে, একবার রাস্তা ভুল হলে আর তোকে খুঁজে পাব না। কোথাও যাস নি।

দুপুর থেকে বৃষ্টিতে ছ্যাঁক ধরেছে।

বিপদতারণ তখনও ফেরেনি।

ময়না পেটের জ্বালায় নেতিয়ে পড়েছে। থানার সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যা প্রায় পেরিয়ে গেছে এমন সময় বিপদতারণ এসে ধাক্‌কা দিয়ে বলল, ওঠ ময়না।

ময়নার চোখের চাহনি তখন ভাসা ভাসা। কাল রাতের কয়েক মুঠো মুড়ি হজম হয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি তখন পাক খাচ্ছে পেটের মধ্যে। কয়েকবার কলের জল খেয়ে তেষ্টা মেটালেও পেটে কোন দানা পড়েনি। ভাসা ভাসা চোখে বিপদতারণের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু হল রে?

একখানা বড় পাঁউরুটি বার করে বলল, খা।

তুই খেয়েছিস?

না। দুজনেই খাব।

কোথায় পেলি রুটি?

তা তোর জানতে হবে না। খা। বলেই বিপদতারণ নিজেই রুটি ছিঁড়ে খেতে থাকে। ময়নাও খেতে খেতে খক্‌-খক্‌ করে কেশে উঠল। তার বিষম লেগেছিল।

বিপদতারণ বলল, যা কল থেকে জল খেয়ে আয়। গলা শুকিয়ে আছে। শুকনো রুটি খেতে পারবিনে।

ময়না জল খেয়ে এসে বসল।

দুজনের খাওয়া শেষ হতেই বিপদতারণ কোঁচার ভেতর থেকে একটা পাকা সিঙ্গাপুরি কলা বের করে তার আধখানা ভেঙ্গে ময়নাকে দিল।

পয়সা পেলি কোথায়?

মাথায় করে মাল বয়ে। এখানে একটা বড় বাজার আছে, সব্জীবাজার। লরী থেকে মাল নাবিয়ে দোকানে পেঁছে দিয়ে মজুরী পেয়েছি। দুবারে পাঁচ টাকা। এই নে, দু'টাকা রেখে দে। আরেক খেপ দিলে আরও কিছু হত। না-খাওয়া দেহ। আর পারলাম না। তুই না খেয়ে আছিস, তাই কিছু কিনে নিয়ে চলে এলাম। জানিস ময়না, এই জায়গায় কোথাও থাকতে হবে, এখানে মাল বহার কাজ পাওয়া যাবে। হিন্দুস্তানীরা এই করেই এক একজন দশ বার টাকা কামাই করছে। আমিও পারব। এবার বৃষ্টি ছেড়েছে, চল জায়গা খুঁজে নি। একজন বললে, একটু এগিয়ে মৌলালি। ওখানে পীরের মাজারের সামনে অনেক জায়গা আছে। যাবি! দেখি না, কোথাও যদি

জায়গা পাওয়া যায়।

ময়না আর বিপদতারণ মৌলালিতেই ছিল কিছু দিন।

কিন্তু থাকতে পারল না বদমাইশদের উৎপাতে। প্রায় রাতেই ময়নার হাত ধরে টানাটানি করত কতকগুলো গুণ্ডাবদমাইশ। ময়না চিৎকার করে উঠলে বিপদতারণ জেগে উঠত, পাশে যারা আস্তানা করে শুয়ে থাকত, তারাও জেগে উঠত। গুণ্ডারা শাসিয়ে যেত।

ময়না বলল, অন্য কোথাও চ রে তারণ। এখানে ইজ্জত থাকবে না।

বিপদতারণ খবর নিয়ে জানল, ওরা পেছনের পাড়ার নাম করা মস্তান। পুলিশও ওদের ভয় করে। পয়সা পায়। কিছুই বলে না।

কাসিম সরদার তার নিকট প্রতিবেশী। বিপদতারণের মুখে সব শুনে বলল, তোরা অন্য কোথাও যা। ওই বদমাশরা আতরি বিবিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। উই যে মাঠ, উই মাঠের কোথায় আতরির স্বামী হুরুমকে ছুরি দেখিয়ে আটকে রেখে আতরির সর্বনাশ করেছিল তিন চারজন। আতরি সকাল বেলায় হাসপাতালে গেল। সেখানেই সে মরল।

বিপদতারণ বলল, ওরা পুলিশের কাছে যায় নি।

পুলিশ! কাসিম সরদার হেসে বলল, পুলিশ! আরে পুলিশ নেইরে। পুলিশ পয়সা পায়। ওদের এজাহারও নেয় না। থানায় গেলে তাড়িয়ে দেয়। বলে, কাঙ্গালরা যা বলে তা শুনলে পুলিশের খাতায় এজাহার লেখার নাকি জায়গা থাকবে না। ওই মস্তানরা চুরি ছিনতাই, বদকাম করে আর পুলিশ এসে কাঙ্গালদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের ন্যাংটো করে সব টাকা পয়সা নিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। চোর বাটপারের শাস্তি হয় না ভাই। তোরা গেরস্ত, ভাল মানুষ পালিয়ে যা।

ময়নার হাত ধরে বিপদতারণ এল বউবাজারে।

এখানেই তার পরিচয় রাজকুমারের সঙ্গে। রাজকুমারও তখন ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে বিপদতারণের মত নিঃস্ব নয়। তখনই রাজকুমার চিন্তা করেছে স্থায়ী কোন উপার্জনের পথ খুঁজে বের করতে।

এখানেও বিপদতারণ বেশি দিন থাকেনি।

খবর করে কালীঘাটের একটা গাছতলায় চায়ের দোকান করেছে।

কাছেই কেওড়াতলা শ্মশান।

শ্মশানযাত্রীদের শ্মশানবন্ধুরা আসে চায়ের নেশা মেটাতে। তাদের আরও যে নেশা আছে সেটাও জানতে পেরে বিপদতারণ ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। দোকানের পাশেই ময়না বসত একটা চাটাইয়ের পেছনে। গাঁজার পুরিয়া বেঁধে রাখত। খদ্দেররা হল মানিক। মানিক সব সময়ই মানিককে চেনে। এতে দু'পয়সা হত ময়নারও। কিন্তু এইসব বন্ধুদের অনেকের শুকনো নেশায় মন উঠত না। বিপদতারণ সকালবেলায় ময়নাকে পাঠাতো বালিগঞ্জ স্টেশনে।

ক্যানিং-এর গাড়ি এলেই কলসী ভর্তি তাড়ি কাঁকালে করে নিয়ে আসত। এবার পসার জমল, পয়সাও বাড়তে থাকে। বিপদতারণ সব সময়ই চিন্তিত, কখন যে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তার কি কিছু ঠিকানা আছে।

সত্যি সত্যি একদিন ময়নাকে রাতের বেলায় গাঁজার পুড়িয়া সমেত ধরে নিয়ে গেল পুলিশ।

শেষরাতে ময়না ফিরে এল।

তখন তার মুখের দিকে তাকাবার সাহস ছিল না বিপদতারণের।

ময়না এসেই বলল, এবায় গাঁয়ে চ। সেখানে ঘর না থাকলেও মাটি তো এক কাঠা আছে। আবার ঘর তুলে বাস করব, তুই আমি মেহনত করব। এখানে পয়সা আছে, ইজ্জত নাই রে। যারা ইজ্জত রক্ষা করবে তারাই সুযোগ পেলে ইজ্জত লুটে নেয়।

বিপদতারণ কিছু বলল না।

দোকান উঠিয়ে টালিগঞ্জের বস্তি এলাকায় আবার চায়ের দোকান করল। রেললাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধে সংসার পেতে বসল।

ময়না ঘরে থাকে। বিপদতারণ গলির মুখে দোকান করে। তার উপার্জন তেমন হয় না। কোনরকমে দিন চলে।

ভয় করিস না। আমি কাজ পেয়েছি। ওই যে লালবাড়িটা। ওখানে তিন ঘরের বাসন মাজা, ঘর মোছা আর কাপড় কাচার কাজ। তা একশ' টাকা তো হবে। আমাদের ছেলেপুলে নেই, এতেই চলে যাবে।

বিপদতারণ সম্মতি জানাল।

কয়েক মাস পরেই জানা গেল, ময়নার ছেলে হবে।

বিপদতারণ ভেবেই পেল না কি করে এটা সম্ভব হল। গত এগার বছরে যার ছেলে হল না, হঠাৎ তার ছেলে কেমন করে হতে পারে।

হাসপাতালে নিয়ে গেল ময়নাকে। চুপি চুপি জেনে নিল এরকম হয় কিনা। ডাক্তার বলল, হয়। অনেক অনেক লোকের এরকম হয়। দুজনের দেহের পুষ্টি না থাকলেও, হঠাৎ দেহের পরিবর্তন ঘটে। যার কমতি থাকে তার পুষ্টি আসে সবার অজান্তে। এটা নতুন কিছু নয়।

বিপদতারণ আশ্বস্ত হতে পারল না। তার বিশ্বাস এই সন্তান সৃষ্টি করেছে থানার পুলিশরা। কিন্তু এই সন্দেহটা মুখে বলতে কখনও সাহস পায়নি।

যথাকালে ময়নার একটা মেয়ে হল।

মা হয়েছে এই আনন্দ ময়নাকে আচ্ছন্ন করলেও বিপদতারণ তাতে খুশী নয়। একটা ছেলে হলে তার বংশ রক্ষা হবে এটাই ছিল তার বিশ্বাস।

পাশের ঝুপড়ির বিশ্বাসরা এসেছিল যশোর থেকে। সেই যেবার হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের লড়াই হয়েছিল। সেই সময় অতুলের বাবা আর মা অতুলের হাত

ধরে হিন্দুস্থানে পালিয়ে এসেছিল। অতুলের বাবা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেনি। শেষ জীবনে রেল লাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধে বাস করতে থাকে কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ, শেষ রাতে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির তলা দিয়ে পায়খানা করার সময় হঠাৎ গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। তাতেই কাটা পড়ে অতুলের বাবা মারা যায়।

এরপর অতুলের মা কালীঘাটে মন্দিরের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসল। ভিক্ষাতে পেট ভরত কোন রকমে। অতুল থাকত রেল লাইনের ধারে। সারা-দিন খেলা করত। রাতের বেলায় মা এসে রান্না করত, কোন কোন দিন খাবার কিনে আনত।

অতুলের যখন বার বছর তখন রেল লাইন তাকে উপার্জন করার পথ খুলে দিল।

উল্টো দিকে উপেন থাকত। তার চেয়ে দশ বার বছরের বড়। কোথায় তার বাড়ি ছিল, কে তার বাবা এসব উপেনের জানা নেই। সে ক্ষুধার্ত হাঙরের মত ছুটে বেড়াতে বেড়াতে সঙ্গী পেল ঝণ্টুলাল, পিটার আর কেরামত আলি।

পারবি ?

উপেন বলল, পারব।

মালগাড়ির চলতি ওয়াগনে উঠে মাল পাচার করা কঠিন কাজ। তাই করবে উপেন। প্রথমে উপেন ছিল শিক্ষানবীশ, বছর না পেরোতেই সে হয়ে গেল নতুন দলের সরদার। অতুলকে বলেছিল, তুই শুধু কয়লা কুড়োবি। আমার লোকেরা লাইনের ধারে কয়লা ফেলবে, তুই কুড়িয়ে এক জায়গায় করবি। যত মন কুড়োবি তত টাকা।

দু'বছর না ঘুরতেই অতুল বেশ পক্কতা লাভ করেছিল। দেখতে দেখতে উপেনের সে ডান হাত হয়ে উঠেছিল। অতুলের মা আগে রোজই আসত। কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে সে আর আসছে না। প্রথম প্রথম অতুলের অসুবিধা হত। খাবারের ব্যবস্থাটা করত তার মা। আজকাল মা অনিয়মিত আসা যাওয়া করাতে তার রাতের খাবার আর জুটত না। উপেন বলল, এখন ওপাশের রাম সিং-এর হোটেলে রাতের বেলায় নগদ পয়সায় খাবি। যদি তোর আশে পাশের কেউ খেতে দেয় তাদের নগদ পয়সা দিস।

অতুল কিছুদিনের মধ্যে তার মায়ের কথা ভুলেই গেল।

বিপদতারণের মেয়ে সানুর সঙ্গে তার খুব ভাব। ন'বছরের সানুকে বলল তোর মাকে আমি টাকা দেব, আমাকে রাতের বেলায় দুটি খেতে দিতে বলবি।

সানু ময়নাকে বলতেই প্রথমে রাজি হয়নি। সানু বার বার চাপাচাপি করতেই রাজি হল। অতুলের রাতের খাবারের সমস্যা মিটে গেল।

ময়নাই একদিন কালীঘাটে গিয়েছিল।

সেখানে একটা মাঝবয়সী বুড়ো ভিখিরির পাশে বসে অতুলের মা ভিক্ষে

করছিল তাকে দেখেই চিনতে পারল।

তুই ঘরে যাস না কেনরে পিসি ?

এখানেই আছি। এই লোকটা চোখে দেখে না, খুব ভাল লোক। এর সঙ্গে বসে মায়ের নাম করি আর এর সেবা করি। ভালই আছি। অতুল তো বড় হয়েছে এখন খুঁটে খেতেও শিখেছে। ওখানে গিয়ে আর কি হবে !

ময়না বুঝল অতুলের মা নতুন সংসার পেয়েছে। বয়স তো তার খুব বেশি নয়। এখনও ঘর বাঁধতে পারে।

জিজ্ঞেস করেছিল, বাবাজিকে বিয়ে করেছিস ?

বিয়ে ! মায়ের ঠাইয়ে যে যার সঙ্গে বাস করে সেই হল বউ অথবা বর। এখানে একসাথে বাস করাই বিয়ে। কালী মায়ের পায়ের তলায় সবই শুদ্ধ। বুঝলি।

ময়না সবই বুঝল।

ফিরে এসে বিপদতারণকে বলেছিল। বিপদতারণ কোন উত্তর দেয় নি।

আরও চারটে বছর কেটে গেছে। সানু বেশ ডাগর হয়েছে।

ময়নার দেহটাও আজকাল ভাল যায় না। অতুল খেতে এলে সানুই তার পরিচর্যা করে।

তারপর একদিন সকালবেলায় সানু বেরিয়ে গিয়েছিল অতুলের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় নতুন শাড়ি ব্লাউজ গায়ে পড়িয়ে হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর দিয়ে ফিরে এল সানু অতুলের হাত ধরে।

বিয়ে করে এলাম মামী ! বলল অতুল।

ময়নার মুখ থেকে আর কথা বের হল না।

অতুল আর সানু প্রণাম করল ময়নাকে। তারপরই অতুল সানুর হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের ঝুপড়ির মধ্যে। আরম্ভ হল ওদের নতুন জীবন।

বিপদতারণ সব শুনে চুপ করেই ছিল।

রাতের বেলায় ময়নাকে বলল, সবই ভাল। ছেলেটা ভাল নয়। কয়লা পট্টির লোক। ওয়াগন থেকে কয়লা চুরি করে উপেন, অতুল তার সাকরেদ। ধরা একদিন পড়বেই। তোর হালটা তো মনে আছে। তাই ভয় পাচ্ছিরে ময়না। সানু তো তার বাবার নাম জানে, অতুল তাও জানে না।

ময়না কোন কথা বলল না। যেদিন তারা ঘর ছাড়া হয়ে কলকাতায় আসার পর ঘরে ফিরতে পারেনি সেদিন থেকেই সে মেনে নিয়েছে তার ভাগ্যকে তার মত হাজার হাজার মানুষকে দেখছে শহরের ফুটপাতে কিলবিল করতে। কেউ বাঙ্গালী, কেউ ওড়িয়া, কেউ খোট্টা, কেউ মাদ্রাজী। এদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ কৃশ্চান। এসব কিছু ওরা হারিয়ে ফেলেছে কলকাতার ফুটপাতে এসে। ভাষা জাতি, ধর্ম সব গিয়ে একটি জায়গায় থিতু হয়েছে, সেই জায়গাটা হল তাদের পেট। ক্ষুধার তাড়নায় এরা হারিয়েছে সমাজ, সংসার,

গ্রামীণ সরলতা আর পবিত্রতা।

সানু বিয়ে করেছে, নতুনত্ব কিছু নেই। তবে তাদের বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্ব নিয়েই ভাবনা আর ভয় হচ্ছে, সদাচারবিহীন জীবনের কাছ থেকে অতি অসদাচারী সুদে আসলে পাওনা বুঝে নেয়। অতুলের জীবিকা সেই সুযোগ আনতে পারে।

ময়না শুনেছে অতুল কয়লা পার্টির লোক।

ঝণ্টুলালরা আজকাল ওয়াগান ভাঙ্গে না। ছিনতাই করে। শেয়ালদা থেকে ক্যানিং, কখনও ডায়মণ্ডহারবার, কখনও লক্ষ্মীকান্তপুর, কখনও বজবজ লাইনে সুযোগ পেলেই ছিনতাই করে। সমাজবিরোধিদের সমাজে কয়লা চুরির চেয়ে ছিনতাই করা হল অনেক সম্মানের কাজ। মাঝে মাঝেই উপেনের দলের সঙ্গে কেরামত আলির দলের বিবাদ দেখা দেয়। বিপদটা ঘনীভূত হল কেরামতের বিধবা বোন সালেহাকে নিয়ে। পিটার আশা করেছিল সালেহার করুণা লাভ করবে কিন্তু হঠাৎ চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। সালেহা উপেনের কণ্ঠলগ্ন হল। এবার কয়লা পার্টি আর ছিনতাই পার্টির লড়াইটা ধীরে ধীরে জমে উঠল। এতদিন পুলিশকে হাতে রেখে কাজ করা সম্ভব হয়েছে এবার নিজেদের ঝগড়ায় পুলিশ ফায়দা তুলবে, কারও লাভ হবে না।

পিটার ছাড়ার পাত্র নয়।

সালেহার পেছনে অনেক দিন ঘোরাফেরা করেও কোন ফল না হওয়াতে পিটারের মনে জাগল ভয়ংকর প্রতিশোধস্পৃহা। কেরামতের ইচ্ছা ছিল সালেহা তার দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুক। কি করে যে কি হয়ে গেল তা বুঝবার আগেই সালেহা গিয়ে উঠল উপেনের বস্তির ঘরেতে। সালেহা যা আশংকা করেছিল তাই ঘটল একদিন! উপেনকে বার বার সতর্ক করেছিল।

সালেহা কেন যে পিটারকে পছন্দ করত না তাও বলেছিল কেরামতকে।

পিটারের গায়ের রং মোষের মত কালো, মদ খেয়ে চোখ দুটো সব সময় থাকত লাল। জামাকাপড়ে উৎকট গন্ধ তার ওপর বস্তির ও ঝুপড়ির অনেক মেয়ের সর্বনাশও করেছে, কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনও প্রলোভন দেখিয়ে, কখনও অসহায় আশ্রয়প্রার্থী যুবতীদেরও। সালেহার ওপর একহাত নিতে যে চেষ্টা করেনি তা নয়, শুধুমাত্র কেরামতের ভয়ে এগোতে সাহস পায় নি।

উপেনও তার দলবলকে সতর্ক করে রেখেছিল।

ঘটনাটা ঘটল হঠাৎ-ই।

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে মাত্র নেমেছে। লোডশেডিং চলছে। রেললাইনের ওপর থেকে একটা বোমা এসে পড়ল উপেনের পাশের ঝুপড়িতে। ঝুপড়ির টালি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গেল।

উপেনের দল প্রস্তুত। রেল লাইনের এপার থেকে তারাও বোমা ছুঁড়ল।

বোমাবাজির লড়াই চলতে থাকে।

বস্তির মানুষরা সন্ত্রস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। পাশের তিনতলা বাড়ির বাসিন্দারা দরজা জানলা বন্ধ করে দিল। নিকটেই ছিল একজন ডাক্তারের বাড়ি, সেখান থেকে ফোন গেল থানায়। দেখতে দেখতে দু'গাড়ি পুলিশ হাজির। বোমারু দল পুলিশ দেখেই যে যার মত গা ঢাকা দিল।

পুলিশ পিকেট বসল।

সে রাতে আর কোন ঘটনা ঘটল না। কিন্তু ফুটপাতের সব্জী বিক্রেতা নিমাই দাসের টালির চাল ভেঙ্গে পড়াতে যা কিছু ক্ষতি হবার তারই হয়েছিল। তার ছেলেমেয়ে সে সময় বাইরে ছিল নইলে টালির আঘাতে তারাও অক্ষত থাকত না।

লড়াই থেকে ফিরে এসে অতুল বলল, আলো নিভিয়ে দে সানু।

কেন রে? খাবি না? অন্ধকারে খাবি কি করে?

চুপ কর মাগী। দেখছিস না পুলিশ এসে গেছে। আলো দেখলেই ঘরে এসে ঢুকবে। চুপচাপ শুয়ে পড়।

সানু আলো নিভিয়ে বলল, তুই বুঝি লড়াইতে ছিলি?

হুঁ। শালা পিটার তার দলবল নিয়ে উপেনদাকে মারতে এসেছিল। শালারা পালিয়েছে। আর এ মুখো হবে না। ওরা পাঁচটা পেটো মেরেছে, আমরা মেরেছি পনেরটা। কেমন আওয়াজ হল শুনেছিস তো। কারও গায়ে লাগলে আর রক্ষা ছিল না। শালারা অনেক পয়সা কামাই করে, রেলের ওয়াগান ভেঙ্গে মাল চুরি করে। রেলের যাত্রীদের ছিনতাই করে।

তোরাও তো কয়লা চুরি করিস।

না করলে খাব কি? ওদের পয়সা বেশি। সবাই জানে ঝণ্টুলালরা ছিনতাই করে। পুলিশ পয়সা পায় তাই ধরে না। সুযোগ পেলেই আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা তো বেশি পয়সা দিতে পারি না।

সানু চুপ করে শুয়ে রইল। তার চোখে ঘুম নেই। অতুল কিন্তু অঘোরে ঘুমোতে থাকে। সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা তার মনে কোন আঁচড়ও কাটতে পারে নি।

শেষ রাতে পুলিশ তল্লাসী নিতে আরম্ভ করলেও অতুলের ঝুপড়িতে এল না।

ময়না বুঝেছিল এখানেও নিরাপদে বাস করতে পারবে না। বিপদতারণকে বার বার বলতে থাকে জায়গা বদল করতে।

কবার হল? জিজ্ঞেস করল বিপদতারণ।

গোনা হয়নি। মগরাহাটের স্টেশন, মৌলালি, বউবাজার, কালীঘাট, তারপর এই টালিগঞ্জে।

এবার কোথায় যাবি। মেয়েটাকে কি ছেড়ে যাবি?

মেয়ে তো অনেক আগেই পর হয়ে গেছে। আমাদের না আছে জ্ঞাতগোষ্ঠী কুটুম্ব, না আছে কোন স্থায়ী ঠিকানা। আমরা এথা থেকে হোথা ঘুরছি পেটের জ্বালায়। মেয়ে পর হলেও আমি তো তোর কাছে পর নই। আমাকে নিয়েই যদি থাকতে হয় তাহলে অন্য কোথাও আস্তানা করলে ভাল হয়।

দোকান ছেড়ে কোথায় যাব বল। পেট তো শুনবে না। কলকাতায় দোকান করার জায়গা কোথায় পাব। বয়সটাও বাড়ছে, একটু থিতু হতে চাই।

থিতু হতে চাইলেই তো হওয়া যায় না। তুই জায়গা দেখ।

একটা কাজ করলে কেমন হয়।

কাজটা যে কি তা বিপদতারণ সেদিন আর বলেনি। ময়নাও জিজ্ঞাসা করেনি।

ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে যারা এসেছে শহরে পেটের দায়ে তাদের কজনই বা গুছিয়ে নিতে পেরেছে তার জীবিকা। আশ্রয়? সেতো আকাশ কুসুম।

সকালবেলায় ফুটপাতের জমিদারদের ঘুম ভাঙ্গে আকাশ ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে। যারা ঠেলা টানে, রিকসা টানে তারা গাড়ি বারান্দার তলায় অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বস্তা কাঁধে নিয়ে বের হয়, তাদের হাতে থাকে একটা লোহার শিক। জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজে বের করে পোড়া কয়লা, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া জুতো, প্ল্যাস্টিকের টুকরো, ভাঙ্গা কাঁচ। বস্তা ভর্তি হলেই এই সব মাল বাছাই করে কেউ কেউ গেরস্ত বাড়িতে কয়লার জোগান দেয়, কেউ কেউ যায় মাঠ পুকুরের বাজারে ওই সব বিক্রি করতে। এদের কারও আয় দশ টাকার কম নয়। এ এক নতুন মানুষের সমাজ যেন গড়ে উঠেছে কলকাতার ফুটপাতে, এদের জীবন ধর্ম পেটের দায়ে শুকিয়ে গেছে, এদের সমাজ ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, সবই শিথিল। নারী যৌবনে পা দিলেই সন্তান কামনা করে। বিচার করে না সন্তানের ভবিষ্যত, পুরুষ নারী খোঁজে সংসার পাতার চেয়ে ভোগের অংকটা বুঝে নিতে। এরা ভুলে গেছে নিজের বাসভূমির নাম, অনেকেই মনে করতে পারে না জন্মদাতার নাম। মায়ের পরিচয়টাই বড় পরিচয়। কিছুই নেই, আছে শুধু বাঁচার তাগাদা।

বিপদতারণের মত রাজকুমারও ভেবেছে আরও কোন পথ খুঁজে পেতে। যে উৎসাহ ও আশা নিয়ে ননীবালার হাত ধরে রাজকুমার এসেছিল কলকাতার ফুটপাতে, সে উৎসাহ ও আশা অনেক আগেই ভঙ্গ হয়েছে। রাজকুমার অনেক-বার মনে করেছে ননীবালার হাত ধরে তার গ্রামে ফিরে যাবে। দেড়কাঠা জমির ওপর মাটির বাড়িখানা হয়ত আর নেই, হয়ত বা কেউ বে-দখল করে

নিয়েছে তার পৈতৃক ভিটা। রাজকুমার মনে মনে হাসে নফরচাঁদের ছেলে ফটিকচাঁদই তার আসল পরিচয়। রাজকুমার নামটা তার ব্যঙ্গ। ভেবেছিল ছেলে অমর তাকে বাঁচিয়ে তুলবে, সেটাও সম্ভব হয়নি। অমর আছে, একেবারে হারিয়ে যায়নি, সেও তার বউ বাচ্চা নিয়ে কলকাতার কোন অন্ধকার গলির ফুটপাতে এখনও বাঁচার চেষ্টায় ধুঁকছে। কে জানে এর শেষ কোথায়! নমিতাটাকে বেশ চালাক চতুর মনে করত। সেও ভয়ঙ্কর ভুল করে একেবারে জাহান্নমে নেমে যাবে তা ভাবতেও পারেনি। তবুও সে বিপিনের আশ্রয়ে আছে, এই যা ভরসা।

রাজকুমার বুঝতে পারেনি নমিতার ভুলটা ঠিক ভুল নয়। আরও সুন্দর ভাবে বাঁচার আকাঙ্খা নিয়ে নমিতা চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। পারেনি। শহরের পাপকে সে চিনতে শেখেনি বলেই তার এত পরাভোগ, ভুল নয়, এমন ভুল স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। তবুও নমিতার নেশা কাটেনি। সহজ উপায়ে বেশি আয়ের পথটা যে খুবই পঙ্কিল সে জ্ঞান তার ছিল না।

হাঙ্গামা হল লোতিয়াকে নিয়ে।

এতদিন ভাল কেটেছে। তার মনে জেগেছে নতুন কিছু পাবার নেশা। তবে ঘটনাটা বেশি দূর এগোবার আগেই লোতিয়ার বাবা তার প্রতিবেশিদের পঞ্চায়েত বসিয়ে অলিমিঞাকে ফুটপাত ছাড়া করেছে। একটু রাতে লোতিয়া গিয়েছিল কর্পোরেশনের কলে বাসন ধুতে। কদিন থেকেই অলিমিঞা লোতিয়ার পিছু নিয়েছিল। একদিন লোতিয়াকে ফাঁকা জায়গায় একা পেয়ে তার মনের কথা বলতেই ক্ষেপে উঠল লোতিয়া। চিৎকার করে ডাকল তার বাবাকে। বিপিন নমিতা লোতিয়ার গলার শব্দ চেনে। তারা ঝুপড়ি ছেড়ে বের হতেই অলিমিঞা পালানোর চেষ্টা করছিল, বাছাধন তা আর পারল না। আরও পাঁচজনে তাকে ঘিরে ধরল। তারপর যা হল তা আর বলবার নয়। অলির বাবা-মা ছিল পার্কের ভেতর। গোলমাল শুনে তারাও বেরিয়ে এল। এবার উভয়পক্ষের ঝগড়া। অবশেষে মারামারি। লোতিয়া একটা আধলা ইঁট তুলে মারল অলিকে লক্ষ্য করে, ইঁটটা গিয়ে লাগল অলির মায়ের কপালে। উরে বাপ বলে বসে পড়ল মুন্নাবিবি।

হৈ-হৈ ব্যাপার।

উভয়পক্ষ গেল থানায়।

থানার শান্তিরক্ষকরা হাসল। ব্যঙ্গ করল। কোন পক্ষই কোন বিচার পেল না। মুন্নাবিবি গেল হাসপাতালে।

এখানেই লোতিয়ার কেচ্ছা শেষ হল না। বসল পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত হুকুম দিল অলি তার বাবা মাকে নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

পঞ্চায়েতের বিচার মাথায় নিয়ে অলিরা চলে গেল নিমতলা ঘাটের দিকে।

লোতিয়ার বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও লোতিয়া ঘর বাঁধার নেশায় তখন

বেপরোয়া। ওপাশে একটা নেপালী জড়িবুটি-বিক্রেতার কাছে যেত মাঝে মাঝে। তার কাছে তুকতাকের শেকড়-টেকর পাবার আশা নিয়ে কথা বলত। সকালে কাজের বেলায় একবার দেখা হত। আবার বিকেলে কাজ শেষ করে ফেরার সময় তার সঙ্গে দেখা হত। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দুচারটে কথা বলত। লোতিয়া আর ভীমবাহাদুর কেউই এতে অখুশী হত না।

ভীমবাহাদুর প্রস্তাব দিল, তু সাদি করবি লোতিয়া।

লোতিয়া সোজা প্রস্তাবটা শুনে মুখচোখ লাল করে উঠল।

আর বাত করিস না কেন ?

লোতিয়া সেদিন মুখচোখ লাল করে ফিরে গেল। পরের কয়েকদিন ও রাস্তা দিয়ে আর হাঁটল না। লোতিয়ার মনের কথা কেউ জানল না।

প্রায় সপ্তাহখানেক পরে লোতিয়া দেখল ভীমবাহাদুর তার জায়গাতে আর নেই। অন্যমনস্কভাবে নিজের কাজেই এগিয়ে চলেছিল। পেছন থেকে ভীমবাহাদুরের ডাক শুনে লোতিয়া ফিরে দাঁড়াল। ভীমবাহাদুর এগিয়ে এসে বলল, তুই গোসসা করেছিস লোতিয়া ? হাঁ তাই। আমি একটা কাম পেয়েছি রে লোতিয়া। মুরারীপুকুরে কারখানায় দারোয়ানী। কাল সে কাম মে লাগা। আজ নাইট ডিউটি। কারখানাকা দরজাকা সামনে একটা ঘর ভি মিলছে।

লোতিয়া বলল, বহুত খুব।

তোর জন্যই এসেছি। দেখা হয়ে গেল। গোসসা হোসনি। মাপ কর দে। সমঝা।

লোতিয়ার চোখ ভেঙ্গে জল নামল। অনেক কষ্টে চোখ মুছে বলল, আমার বাপকা পাশ যা। উসকা সাথ বাত কর বাহাদুর।

ভীমবাহাদুর যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল, ঠিক আছে।

লোতিয়ার বাবা খোঁজখবর করে দেখল ভীমবাহাদুর সত্যিই চাকরি পেয়েছে একটা ঢালাইয়ের কারখানায়। লোতিয়ারও বিয়ে করার মত, কিন্তু কি ভাবে বিয়ে হবে। বিপিন বলল, সে সবই কালীঘাট, সেখানেই বিয়ে হবে।

ভীমবাহাদুরের সঙ্গে লোতিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। ফুটপাতের জমিদাররা চাঁদা করে একটা শাড়ি কিনে দিল লোতিয়াকে আর ভীমবাহাদুরকে দিল একটা সার্ট। বিয়ের পরে ভীমবাহাদুর লোতিয়াকে নিয়ে গেল তার বাসস্থানে।

লোতিয়া মাঝে মাঝে ভীমবাহাদুরকে নিয়ে আসত। লোতিয়া বলত, লোকটা খুব ভাল। আমাকে কোন কাজ করতে দেয়না। রান্না বান্না, বাসন মাজা সব করে। এবার মাইনে পেয়ে একটা মশারী আর সতরঞ্চ কিনেছে। থালা বাটিও কিছু কিনেছে। সবাই জানল, লোতিয়া সুখেই আছে। ফুটপাতের জমিদার ঘরের মেয়েরা এত সুখে যে আছে এটাই ছিল সবার মুখে মুখে আলোচনার বিষয়।

কয়েক মাস পরেই লোতিয়ার বাবা সবাইকে জানাল সে মুলুকে যাচ্ছে।

লোতিয়াকে খবর দিয়ে একদিন লোতিয়ার বাবা সবাইকে নিয়ে ফুটপাতের জমিদারীর মায়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাই জানল ওরা মুলুক গেছে, মুলুক যে কোথায় তা কেউ জানে না, এমন কি লোতিয়াও জানে না তার বাবার মুলুকের ঠিকানা।

লোতিয়ার মা-বাবা যেমন হারিয়ে গেল ফুটপাতের জমিদারী থেকে ঠিক ওই ভাবেই হারিয়ে গেল লোতিয়া। একদিন এসে সবাইকে বলে গেল তার স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে তার দেশ নেপালে। এখানে তার ভাল লাগছে না, দেশে ভীমবাহাদুরের মা-বাবা বউ দেখতে চেয়েছে তাই লোতিয়াকে নিয়ে দেশে যেতে চায়। লোতিয়াও রাজি।

বিপিন জিজ্ঞেস করেছিল কবে ফিরবি তোরা।

ভীমবাহাদুর বলল, ঠিক নেই। আমরা তো চাষী। সবাই চাষের সময় হরসাল দেশে যাই। চাষ শেষ হলেই ফিরে আসি। এবারও তাই আসব।

মকাই চাষের সিজিন পেরিয়ে গেছে, মকাই কাটাও শেষ। কিন্তু ভীম-বাহাদুর আর লোতিয়ার কোন খবর কেউ জানতে পারেনি, তারা ফিরেও আসেনি। কারখানায় গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছে সবাই, ভীমবাহাদুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারেনি।

একদিন মরিবালার হাত ধরে নমিতা এসে হাজির। রাজকুমারকে নমিতা বলল, বিপিন কাকা খুবই অসুস্থ, হাসপাতালে আছে।

ননীবালা উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল কি হয়েছে রে মরি।

বুকের ব্যথা। ডাক্তার বলছে, সারতে দেরি হবে। অনেক টাকার ওষুধ দরকার। তারক থাকলে একটা ব্যবস্থা হত। তারক কোথায় জানিস?

আছে এখানেই, সন্ধ্যার পর আসবে। এলে পাঠিয়ে দেব।

না। আমি ওর জন্য বসে থাকব। তুই কটা টাকা দিতে পারিস, কাকী? তা হলে বিকেলে ওষুধটা কিনে দিয়ে আসতে পারি।

ক' টাকা?

কি জানি। দশটা টাকা তো দে। কিছু আমারও আছে।

রাজকুমার শুয়েছিল। ওদের কথা শুনে উঠে বসল। মরিবালাকে কাছে ডেকে বলল, আমি যাব তোর সঙ্গে হাসপাতালে। যা ওষুধ লাগে আমি কিনে দেব।

মরিবালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আর দেরি করিস না।

ননীবালাও চলল তাদের সঙ্গে, নমিতা বসে রইল অমরের ছেলেকে নিয়ে। সারাদিন ঘুরে ফিরে এসেছে, এখনও কিছু খায়নি। নমিতাকে চাল ডাল আর আনাজ দিয়ে ননীবালা বলে গেল, তুই রেঁধে রাখিস, ছেলেটা সারাদিন মুড়ি চিবিয়ে আছে। ভাত হলেই ওকে খেতে দিস।

মেয়ো হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে বিপিন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান। ওষুধপত্র নিয়ে যখন মরিবালা সদলে পেঁছিল তখন ওয়ার্ডে একটা নার্স ভিন্ন কেউ নেই। ওষুধপত্র নার্সের হাতে দিয়ে তিনজনই দাঁড়িয়ে রইল বিপিনের পাশে।

হাসপাতাল তো পাতালেরই নামান্তর। যেখানে বিশজনের স্থান হওয়াই দুষ্কর সেখানে পঞ্চাশজন খাটে-মাটিতে শুয়ে। কি রোগ, কি চিকিৎসা তার বিন্দুবিসর্গ ওরা জানে না, বোঝেও না। রাজকুমার সাহস করে নার্সকে জিজ্ঞেস করল, রুগী কেমন আছে দিদি?

ভাল না। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ডাক্তারবাবু কোথায় আছেন?

রাত আটটায় এলে নিচে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা হবে।

মরিবালা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল। বিপিনের বুকটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। বুঝল বিপিন বেঁচে আছে। একটি খোঁড়া মানুষকে নিয়ে এতটা কাল কাটিয়েছে মরিবালা। কোনদিন কোন অভিযোগ করেনি। যখন বয়স ছিল তখন বিপিনকে ফেলে কোথাও পালায়নি অন্য কারও সঙ্গে। ফষ্টিনষ্টিও করেনি। সব সময় মনে হয়েছে বিপিন বড় অসহায়, একে ফেলে কোথাও গেলে মহাপাপ হবে। অনেক প্রলোভন এসেছে, সব কিছু অগ্রাহ্য করে বিপিনকে নিয়ে জীবনটা সে কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বিপিনের মত শক্ত সমর্থ মাঝি খুব কমই ছিল রায়মঙ্গলের ঘাটে। অথচ মহা শত্রু পীরবাবার পাল্লায় পড়ে আজ বিপিন কত অসহায়।

তবে বিপিনও কম জেদী নয়। মরিবালাও সহজে মাথা নিচু করার মত মেয়ে নয়। তাই গ্রাম ছেড়ে তারা পালায় নি। নেহাত যখন পেটের দায় দেখা দিয়েছিল তখনই তারা শহরে এসেছিল। তাও কত বছর হয়ে গেল। তখন তার একমাত্র তরসা ছিল তারক। আজও সে তারককেই ভরসা করে।

গাঁয়ের লোক বলত, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

বিপিন তো বেঁচেই আছে। আপাতত আছে।

ননীবালা বলল, মরি তুই ভগবানকে ডাক। কালীবাড়িতে ফুল বেল-পাতা দে।

কেন কাকী?

তোর স্বামীর মঙ্গলের জন্য।

মরিবালা হাসল। পরক্ষণেই বলল, ওই পাঁচতলা বাড়িতে কে বাস করে জানিস?

না তো।

বড়লোকরা। ওই বড়লোকরাও তো ভগবানের পয়দা, আর আমরাও তো ভগবানের পয়দা। ভগবান বড়ই এক চোখা। আমাদের কোন ভগবান নেই

রে কাকী। ভগবান ওই বড়লোকদের। ভগবানের রাজ্যে কেউ গরীব কেউ বড়লোক হত কি? ওরা বলে আমরা সবাই ভগবানেরই ছেলেমেয়ে। ওরকম ভগবানের দরকার আমার নেই।

বিপিনকে ভগবানই বাঁচাবে রে মরি।

বাঁচালে ডাক্তারবাবুরাই বাঁচাবে কাকী। ভগবানের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। বিপিন বাঁচলে আমি খুশী হব, মরলেও কাঁদব না। জানো কাকী আমরা নাকি মানুষ। হায় কপাল! আমরা কবে মানুষ হলাম তা জানি না।

তুই এত কথা কোথায় শিখলি রে মরি?

ফুটপাতেই শিখেছি, রোজই তো দেখি হোটেলের এঁটো পাতাগুলো যেখানে ফেলে সেখানে আমার মত দোপায়া জন্তুর সঙ্গে চারপায়া কুকুরগুলো পাতাগুলো নিয়ে টানাটানি করছে। তখন মনে হয় যারা এঁটো পাতাগুলো ফেলে ভগবান তাদেরই ঘরের জিনিস, আর আমরা যারা এঁটো পাতা নিয়ে টানাটানি করি তাদের কোন ভগবান নেই কাকী। চল চল।

মরিবালা থেকে গেল ননীবালার কাছে।

রাতের বেলায় খেতে বসে রাজকুমার বলল, তুই ঠিকই বলেছিস মরি। আমি যখন শহরে এসেছিলাম তখন শহরটা কেমন সুন্দর ছিল, এখন হয়েছে কেমন নোংরা শয়তানের রাজ্য। মাঝে মাঝে ভেবেছি, গাঁয়েই ফিরে যাই কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারিনি রে মরি। শেষ পর্যন্ত এখানেই মাটি নিতে হবে।

তিনদিন পরে বিপিন কথা বলেছিল।

মরিবালার মনের গতিই ফিরে গেল। আনন্দে ননীবালাকে জাপটে ধরে বলল, দেখলে তো কাকী, বলেছিলাম, বাঁচালে ডাক্তারবাবুরাই বাঁচাবে। ভগবানের নাম ভুলে গেছি কাকী। বেঁচে যখন আছি তখন মরতেই হবে। আমরা সবাই মরব। পেটের দায় না থাকলে বাঁচা মরা সমান হত।

বিপিন ইসারায় মরিবালাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত টাকা কোথায় পেলি, রাজুকাকা দিয়েছে?

মরিবালা মাথা নেড়ে বলল, হাঁ।

কত টাকা দিয়েছে, হিসাব রাখিস। শোধ দিতে তো হবে।

তোকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তখন হিসাব করব।

আটদিন পর বিপিন ক্রাচ্ বগলে করে ফিরে গেল তার ঝুপড়িতে।

নমিতা থেকে গেল রাজকুমারের কাছে।

অমর বউ নিয়ে এসেছিল ছেলেকে দেখতে।

ননীবালা ছেলেকে কখনও যেতে দেয়নি অমরের কাছে। অমরের বউ মাঝে মাঝে অনুযোগ করলে ননীবালা খেঁকিয়ে উঠে বলত, যখন নিকে করেছিলি তখন তোর দরদ কোথায় ছিল?

এর উত্তর দিতে পারেনি পচি বিবি।

কিন্তু অমরের বউয়ের কোল খালি যায়নি। পরপর আরও দুটো সন্তান এসেছে তার কোলে। তাদের বুকে নিয়েই অমরের সংসার করছে গাঁজা পার্কের পেছনের ঝুপড়িতে।

তাদের জীবন ধারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সহজ সরল রুটিন বাঁধা জীবনে আশা আকাঙ্খা এমন কিছু না থাকলেও ক্ষুধার তাড়না আর যৌন আকর্ষণ তাদের সব চিন্তার বাইরে নিয়ে গেছে।

ফুটপাতের জমিদারীতে নতুন প্রজা এসে আস্তানা গেড়েছে পার্কসার্কাসের ফুটপাত। রোশনি বিবি তালাকি নয়, বিধবা।

সঙ্গে তার ছেলে এরফান। জোয়ান মরদ, বয়স আঠার উনিশ হবে। আরও দুটো ছেলে দুটো মেয়ে। ছয়জনের সংসার।

এরফান রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে। আগে মজুরী ছিল বার টাকা, এখন পায় সতের টাকা।

ছোট ভাই দুটো রেল লাইনের ধারে মায়ের সঙ্গে যায় গোবর কুড়াতে।

রোশনি বিবি ঘুঁটে দেয় রেলের প্রাচীরে। সেখানেও শরীকি সীমানা আছে। সব জায়গায় ঘুঁটে দিতে পারে না। বেশির ভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে আশেপাশের বিহারী মেয়েরা। তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে রেলের দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়। ঘুঁটে শুকোলে দুটো মেয়ে মাথায় করে নিয়ে যায় গেরস্ত বাড়িতে।

আয় মন্দ হয় না।

রোশনি বিকেলবেলায় রান্না করে গলির মুখটায়, কখনও কখনও রেল-লাইনের ধারেও রান্না করে।

সন্ধ্যেবেলায় পাঁচ-ছয়জন মিলে খেতে বসে।

দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়।

রেলের দেওয়ালে ঘুঁটে দেবার নতুন দাবীদার খাতুন বিবি। বয়স বেশ বেশি। সোজা হয়ে চলতে তার কষ্ট। কষ্ট লাঘব করতে সঙ্গে আসে তার ছেলে রহমান। বয়স তার প'য়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। তার হাতে পায়ে সাদা দাগ। তবে জোয়ান মরদ। খাতুনকে বসিয়ে রাখে পাহারা দিতে। নিজেই গোবর কুড়িয়ে আনে গোটা শহর ঘুরে ঘুরে। রাতের বেলায় গোবর গাদা দেয় লাইনের ধারে। সকালবেলায় ঘাসপাতা সংগ্রহ করে মাটি মিশিয়ে ঘুঁটে দেয়। দুপুর হবার আগেই আবার বের হয় গোবর সংগ্রহ করতে।

রোশনির সঙ্গে রেলের দেওয়ালের ভাগাভাগিতে কয়েকদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। তবুও রোশনি যখন কাজ করে তখন রহমান চুপ করে বসে বসে দেখে।

তুই থাকিস কোথায় ? জানতে চেয়েছিল রহমান।

চারনম্বর লোহাপুলের ধারে। তুই থাকিস কোথায় ?

আমি, বলেই রহমান থামল।

হ্যাঁ হ্যাঁ তোর কথাই জিজ্ঞেস করছি।

উই সুইনহো লেনের পাশে বস্তি, তার পাশে রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে।

রোশনি আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

রহমান রোশনির ছেলেমেয়েদের দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর ছেলে-মেয়ে বুঝি ?

হ্যাঁ। বলে নিজের মনেই গোবরের দলা করতে থাকে রোশনি ?

তোর কটা ছেলেমেয়ে ?

পাঁচটা। দুই মেয়ে, আর তিন ছেলে।

সবাই বুঝি ঘুঁটে বিক্রি করে।

না। বড় ছেলে জোগারের কাজ করে। তোর ছেলেমেয়ে কটা ?

আমি বিয়েই করিনি।

তোর বিবি জোটেনি বুঝি ?

রহমান তার হাত আর পা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখে কেউ বিয়ে করেনি ! সবাই বলে তোর কুঠ হয়েছে, তোকে বিয়ে করব না।

ওঃ।

রোশনির অতি ছোট্ট মন্তব্যে রহমান ঘাবড়ে গেল।

বুড়িমা তো চায় আমার বউ আসুক। একবার একটা মেয়ে ঠিক করেছিল। আমরা তখন থাকতাম উল্টোডাঙ্গার রেল লাইনের ধারে ঝুপড়িতে। বুড়িমা মেয়ে দেখে খুব খুশী। বললাম, আমি দেখব মেয়েকে। মা বলল, মোছলমানের ছেলে হয়ে বিয়ে না করা অবধি কোন মেয়ের মুখ দেখা গুনাহ।

তুই যে আমার মুখ দেখছিস, গুনাহ হচ্ছে না।

জানি না। মায়ের কথাই তো বললাম। তবে চুপি চুপি মেয়ে দেখে এলাম পাতিপুকুরের ফুটপাতে।

কি দেখলি।

মেয়েটা সত্যিকার কুঠে। ব্যস। বিয়ে করা আর হল না। হয়ত বিয়ে হত কিন্তু রেল লাইনের পাশ থেকে ঝুপড়ি ভেঙ্গে পুলিশ আমাদের তাড়িয়ে দিল। তখন বুড়িমাকে সামলাবো না বিয়ে করব বল।

তাতো বটেই।

ধীরে ধীরে কেমন যেন আকর্ষণ সৃষ্টি হল পরস্পরের।

আর তাদের দেওয়ালের ভাগাভাগি নিয়ে কাজিয়া হয় না। রোশনি রহমানের শুকনো ঘুঁটে দেওয়াল থেকে ছাড়িয়ে জমা করে রাখে। রহমান

পাইকারী খদ্দের এলে সেগুলো বেচে দেয়।

তোর তো অনেক হাঙ্গামা।

কিসের হাঙ্গামা ?

পাঁচটা ছেলেমেয়ের হাঙ্গামা।

ওরা খুটে খেতে শিখেছে। বড়টা খেটে খায়। মেয়েরাও সেয়ানা হচ্ছে, পরের ছেলে দুটো পালিয়ে বেড়ায়। খাওয়ার সময় আসে। মাঝে মাঝে কোথায় যায় তা জানি না। হাঙ্গামা কেন পোহাব। ওদের বাপ তো জন্ম দিয়েই খালাস। মরে আমার হাড় জুড়িয়ে গেছে।

রহমান আর শুনতে পেল না। দুটো গাড়ি পাশাপাশি শব্দ করে ছুটে গেল তাদের পাশ দিয়ে। রহমানের মা বুড়ি লক্ষ্য করছিল ওদের হাবভাব।

হাঁরে রহমান, ওই মাগীটির সঙ্গে তোর অত কি কথা হয় রে ?

তুই তো সবই শুনতে পাস। জিজ্ঞেস করছিস ক্যান ?

বুড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি যে কানে খাটো! মাগীটা তো বেওরা।

রহমান কোন কথা না বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আকাশের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না মা। পানি হতে পাবে। কাঁচা ঘুটে-গুলো ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তা হলে উপায়। বর্ষা তো দেরি আছে। অসময়ে পানি। তাই তো।

দেখি বিকেল পর্যন্ত আকাশ সাফ হয় কিনা।

বুড়ি নিজের মনে গজরাতে থাকে, অসময়ের বৃষ্টি যাতে না হয় তার জন্য আকাশকে গালাগালি করে উঠে গেল আস্তানার দিকে। রহমান ঘুটে দেওয়া বন্ধ রেখে জমা করা গোবরগুলো এক জায়গায় এনে উঁচু করে সাজিয়ে রাখল।

রোশনি এসে বলল, ওটা কি করছিস রহমান ?

দলা করে ঢিপি দিলাম। যদি পানি হয় রাতে তা হলে ধুয়ে যাবে না। তোর সব মাল শুকিয়েছে। ওগুলো তোর ঝুপড়িতে নিয়ে যা রোশনি। পানি যদি কদিন হয় তা হলে শুকনো ঘুটের ভাল দাম পাবি।

আর দাম। ছেলেমেয়ে কেউ আর কাজে আসে না। আসে কেবল খেতে। কার জন্য এত মেহনত করব বল দেখি।

ওরা সেয়ানা হয়েছে লায়েক হয়েছে ওদের জন্য ভাবনা করে কি লাভ ?

কোথাও যেতে পারছি না।

তার চেয়ে তুই নিকে করলেই পারিস।

হঃ, একটা কথার মত কথা বলেছিস। বয়স এখন ভাটিতে, কে নিকে করবে বল।

তা বটে। তবে একটা কথা বলব, শুনবি ?

বল।

আমাকে নিকে করবি ? তবে আমার গায়ের দাগগুলো কুষ্ঠ নয়· বাবুরা

বলেছে। ওই যে মোড়ের মাথায় হোসেন ডাক্তার আছে, সেও বলেছে, এই দাগ কুষ্ঠ নয়।

আমার বড় বড় ছেলেমেয়ে।

তোকে খেতে দেয়। আমি তো আমার মাকে খেতে দিই। ওরা দেয় কি? ওদের জন্য ভেবে কি হবে। বলিস তো আমি আমার মাকে বলতে পারি।

রোশনি হঠাৎ রাজি হতে পারল না।

বলল, পরে বলব। ভাবতে দে।

কয়েকদিন পরে দেখা গেল বুড়িমাকে আর রোশনিকে নিয়ে রহমান কোথায় যেন চলে গেছে।

কয়েকদিন রোশনি তার আস্তানায় না যাওয়াতে পাঁচটা ছেলেমেয়েই খোঁজ আরম্ভ করল।

রহমানের মা বুড়িও নেই, রহমানও নেই, রোশনিও নেই।

পাশের দেওয়ালের জমিদার দুলোরী বলল, কয়েক রোজ পাহলা উলোক চলা গিয়া।

কোথায় গেছে জানিস?

মালুম নেহি, হোবরা হুবরা হোগা।

হাওড়া। তা হতে পারে। কাজ বন্ধ করে এরফান বের হল মায়ের খোঁজে।

রোশনির মায়া মমতার কেন্দ্র ছিল তার ছোট মেয়ে মুন্নীর ওপর। রহমানের ঘর করলেও এক সময় মেয়েটাকে দেখার জন্য প্রবল বাসনা জেগেছিল তার মনে। একদিন দুপুরে সে এসেছিল তার পুরানো ডেরায়। এই সময় এরফান কাজে যায়। বড় ছেলের সামনে যাতে দাঁড়াতে না হয় তাই সে দুপুরে এলেও ঘটনাটা অন্যরকম হয়েছিল। কদিন এরফান বের হয়নি। ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য রান্না করতে হত।

সেদিন রান্না বসিয়েছে এমন সময় রোশনি এসে হাজির।

এরফান তেড়ে উঠে বলল, তুই এসেছিস কেন?

মুন্নীকে দেখতে।

লাজ সরম নেই তোর। - মা হয়ে তুই খানকি হয়েছিস।

কি বলছিস রে এরফান। আমি তোর মা। আমাকে এই কথা বললি।

ঠিক বলেছি। মা হয়ে তুই পাঁচটা ছেলেমেয়ে ছেড়ে পালালি কি করে। ভাগ। শীগগির দূর হ, নইলে তোকে জানে মেরে দেব।

তেজের সঙ্গে রোশনি বলল, মার দেখি হারামজাদা।

এই দেখ, ডাক তোর ভাতার রহমানকে, বলেই রোশনির চুলের মুঠি ধরে চিৎ করে ফেলে দিল।

চিৎকার গোলমাল।

ফুটপাতের লোকের সঙ্গে ছুটে এল রাস্তার লোকেরা। কোন রকমে এরফানের হাত থেকে রোশনিকে ছাড়িয়ে যখন পুরো ঘটনাটা সবাই শুনল তখন কারও মুখে কোন কথা জুগালো না।

রোশনি ছাড়া পেয়ে অকথ্যভাষায় গালাগালি দিতে দিতে মুন্নীর হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেল। রোশনি বুঝল, এ তল্লাটে তার আসা নিরাপদ নয়। কোনরকমে এসে হাজির হল মৌলালিতে।

কিন্তু রহমান?

রহমান যে কোথায় রোশনিও জানে না।

গড়াতে গড়াতে একদিন বউবাজারের ফুটপাতের প্রজাদের সামিল হয়ে চুপ করে।

ননীবালা রোশনিকে লক্ষ্য করেছিল প্রথম থেকেই। রোশনির মুখে কালশিরার দাগ। কেমন সন্দেহ হল। নিজেই জিজ্ঞেস করছিল, কোথা থেকে আসছিস?

উই চারনম্বর লোহা পুল থেকে।

তোর সোয়ামী কোথায় রে?

মরেছে।

তারপর চুপচাপ।

ধীরে ধীরে রোশনি বলল তার সব কথা।

সর্বনাশ! বলেই ননীবালা থেমে গেল।

এক কাজ কর উশনী। আমার ব্যাটা আছে গাঁজা পার্কে। হোথায় যা। আমার ব্যাটার কাছে গেলে একটা হিল্লে হবে। এখানে থাকলে তোর ব্যাটা খুঁজে পাবে, তোর রহমান আবার এসে জুটবে। যাবি?

যাব। তোর ব্যাটা কবে আসবে।

আজ আসতে পারে। তার সঙ্গে চলে যাস। কেমন।

অমরের সঙ্গে রোশনি মেয়ে নিয়ে দক্ষিণে ময়দানের কাছাকাছি জায়গা করে নিয়েছিল।

যেদিন রোশনিকে নিয়ে অমর তার আস্তানায় এসেছিল সেদিন পাশেই গলির মুখে খুব ধুমধাম।

পাশের গলিতে অনুজবাবুর মেয়ের বিয়ে। রওশন চৌকি আর রোশনাই। গাড়ির ভিড় জমেছে বাড়ির সামনে। আত্মীয়দের আপ্যায়নে ব্যস্ত সবাই, ক্যাটারাররা ব্যস্ত রন্ধনশালায়। রান্নার গন্ধে চারিদিক মউ-মউ করছে। গলির মুখে ভিড় করে আছে উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ একদল শিশু। রোশনির মেয়েও জুটেছে সেখানে। তারা অপেক্ষা করছে ভোজ আরম্ভ হবার। ভোজ আরম্ভ হলেই এঁটো পাতার সঙ্গে কিছু উদ্বৃত্তও জমা হবে ডাস্টবিনে। সেখানে তারা বিয়ের ভোজ খেয়ে উচ্চকণ্ঠে বরবধুর মঙ্গল কামনা করতে পারবে।

আগের দিনে ওপাশের গলিতে বউভাতের পর দইয়ের কতকগুলো শূন্য হাঁড়ি ফেলে গেছে বিয়ে বাড়ির ঝি চাকররা। কয়েকটা বেশি বয়সী মেয়ে সেই হাঁড়িগুলো সংগ্রহ করে একটা রোয়াকে বসে আঙুল দিয়ে চেঁছে চেঁছে সেই দইগুলো খাচ্ছে, তার পাশেই মাংসের হাড় নিয়ে কয়েকটা কুকুর নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি করছে।

এরা সবাই অপেক্ষা করছে কখন বিয়ে বাড়ির ভোজ আরম্ভ হবে আর এঁটো পাতাগুলো ফেলে দিয়ে যাবে। ভাল মন্দ খাবার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা আজ এদের সফল হবে এঁটো পাতা চেটে।

সেদিন বড় রাস্তায় অমরের বড় খোকা নবেরচাঁদ কাগজ কুড়িয়ে ফিরে সারা দিনের উপার্জনের হিসাব দিচ্ছে ননীবালাকে।

বউভাতের দইয়ের হাঁড়ি চেটে আর বিয়ে বাড়ির এঁটো পাতা থেকে কুড়িয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটা বয়স্কা মহিলা আর তার দুটো মেয়ে শুয়েছিল ও পারের ফুটপাতে। রাত পোহাবার আগে মেয়ে দুটোর চিৎকারে তাদের মা জেগে উঠল।

কি হয়েছে কনি-মণি ?

পেটে বড়ই ব্যথা।

পায়খানা যা। ওই গলির অন্ধকারে বসে যা।

কনি-মণি পায়খানা গিয়েও আর ফেরে না। তাদের মা ব্যস্ত হয়ে সেদিকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তারও পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। সেও অন্ধকার গলির দিকে ছুটল। কনি-মণিকে দেখে কিছু বলার আগে মোচড় দিয়ে উঠল তার পেট।

সেও আর ফিরতে পারল না।

তিনজনে পাশাপাশি শুয়ে, শোনা যাচ্ছে তাদের গোঙানি।

রাজকুমারের ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন অমর ছিল তার পাশে।

সকালের আলো কেবল ফুটে উঠেছে, সেই আলোতে দেখতে পেল একটা বয়স্কা মহিলা আর দুটো জওয়ান মেয়ে গলিতে ছটফট করছে, ময়লায় তাদের কাপড়জামা ভর্তি। রাজকুমার ডেকে তুলল ননীবালাকে আর নমিতাকে। অমরও এল তাদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। অনেক চেষ্টা করে নিজেদের রিক্সা করে তিনজনকে হাসপাতালে পেঁছে দিয়ে এল। এরা কারা কেউ জানে না। পরিচয়হীন তিনটি মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করে এসেও রাজকুমার শান্তি পাচ্ছিল না। বিকেলবেলায় গেল তাদের খবর নিতে।

ডাক্তারবাবুরা বলল, কোন বিষাক্ত জিনিস পেটে গেছে। মনে হয় বিষাক্ত দই খেয়েছিল এরা। একজন বেঁচে আছে। যদি জ্ঞান হয় তা হলে জানা যাবে।

দাবীদার নেই মৃতদেহের।

লাশকাটা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে ওদের লাশ।

পরেরদিন সকালবেলায় গিয়ে রাজকুমার শুনল মেয়েটা বেঁচে আছে। জ্ঞান হয়েছে। নাম বলেছে মণি। জ্ঞান হয়েই সে মা-বোনের খোঁজ করেছে। তাকে বলা হয়নি তার মা বোন মারা গেছে।

এরপর আর রাজকুমার মেয়েটার খবর নিতে যায় নি।

দিন দশেক পর একটা রোগা মেয়ে ফুটপাতে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ননীবালাকে জিজ্ঞেস করল, তোরা বলতে পারিস আমার মা নীহার আর বোন কনি কোথায় গেছে?

মাথা নেড়ে তার অজ্ঞতা জানাল ননীবালা।

রাজকুমার তাকে ডেকে বসাল তার ছেঁড়া মাদুরের ওপর।

তোর ঘর কোথায় ছিল?

নদে, নদে জেলায়।

এখানে কার কাছে এসেছিলি?

আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিল পার্টির লোকেরা। বলল, ভাগ এখান থেকে। তোদের ঘরে নকশাল থাকে। এগাঁয়ে তোদের ঠাঁই হবে না।

তারপর।

আমাদের জিনিসপত্র লুটপাট করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। বাড়ি ছেড়ে মায়ের সঙ্গে পালালাম।

তোর বাবা কোথায়?

বাবা! নেই। মরেছে। ক্ষেতমজুরী করত। জোতদারদের ঠ্যাঙ্গারের দল পিটিয়ে মেরেছে। বাবুরা বলল, বেশ হয়েছে, শালা নকশাল।

তাতেই পিটিয়ে মারল, আশ্চর্য!

বাবার দোষ আছে। ক্ষেতমজুরদের এককাট্টা করে জোতদারদের বলল, নায্য মজুরী দিতে হবে। ফসলের ভাগ দিতে হবে। বড়লোকেরা কি তা দেয়। লাগল ঝগড়া কাজিয়া। সন্ধ্যাবেলায় বাবা আসছিল হাঁসখালি বাজার থেকে। একা পেয়ে তাকে পিটিয়ে মেরেছে পনের বিশ দিন আগে। কে মারল তার হদিস হল না।

পুলিশের কাছে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ। মা গেল। কি বলল জানি না। তারপর একটা ঘটনাই মনে আছে। আমাদের ঘর জ্বালিয়ে গ্রাম ছাড়া করেছে। না করলেও গ্রাম ছাড়তে হত। গ্রামে তো কেউ খেতে দিত না। মা মনে করেছিল, কোনরকমে কলকাতা গেলে গতর খাটিয়ে খাব। তা আর হল কই! মা আর দিদি দুজনে আমাকে হাসপাতালে রেখে কোথায় যে গেল।

তোর খাওয়া হয়েছে?

না। কাল হাসপাতালে যা খেয়েছি তারপর আর একদানাও পেটে পড়েনি।

রাজকুমার ডাকল নমিতাকে।

মুড়িটুড়ি কিছু আছে রে?

কেন?

এই মেয়েটা সারাদিন খায় নি। কিছু আছে কি?

একটা ভুট্টা পুড়িয়ে রেখেছি। নুন দিয়ে খেতে পারে। রাতে রান্না হলে ওকে খেতে দেব।

পোড়া ভুট্টা খাবি রে?

না। পেটের ব্যথা, ডাক্তার বলেছে বাজে কিছু খাসনি আরও তিনমাস।

না খেলে বাঁচবি কি করে? এই নমি, দশ পয়সার মুড়ি এনে দে এই মেয়েটাকে।

রাজকুমারের কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে নমিতা মুড়ি আনতে গেল।

তোর নাম তো মণি। তোরা সেদিন কি খেয়েছিলি?

দু'দিন খেতে পাইনি। বিয়ে বাড়ির সামনে কয়েকটা দইয়ের খালি ভাঁড় পড়েছিল। খিদের জ্বালায় ওই দই চেটে চেটে খেয়েছিলাম।

রাজকুমার চমকে উঠল। ডাক্তারবাবু বলেছিল বিষাক্ত দই খেয়ে এরা মরণাপন্ন হয়েছে। ভাবতে থাকে, মানুষ বাঁচার জন্য কি ভাবে না জেনে বিষও খেয়ে মরণকে ডেকে আনে।

তোর বাবাকে তো পিটিয়ে মেরেছিল। যারা মেরেছিল তাদের পুলিশ ধরেনি।

জানি না। মা বলেছিল, ওরা পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্টির লোক তাই ওদের সাতগুণ মাপ।

রাজকুমার ভেবে পেলনা, এই অন্যায় অত্যাচার আর কতদিন চলবে। একটা নতুন হুজুগ এসেছে দেশে। যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করতে চায় তাদের বড়লোকেরা আর পার্টির লোকেরা বলে নকশাল। ওদের খাতায় যারা নকশাল তাদের বেঁচে থাকার অধিকারও থাকে না। কুকুর বেড়ালের মত পিটিয়ে মারা হয় ওদের ভবিতব্য। এসব তত্ত্ব কথা রাজকুমার বোঝে না। তবে শহরে থেকে অনেক কিছুই সে জেনেছে ও শিখেছে।

ফুটপাতের জমিদারীর অংশীদার যারা তাদের কেউ-ই আর মানুষ মনে করে না। এদের নাই কোন মর্যাদা, নাই কোন বেঁচে থাকার অধিকার। অথচ এদের পূর্বপুরুষরাই এক সময় ছিল গেরস্ত। ছোটখাট প্রান্তিক চাষী। শহরের বাবুদের পেটের ভাত এরাই জুগিয়েছে।

তারপর একদিন দেখা গেল ওরা হারিয়েছে চাষের জমি, হারিয়েছে চাষীর মর্যাদা, হারিয়েছে চাষের বলদ, লাঙ্গলের ফাল্; হারিয়েছে খিড়কি পুকুরে

মাছ মারার অধিকার। বিগত পঞ্চাশটা বছরে ভেঙ্গে গেছে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। এদের কোন সামাজিক বন্ধন আর নেই, এদের মানুষের মত চেহারা আছে, কিন্তু মানুষের বৃত্তিগুলো লোপ পেয়েছে। শহরের পূতি গন্ধময় পরিবেশে এরা বেড়ে চলেছে দু'মুঠো ভাতের জন্য। শুধু বাঁচতে চায় ওরা।

আজকাল ময়দানে মাঝে মাঝেই যে সব জমায়েত হয় তাতে রাজকুমার অথবা ননীবালা যেতে পারে না। তবে ফুটপাতের অধিবাসীদের একটা অংশকে যেতে হয় পাড়ার মস্তানদেব তাগাদায়। একদিন হয়ত ওদের যেতে হয়েছে তেরঙ্গা পতাকা ঘাড়ে করে পরদিন ওরাই আবার হয়ত গেছে কাস্তে হাতুড়ি ঝাণ্ডা হাতে করে। ওরা যেন দাবার ঘুটি যে দিকে চাল দেয় সেদিকে চলতে বাধ্য হয়। ওদের নিজের কোন সত্ত্বা আছে বলে মনে করে না কেউ-ই।

ময়দান থেকে ফিরে এসে ওবা গল্প করে। গল্প ওদেব নেতাদের ঘিরে নয় ওদেব বক্তব্য সেদিন মাঠে তাদের পেটের জ্বালা কি ভাবে মিটিয়েছে তার গল্প। হয়ত কোন পরিচিত জনকে দেখতে পেয়ে গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু ওদের অনেকেই জানে না কোন গ্রাম থেকে ওরা এসেছে, অথবা ওদের বাবা-ঠাকুরদার কি নাম। কিন্তু যখনই শোনে দক্ষিণের লোক এসেছে তখনই ওদের আত্মজন ও কুটুম্বজনের কথা মনে পড়ে।

নদেরচাঁদ বড় হয়েছে।

ওদিকে অমূল্যের বউয়ের প্রসব ব্যথা উঠেছে।

আবার নমিতার নতুন ঘরও ভেঙ্গেছে!

পাঁচীবিবি আর আসিমের কথা উচ্চারণও করে না। পাঁচীবিবি এখন পাঁচ-বালা। রোশনি এখনও রোশনি। নতুন ঘর সে পায়নি। চেষ্টাও করেনি।

রঘুয়া তার বিবি বাচ্চা নিয়ে সুখেই আছে উল্টোডাঙ্গার কোন বস্তি-বাড়িতে। গঙ্গাজীর কিরপায় আর ঝুপড়িতে থাকতে হয় না।

হরদয়ালের মেয়ে লোতিয়া যে কোথায় গেল তার হদিস এখনও কেউ করতে পারেনি।

ফুটপাতের জমিদারদের জীবনে নতুনত্ব নেই। আছে শুধু বেঁচে থাকার উৎকট বাসনা। বাঁচা ও সৃষ্টির সমস্যায় তারা ভুলে গেছে অথবা ভুলতে বাধ্য হয়েছে তাদের অতীত, চিন্তাও করে না তাদের ভবিষ্যত, বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, অবক্ষয়িত সমাজের বিকট চেহারার দিকে তাকিয়ে ধীমানদের পরিবার উৎকণ্ঠা বোধ করে। 'আহা-উহু' করে সমবেদনা জানায় কিন্তু পরিত্রাণের পথ খুঁজে দিতে পারে না। ফুটপাতের জমিদাররাই বোধহয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সর্বাধিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং গণতন্ত্রের উপাসক। ধর্ম নিরপেক্ষতা যেমন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ এরা সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, এদের নিজস্ব কোন ধর্মমত নেই, এরা পশু জীবনকে আলিঙ্গন

করে ধর্মকে কোন মতেই আপন করে নিতে পারেনি। এদের না আছে জাতের বড়াই, না আছে ধর্মের অহমিকা। এরা মানুষের চেহারা নিয়ে বাস করে। জাতধর্ম মানে না। নিজেদের অবস্থা সামাল দিতে সর্বদলের সেবায় গণতন্ত্রী হয়ে বাস করে।

নদেরচাঁদ এসে বলল, দাদু, বাবুরা কি বলছিল জানিস ?

কি বলছিস রে ?

ভোট হবে।

রাজকুমার বলল, সে তো হামেশাই হয়। তোর কাছে নতুন আমরা অনেকবার ভোট হতে দেখেছি। এতে তোর কি ?

বাবুরা বলল, এবার নাকি সবাইকে খাটাখাটনি করতে হবে।

বেশ ভাল কথা। তোকে করতে হবে না। তুই তো ভোট দিবি না।

কেন ?

জানিস না বুঝি। যাদের খাতায় নাম থাকে তারা ভোট দেয়। আমাদের নাম তো খাতায় নেই।

কেন নেই ?

আমাদের ঘর নেই, থাকার জায়গা নেই, আমাদের নামও নেই।

নদেরচাঁদ বলল, কেন নেই।

রাজকুমার গম্ভীরভাবে বলল, ওই ড্রেনটা দেখছিস। ওতে মশার ডিম ভাসছে। ডিমগুলো কিলবিল করবে। তারপর মশা হয়ে দল বেঁধে উড়ে যাবে।

সত্যি।

হাঁরে, কর্পোরেশনের বাবুরা তাই বলেছে। আরও বলেছে, ম্যালেরিয়া হয় ওই সব মশা কামড়ালে। একটা মশা তো কামড়ায় না, দল বেঁধে ওরা মানুষ জন্তু সবাইকে কামড়ায়।

তাই বুঝি জ্বর হয়।

হাঁ। কিন্তু আমরা হলাম ওই নর্দমার পোকার মত। এই ফুটপাত হল আমাদের নর্দমা। এই নর্দমায় আমরা ডিম পাড়ি, নতুন বাচ্চা কাচ্চা জন্মায়। কিন্তু মশার মত দল বেঁধে উড়তে পারি না। যেদিন আমরা মশার মত দল বেঁধে উড়তে পারব, হুল ফোটাতে পারব ওই সব বাবুদের গায়ে সেদিন ওদের বিকারের ঘোর দেখা দেবে। যতদিন তা আমরা না পারছি ততদিন, ওরা বিষ ছড়িয়ে আমাদের মারতে চেষ্টা করবে, বুঝলি ?

ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।

রাজকুমার হেসে বলল, তোর বয়স কম। অনেক কিছু দেখিসনি। তাই এইসব বাবুদের কথায় লাফাচ্ছিস। ভোটের নামে বিষ ছড়িয়ে আমাদের মারতে চায় ওরা। আমাদের ওরা ঘর দেয় না। রুটিরুজির ব্যবস্থা করে না। আমরা

ওই মশাদের মত দল বেঁধে ওদের কামড়াতে পারি না, তাই সুযোগ নিয়ে ওরা বিষ ছড়াচ্ছে আমাদের মেরে ফেলতে। ফুটপাত হল ড্রেন, আমরা হলাম মশা, ভোট হল বিষ।

কি যে পাগলের মত বকছ, বুঝি না। তবে বাবুরা বলেছে, খাটাখাটনি করলে মজুরী দেবে। সরকারী মজুরীর চেয়ে ডবল দেবে। এই দ্যাখ্, পঞ্চাশটা টাকা আগাম দিয়ে গেছে। তুই রাখ, আমাকে আবার সাঙ্গাত জোটাতে হবে। নন্টা, ফন্টা, গ্যাদা, হুরুম এদের সব ডাকতে হবে।

রাজকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আমি বুড়ো হয়েছি। যা ভাল বুঝিস কর তবে তোর বাবাকে শুধিয়ে নিস।

নদেরচাঁদ কাউকেই জিজ্ঞেস করেনি। পরামর্শও করেনি। বাবুদের পেছন পেছন তার দলবল নিয়ে ঘোরে, পোস্টার মারে। ঝাণ্ডা হাতে করে মিছিলে বের হয়। অনেক রাতে নগদ টাকা পকেটে নিয়ে আস্তানায় আসে, ননীবালা তার জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকে। সব দিনই নদেরচাঁদ বাইরে থেকে এসে রাতের বেলায় ননীবালার পাশে শুয়ে বলে আজ যা খেয়েছি দিদা তা আর কি বলব। আমার চোদ্দপুরুষ তা খায়নি। আমাদের নাদুবাবু চীনাদের হোটেলে গিয়ে পাশে বসিয়ে খাইয়েছে। তুই যদি অমন রান্না করতে পারতি তাহলে খুব ভাল হত।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা খুদের জাউ খাই। তোরা ছোটবেলায় আনাজ কুড়িয়ে যা আনতি তা দিয়ে তরকারী রান্না করে খাইয়েছি, চীনা হোটেলের খাবার কোথায় পাব। শোন্ চাঁদু,একদিনের খাওয়াটা সব নয়। রোজ কি তোকে খাওয়াবে। এখন ওদের লোক দরকার তাই পয়সা দিচ্ছে খাওয়াচ্ছে। যেদিন কাজ শেষ হবে সেদিন তোকে ওরা চিনতে পারবে না।

ননীবালার হিতোপদেশ চাঁদু স্বীকার করে না। তাকে নাদুবাবু বলেছে, এবার ভোটে জিতলে তাদের একটা ঘর দেবে, দোকান করে দেবে।

যদি না জেতে?

তাহলে ঘর দিতে না পারলেও একটা চাকরি দেবে।

কি চাকরি?

তা চাঁদু জানে না, তবে চাকরি একটা হবেই। চাকরি করতে হলে লেখাপড়া জানা দরকার কিন্তু নদেরচাঁদ তো বর্ণপরিচয়ের পাতা কখনও উল্টে দেখার সুযোগ পায়নি।

তবে নাদুবাবু তাদের দলের সবাইকে দুটো করে সুতির প্যাণ্ট আর দুটো করে জামা দিয়েছে, আর দিয়েছে হাওয়াই চপ্পল। ছেঁড়া লুঙ্গি আর ছেঁড়া জামা ননীবালাকে দিয়ে বলেছে, এগুলো দিয়ে কাঁথা করিস দিদা। আমার ওসবের দরকার হবে না।

পনের বিশ দিন যেতে না যেতেই একদিন নদেরচাঁদ অনেক রাতে এসে

ননীবালার পাশে শুতেই ননীবালা ধরমরিয়ে উঠে বসল। দুর্গন্ধে তার নাক ঝাঁঝিয়ে যাচ্ছিল।

হাঁরে দাদু, তুই কি তাড়ি খেয়ে এসেছিস।

নদেরচাঁদ খেঁকিয়ে উঠল। বলল, চাঁদু তাড়ি খাওয়ার পাত্তর নয় দিদা, চাঁদু কালী ভক্ত, মা কালীর পেসাদ খায়! বুঝলি?

ননীবালা অবাক হয়ে গেল সতের আঠার বছরের নাতির কথা শুনে। চাঁদুর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে রইল। সারা রাত তার ঘুম হল না। সকালবেলায় উঠেই রাজকুমারকে সব বলে গালে হাত দিয়ে বসল।

কি ভাবছিস বউ?

ভাবছি চাঁদুটাও মানুষ হল না!

রাজকুমার হেসে বলল, আমরা হলাম ফুটপাতের জমিদার। আমাদের কেউ কখনও মানুষ হয় না বউ। আমরা বাঁচার জন্য রাস্তায় পড়ে থাকি। আমাদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ছাউনীর তলায় যারা বাস করে তারা লোভ দেখায়। সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। এতে নতুনত্ব কিছু নেই, তবে অমরকে খবর দিতে হবে।

ননীবালা নদেরচাঁদের দু'হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মদ খেলেও চাঁদু মাতাল হয়নি। ননীবালাকে কাঁদতে দেখে বলল, তুই কাঁদছিস কেন দিদিমা?

একি কাজ করলি চাঁদু। আমরা গরীব ভিখারী। আমাদের কি তাড়ি মদ খাওয়া সাজে। ওই সব বাবুরাই আমাদের পথে বসিয়েছে, এখন আমাদের আরও সর্বনাশ ডেকে আনতে তোদের মাথায় হাত বুলিয়ে জানোয়ার তৈরি করতে চায়। ওসব ভোটের দলে যাসনে চাঁদু।

রাজকুমারগম্ভীর ভাবে বলল, আমাদেরএপাশে-ওপাশে যারা সংসার পেতে বসে আছে তাদের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলে বাপের নাম অনেকেই বলতে পারবে না রে চাঁদু। কিন্তু এক সময় আমাদেরও ঘর ছিল, চাষের জমি ছিল। ওই বাবুরা সব কামোট, এমন ওদের কামড়, যার বিষে আমরা আজ কলকাতার ফুটপাতে আসতে বাধ্য হয়েছি। তবুও যেটুকু বাকি ছিল তাও ওরা শেষ করতে চায়। আজ বিনা পয়সায় নেশা করতে শেখাচ্ছে, যেদিন তুই পাকা নেশারু হবি তখন ওরা আর বিনা পয়সায় নেশা জোগান দেবে না। নেশা মেটাতে তোকে চুরি-রাহাজানি করতে হবে। তখন মানুষের চেহারা থাকলেও জানোয়ার হয়ে যাবি রে চাঁদু। ও পাপ থেকে দূরে থাকিস।

নদেরচাঁদ সবটা বুঝল কিনা তা বোঝা না গেলেও দু'হাতে ননীবালার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আর কখনও নেশা করব না। তোর দিব্যি।

ননীবালা চাঁদুর প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করলেও রাজকুমার জানে নেশার ঘোরে নেশারু যে সব শপথ করে তার মূল্য অত্যধিক কম। মিথ্যা শপথ করে

শপথ রক্ষা করার কোন আগ্রহ কোন সময়ই তাদের থাকে না।

পরের দিন সকালবেলায় চাঁদু আর ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে পথে বের হল না। বিকেলবেলায় নাদুবাবুর লোকেরা এসে চাঁদুকে খুঁজতে এসে দেখল চাঁদু শুয়ে আছে।

হাঁরে চাঁদু আজ তোকে দেখলাম না কেন? নাদুদা তোকে খুঁজছিল। আজ বিকেলে পার্কে সভা হবে, লোক জমায়েত করতে হবে, তুই শুয়ে থাকলে লোক জোটাবে কে?

আমার দেহটা ভাল নেই দাদা।

তুই শুয়ে থাকলে তোর সাঙ্গাতরাও তো যাবে না, তোকে যেতেই হবে। এই নে একশ টাকা। ভাগ করে নিস, এখন ওঠ।

একশ টাকার লোভ সামলাতে পারছিল না চাঁদু। ননীবালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি করি বলতো দিদিমা।

ননীবালা ভেবে চিন্তে বলল, যাবি যা কিন্তু নেশা করিস না। কোন গোলমালে যাস না যেন।

টাকাটা ননীবালার হাতে দিয়ে চাঁদু রওনা দিল।

ঠিক সন্ধ্যের সময় পার্কের সভা সবে জমে উঠেছে এমন সময় বিরোধী দলের মিছিল যাচ্ছিল পথ দিয়ে। তাদের স্লোগানে ছিল নাদুবাবুর নিন্দাসূচক উক্তি। মিছিল পার্কের কাছে এসে জোর গলায় স্লোগান দিতে থাকে। নাদুবাবুর দল সহ্য করবে কেন। পাল্টা স্লোগান দিতে দিতে তারাও বেরিয়ে এল পার্কের বাইরে। দু'দল মুখোমুখি। এতক্ষণ গলাবাজি ছিল অস্ত্র, হঠাৎ ইঁট পাথর ছুঁড়তে থাকে। উভয়পক্ষই রণং দেহি চিৎকারে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলল। কারও মাথা ফাটল, কারও হাত ভাঙ্গল। হঠাৎ বোমার শব্দে চমকে উঠল সবাই। একদল অপর দলের দিকে মুড়িমুড়কির মত বোমা ছুঁড়তে থাকে। আশে পাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, গৃহস্থ বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা। শুধু বোমার শব্দ।

পুলিশ ছিল আশে পাশেই।

আরম্ভ হল পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গাকারীদের লড়াই। অবশেষে রণেভঙ্গ দিল দাঙ্গাকারীরা।

সভা পন্ড।

মিছিলকারীরা নিমেষে অন্তর্হিত।

রাস্তা খালি।

রাস্তার আলোগুলো জ্বলতেই দেখা গেল কয়েকজন আহতকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ছুটছে।

সভার গোলমালের সংবাদ ননীবালা ও রাজকুমার শুনেছে। তাদের ভয়, চাঁদু এই গোলমালের অংশীদার হলে অশেষ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে।

তারা দুজনেই অধীর প্রতীক্ষা করছিল চাঁদুর জন্য। ননীবালা ভাত রেঁধে ঢেকে রেখেছে, চাঁদু না ফেরা অবধি বসে থাকতেই হবে। হতচ্ছাড়াটা হাড় জ্বালাতে আরম্ভ করেছে। ভাবছে অমর এলেই তার ছেলেকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবতে ভাবতে ননীবালা ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষ রাতে চাঁদু এসে ধাক্কা দিয়ে ননীবালার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলল, খেতে দে।

চোখ ডলতে ডলতে ননীবালা উঠে বসে চারিদিক তাকিয়ে দেখে বলল, রাস্তায় একটাও লোক নেই। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি?

চাঁদু হেসে বলল, হাজতে।

হাজতে? কেন?

পার্কের গোলমালের সময় পুলিশ দু'দলের বিশ-বাইশজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তোকেও ধরেছিল বুঝি?

হাঁ। তবে নাদুবাবুর লোক গিয়ে জামিন করে এনেছে।

বলিস কি করে। তোকে মানা করেছিলাম। তুই তো তা শুনলি না। এবার পুলিশের খপ্পরে পড়লি তো। আর যাসনে চাঁদু। নে খেয়ে নে।

তোরা খাসনি?

না। তোর জন্যই তো বসে আছি।

খেতে খেতে চাঁদু বলল, শালাদের ঘায়েল করেছি বুঝলি। ইয়ারকি! এ্যাসা ইট আর বোমা মারলাম, শালারা পালাতে পথ পেল না।

তুই বোমা মেরেছিলি? কোথায় পেলি বোমা।

নাদুবাবুর লোকেরা সাপ্লাই দিলে। হরিলুটের বাতাসার মত ছড়িয়েছি।

ননীবালা শঙ্কিত হল। তার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। চাঁদু বলতে থাকে, আমাদের হাবুর তাক খুব ভাল। ওদের পলটা মরতে মরতে বেঁচেছে। শালা এখন হাসপাতালে। মামদোবাজি পেয়েছে শালারা। কাল আবার মিটিং আছে শেয়ালদা ইস্টিশনের সামনে। আবার এক হাত লড়তে হবে। বুঝলি!

কেউ মরেনি তো?

মরেনি, এবার মরবে।

তুই-ও তো মরতে পারিস ওদের বোমায়।

তাও হতে পারে। লড়াইতে যে কেউ তো মরতেই পারে। জানিস, আমরা যে ভাবে ফুটে থাকি, এর চেয়ে মরাটা কি খুব খারাপ। মরতে তো হবেই, লড়াই করে মরব।

কার জন্য লড়াই করবি? তুই মরলে তো চুকেই যাবে কিন্তু হাত পা হারিয়ে যদি বেঁচে থাকিস তার চেয়ে আর কিছু কষ্টের হবে কি? ওই তো মরিবালার

সোয়ামি বিপনে, ওকে দেখছিস তো? ডাকাতের দলে ছিল। ডাকাতরা ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে দিল। কি কষ্ট বল দিকি। ভাগ্যি মরিবালার মত ভাল মেয়ে ওর বউ। নইলে না খেয়ে মরতে হত। তুই কি ওইভাবে থাকতে পারবি?

তোর যত সব বাজে কথা। আমাদের সঙ্গে ওরা পারবে কেন?

খাওয়া শেষ হতে হতেই সকাল হয়ে এসেছে। ফুটপাতের জমিদারদের আর শুয়ে থাকার নিয়ম নেই। তবুও ননীবালা গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল, আর যাসনি চাঁদু। ভোট দিয়ে আমাদের কি হবে। আমাদের আজও ফুটপাত, ভোট শেষ হলেও ফুটপাত। আমাদের কপালে এর চেয়ে ভাল কিছু নেই। তাই বলছি ওসব হুজুগে যাসনি।

চাঁদু কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। সে ভাবছিল থানার দারোগাবাবু দশটার সময় আদালতে যেতে বলেছে। আদালতে গিয়ে জামিন নিতে হবে। এবার তাদের লড়াই হবে পুলিশ আর আদালতের সঙ্গে।

সেদিনের হাঙ্গামায় নাদুবাবুর অনুচর হেঁপো গোবর্ধন হাসপাতালে মারা গেছে। খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা এলাকায়। চাঁদু খবর শুনেই ছুটল হাসপাতালে।

হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে হেঁপো গোবর্ধনের বউ মীনু কাঁদছে। তাকে ঘিরে রয়েছে নাদুবাবুর অনুচররা। তারা সান্ত্বনা দিচ্ছে মীনুকে।

এই তো ক'মাস আগে হেঁপো গোবর্ধনের সঙ্গে মীনুর বিয়ে হয়েছে। এখনও বিয়ের হলুদের গন্ধ তার গা থেকে মেটেনি। হেঁপো গোবর্ধন শেয়ালদহের ফুটপাতের ট্যাক্স কালেকটার। ট্যাক্সের অর্ধেক তার পাওনা বাকি অর্ধেক থেকে দলের সাগঁরেদ আর পুলিশের পকেট ভর্তি হয়। মীনু পাঁচ পোতার মেয়ে। পাশের ভেরি থেকে যারা মাছ চুরি করত তাদের মাছ নিয়ে বাজারে বসত। উপার্জনের ভাগীদার থাকলেও মীনু তার দিদিমা ও ছোট ভাই নিয়ে সুখেই ছিল।

হঠাৎ দেখা হেঁপো গোবর্ধনের সঙ্গে শেয়ালদহে। হেঁপো গোবর্ধন এসেছিল ফুটপাতের ট্যাক্স আদায়ে। মীনুও এক হিসাবে তার প্রজা ও খাতক। প্রজা ও খাতকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সহজেই হয়েছিল। শেষ অবধি দুজনে গাঁট-ছড়া বেঁধে বস্তির একটা ঘরে এসে উঠেছিল।

হেঁপো গোবর্ধন নাদুবাবুর সাগরেদ। তাই ভোটের বাজারে তাকে নামতে হয়েছিল নাদুবাবুকে জেতাতে অথবা হারাতে কিন্তু পকেটটা তার ভর্তি হত রোজই। সেদিন সভায় সে ছিল কর্তাব্যক্তি, ম্যানেজ করছিল শ্রোতাদের। বিরুদ্ধপক্ষ আসতেই সবার আগে হেঁপো গোবর্ধন নেমে পড়েছিল মিছিল ভাঙ্গতে, শেষ পর্যন্ত থান ইটের আঘাতে মাথা ভেঙ্গে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আর ঘরে ফিরতে পারেনি।

মীনু কাঁদছে।

চাঁদু তার পাশ দিয়ে বার দুয়েক ঘুরে গেছে। হঠাৎ সাহস করে মীনুর সামনে এসে বলল, তুই কাঁদিস না বউদি। আমিও নদেরচাঁদ, এর বদলা নেবই। তিনদিনের মধ্যে তিন শালার মাথা যদি না ভাঙ্গি তা হলে আমার নাম নদেরচাঁদই নয়।

মীনুর কান্না থেমেছিল কিনা সে খবর চাঁদু আর পায়নি কিন্তু ভোট শেষ হতেই যে যার মত নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে কয়েক মুঠো টাকা নিয়ে। ভোট গণনার পর জানা গেল নাদুবাবু হেরে গেছে। অর্থাৎ চাঁদুর আশা আকাংক্ষা সবই হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে।

অনেকদিন পর মীনু বউদির সঙ্গে দেখা হল হিন্দ সিনেমার উল্টোদিকে। চাঁদু তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ বউদি ?

মীনু মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমি চাঁদু গো চাঁদু, নদেরচাঁদ।

তাই বল। তা কটা মাথা ভাঙ্গলে ভাই ? ভোটের বাজার তো ঠাণ্ডা, এই তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছি।

চাঁদু লজ্জা পেল। প্রথমে কোন কথা বলতেই পারছিল না। পরে বলল, কি করব, নাদুদা বললে আর হাঙ্গামা তোরা করিস না। ভোটটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে এর একটা ব্যবস্থা আমি-ই করব।

ভোট তো মিটেছে। এখন কি ব্যবস্থা করবে জিজ্ঞেস করেছ ? এই হুজুগে মেতে আমি তো হেঁপোকে হারিয়ে পথে পথে ঘুরছি। আমার সোয়ামীটাকে ওই ভোটের বাবুরা ফেরত দিতে পারবে কি ?

নাদুদার কাছে গিয়েছিলে বউদি।

গিয়েছিলাম। তোমার ওই নাদুবাবু কি বললে জান ? বললে, আমি কি ওদের মারামারি করতে বলেছিলাম। ভোট হয় শান্তিতে। যারা শান্তি নষ্ট করে তারা শাস্তি পায়। হেঁপোটা আমার কথা শোনেনি। এরপর আমি কি করব। আমার কিছুই করার নেই।

তাই বললে ? শালা পাকা বদমাস। বোমাগুলো জোগান কে দিয়েছিল ? বোমা কেনার মশলার পয়সা কে দিয়েছিল ? ওই শালা নাদু মিত্তির-ই তো দিয়েছিল, এখন বলছে আমি তো মারামারি করতে বলিনি। শালা হারামি।

রাগ করছ কেন ভাই। আমরা গরীব মানুষ। ওদের পয়সা আছে। বড়লোক। ওরা ভোট ভোট খেলা করে মাঝে মাঝে। পয়সা ছড়িয়ে দেয়। আমরা কুকুরের জাত, দু'টুকরো মাংস ছুঁড়ে দেয় আর আমরা সেই মাংসের লোভে ওদের পিছনে পিছনে ছুটি। মাংসটায় যে বিষ থাকে তাতো আমরা জানি না। তাই ওদের ভোটের খেলায় আমরা জান-প্রাণ দেই, জান-প্রাণ গেলে

একমুঠো ভাতও ওরা দেয় না আমাদের মত হতভাগীদের।

তা তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

পেট তো ভোটের জন্য চুপ করে থাকবে না। পাঁচপোতায় মায়ের কাছে ফিরে গেছি। ভেরির মাছ হাত বদল করছি। তাতেই চলে যাচ্ছে। এসেছিলাম কলেজ স্ট্রীট বাজারে। সামান্য যা কিছু পেলাম তাই নিয়ে ঘরে ফিরছি।

চাঁদু কোন কথা খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ বলল, চা খাবে বউদি ?

চা ! তা খেতে পারি। তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন দোকানে নয়।

খোট্টা চা-ওলার কাছ থেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে দুজনে ট্রামের পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

চাঁদু বলল, আবার কলকাতায় এলে দেখা করবে কিন্তু। হেঁপোর কথা রোজই মনে হয়। তোমার কথাও ভাবি। কিন্তু আমরা কত বোকা, ওরা আমাদের বুকে পা দিয়ে উপর তলায় উঠেই আমাদের কথা ভুলে যায়।

সেই কথাই তো বলছিলাম। চিরকাল ওরা আমাদের পায়ে মাড়িয়ে চলেছে অথচ আমরা তা বুঝতে পারিনি। তুমি কোথায় থাক চাঁদু ?

আমার দাদু বলে ফুটপাতের সাড়ে তিন হাত জমির জমিদার আমরা।

বুঝলাম। কোথায় সেই জমিদারী ? আমি তো রোজ কলকাতায় আসি। হয়ত দেখা হতে পারে।

বউবাজারে।

হাতের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে মীনু বলল, আজ চললাম। আবার দেখা হবে। দেখ চাঁদু, হেঁপো মরেছে, কত হেঁপো রোজ মরছে তাতে সুয্যি চন্দ্র তো বসে থাকছে না। তবুও তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেলাম, তবুও তো একজন হেঁপোর কথা আজও ভাবে।

মীনু শেয়ালদহের পথ ধরল।

চাঁদু চলল ভবানীপুরের দিকে। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

রাজকুমারের শরীর আর চলতে চায় না।

ননীবালা মাঝে মাঝেই জ্বরে কাতরায়। নদেরচাঁদ দশ টাকা জমায় রিক্সা নিয়েছে। সারাদিনের বার ঘণ্টায় দশ টাকা মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে মোটের ওপর মন্দ থাকে না পকেটে। রিক্সার সিটের তলায় টাকাগুলো জমায়। রাতের বেলায় পাঁচটা টাকা ননীবালার হাতে দিয়ে বলে, এই নে, খেতে দে।

ননীবালা টাকাটা হাতে নিয়ে বলে, পাঁচ টাকায় আর তিনটে পেট কি চলেরে চাঁদু। সারাদিন মেহনত করে যদি মাত্তর পাঁচ টাকা লাভ হয় তাহলে ও কাজ আর করিসনি।

চাঁদু হেসে বলে, কটা টাকা রেখে দিচ্ছি। দাদু যেমন একটা ঠেলা

কিনেছিল তেমনি আমিও একটা রিক্সা কিনব দিদিমা। নিজের গাড়ি হলে কত যে লাভ তা তুই জানিস না। একটা বছর কষ্ট, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ননীবালা বলল, ঠিক বলেছিস কিন্তু ঠেলা আছে লাইসেন আছে কিন্তু এখন তো তারক ভরসা। আগে আগে অনেক টাকা দিত এখন দিন গেলে কোনদিন দশ টাকা দেয় কোনদিন আট টাকা। তবুও দেয় বলেই পেট চলছে। হাঁরে চাঁদু তোর বাবার কাছে যাস কি? যাস। কেমন আছে ওরা, অমর অনেকদিন আসে না, ছেলেমেয়ে দুটো কত বড় হল তাও জানি না। তোর মা তো সহজে এদিকে পা দেয় না। সেই কালীপুজার পর এসেছিল তারপর আরেকটা কালীপুজো এসে গেল।

সবাই ভাল আছে দিদিমা। বাপী আর মুন্না সারাদিন খাটাখাটনি করে আর সন্ধ্যেবেলায় ফুটপাতের পাঠশালায় পড়ে।

পড়ে? কি পড়ে?

তা জানি না। খাতা বই সেলেট নিয়ে পড়তে যায়। কটা দিদিমণি ওদের পড়ায়। দিদিমণিরাই বই কেতাব দিয়েছে।

ভাল। এবার হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। তোর রিক্সাটা ফুটের ওপর তুলে রাখ। বসার গদীটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়।

চাঁদু শুতে গেল রাজকুমারের পাশে। ননীবালার তখন বেশ জ্বর। মাঝে মাঝে কাশিতে দম বন্ধ হবার মত হয়েছে। তার কাশির শব্দে চাঁদুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসে জিজ্ঞেস করল তোর শরীর বুঝি খুব খারাপ?

হাঁরে। কদিন থেকে দেহের তাপই কমছে না।

হাসপাতালে গিয়েছিলে?

যাইনি, কাল যাব মনে করেছি।

মনে করলে হবে না, কাল তোকে আমিই হাসপাতালে নিয়ে যাব।

আচ্ছা। তুই ঘুমো তো।

তোর কাশির শব্দেই তো ঘুম হচ্ছে না। তুই শুয়ে পড়।

শুলেই কষ্ট বেশি। শেষ রাতটা বসেই কাটাতে হয় রে বাবা। আর কদিন। এবারে যেতে পারলেই বাঁচি। মরবার আগে আমাকে গাঁয়ে নিয়ে যাস রে চাঁদু। এই ফুটে যেন মরে পড়ে না থাকি, বুঝলি।

পরেরদিনই ননীবালাকে রিক্সায় তুলে চাঁদু হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, হাঁপানি হয়েছে। সাবধানে যেন থাকে। ইন-জেকশন দিয়ে বললেন, রোজ একটা করে ইনজেশন দিও। কোন কমপাউণ্ডারকে টাকা দিলেই দিয়ে দেবে। সাতদিন পর আবার রোগীকে যেন নিয়ে এস।

সেদিনের ইনজেকশনটা দেবার ব্যবস্থা করে চাঁদু তার রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাতে ফেরার পথে মরিবালাকে বলে এল ননীবালার অসুখের কথা। মরিবালার ইচ্ছা ছিল তখুনি ননীবালার কাছে যাবার কিন্তু বিপিন তখন একেবারে শয্যাশায়ী। তাকে একা রেখেও যেতে পারছিল না। চাঁদুকে বলল, কাল সকালেই যাব। তুই তোর বাবাকে খবর দে, তোর মা এসে কদিন দেখা শোনা করুক।

আচ্ছা, বলে চাঁদু ফিরে গেল।

সকালবেলায় সোয়ারী নিয়ে অবিনাশ যাচ্ছিল দক্ষিণ কলকাতায়, তার কাছে চাঁদু অমরকে খবর দেবার কথা বলল। দিদিমাকে রিকসায় তুলে দ্বিতীয় ইনজেকশনটা দিতে নিয়ে গেল।

রাতের বেলার অমর এল পাঁচবালা আর ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কেমন মনে হচ্ছে মা? জিজ্ঞেস করল পাঁচবালা।

একটু ভাল মনে হচ্ছে। কাশির দমকটা একটু কম। কাল রাতে একটু ঘুমিয়েছি। যাই বলিস বউমা, তোর ছেলে হবে সোনার ছেলে। অমন ছেলে আর কজনের হয়। আমাকে কি সেবা করছে তা আর বলাব নয়।

অমর চাল ডাল কিনে নিয়ে এল বাজার থেকে।

পাঁচবালা শাশুড়িকে বলল, তুই চুপ করে শুয়ে থাক মা, আমি ভাতে ভাত করে ছেলেমেয়েদেব খাইয়ে দি।

অমর আর পাঁচবালা কদিন থেকেই গেল।

পাঁচটা ইনজেকশন দেবাব পর ননীবালা বেশ সুস্থ বোধ করতে থাকে। এবার রাজকুমারের হেপাজতে তাকে রেখে রওনা হবার সময় পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এল মরিবালা। এসেই বলল, বিপিন মারা গেছে।

এরকম মৃত্যু ফুটপাতে হামেশাই হয়ে থাকে তাতে কারও চোখের জল পড়ে না। সামান্য আহা উঁহু করার পর বেওয়ারিশ লাশ চলে যায় লাশকাটা ঘরে। কিন্তু মরিবালার ক্ষেত্রে সবই আলাদা। সে এসে সবাইকে অনুরোধ জানাল, বিপিনের যেন সৎকার করা হয়। বিপিনের লাশ বেওয়ারিশ বলে যেন লাশ-কাটা ঘরে না পাঠানো হয়।

কিন্তু টাকা দরকার। অনেক টাকা! কে দেবে?

অমর এগিয়ে এসে বলল, আমরা সবাই মিলে দেব। বিপিনকাকাকে কাঠের চুল্লীতে নিমতলায় সৎকার করব।

চাঁদু আর তারক ফুটপাতের জমিদারদের কাছে হাত পাতল চাঁদার জন্য। এক ঘন্টার মধ্যে প্রায় একশ' টাকা চাঁদা উঠল। অমর বলল, আর বেশি কিছু লাগলে আমি দেব। তোরা চল বিপিনকাকার সৎকার করে আসি।

হরিনাম করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে হাজির হয়ে আরেক ফ্যাসাদ। ডাক্তারের সার্টিফিকেট না হলে মরা পোড়ানো যাবে না। সবার মুখ শুকিয়ে গেল। তাদের এই অবস্থায় মরিবালা ছুটে গেল তার ঝুপড়িতে। এর আগে

কবার হাসপাতালে বিপিনকে নিয়ে গিয়েছিল। তখনকার কতকগুলো চিকিৎসার কাগজপত্র এনে দেখাল। অনেক বলা কওয়ার পর মৃতদেহ দাহ করার অনুমতি পেল।

মরা পুড়িয়ে মাঝরাতে সবাই ফিরে গেল নিজের নিজের আস্তানায়। মরিবালা সবার অলক্ষ্যে কোথায় যে গেল তা কেউ জানল না।

তিন চারদিন পর মরিবালা বাসনপত্র কাঁথা-কম্বল একটা রিকসায় চাপিয়ে হাজির হল রাজকুমারের আস্তানায়।

ননীবালা বেশ সুস্থ হয়েছে। রাতের বেলায় হাঁপানির টান আর নেই। তবে কাশিটা সম্পূর্ণ সারেনি।

এবার হাসপাতাল থেকে খাবার ওষুধ দিয়েছে। নিয়ম করে তাই খাচ্ছে।

মরিবালা ননীবালার পাশে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে বলল, সব মিটিয়ে এলাম দিদি।

ননীবালা বলল, ভাল করেছিস।

তোর শরীর কেমন আছে?

একটু ভাল। এখন কি করবি?

তারকের সঙ্গে কথা বলে গাঁয়ে ফিরে যাব। শরীকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সেখানেই থাকব।

ঝুপড়িটা কি করলি? কাকে দিলি?

বেচে দিয়েছি। সাড়ে ছ'শ টাকা দাম পেলাম, দিয়ে দিলাম। ধরে রাখতে পারলে হাজার টাকা পাওয়া যেত। আর দেরি করতে চাইনি। তাই যা পেলাম তাতেই ছেড়ে দিলাম। না দিয়েই বা কি করব দিদি, আমার তো পেটের ছেলেও নেই, ঘর সংসারও নেই।

বেশ করেছিস।

মরিবালা কদিন থেকে গেল। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ত। তারকের সঙ্গে আলোচনা করত। একদিন শেয়ালদহ থেকে ফিরে এসে বলল, আজ একটা লোককে দেখলাম। মনে হল সেই পীরবাবা। বিপিনকে ওই পীরবাবাই টেনে নিয়ে গিয়েছিল ডাকাতি করতে। একেবারে বুড়ো হাবরা হয়ে গেছে। লাঠিতে ভর করে গেটের সামনে ভিক্ষে করছিল।

কিছু জিজ্ঞেস করেছিস?

না। তবে লোকটাকে ঠিক চিনেছি দিদি। ওর কপালের কাটা দাগটা দেখেই চিনেছি। কতলোকের সর্বনাশ করেছে, আমার বিপিনটাকে আধ মরা করে ছেড়েছিল। ভালই শাস্তি হয়েছে। শুনেছিলাম দশ বার বছরের জেল হয়েছিল।

ভিখিরিকে দশটা তো পয়সা দিতে পারতিস।

ঘেন্নায় দেইনি। বদমাইশটা আল্লার নাম করে, ডাকাতি করে, খুন করে,

পাপীকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে। বেশ হয়েছে বদমাশটার।

বলতে বলতে মরিবালা থেমে গেল।

ননীবালা আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল।

মরিবালাও বুড়ো হয়ে এসেছে। যে তেজ নিয়ে একদিন থানায় গিয়েছিল, সে তেজ আর নেই, যে মনের জোর নিয়ে বিপিনের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিল সে মনের জোর আর নেই, যে যৌবনের প্লাবন ছিল তার দেহে তা শুকিয়ে গিয়েছে, মেয়েমানুষের চেহারাটা আছে, আর মেয়েমানুষের দেহের গঠন আর নেই। শুকনো স্তনকে কোনরকমে ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে ঢেকে লজ্জা নিবারণ করা ভিন্ন অন্য কোন চিহ্নই নেই তার দেহে।

একই অবস্থা ননীবালার। জীর্ণশীর্ণ দেহ, বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট, দেহের চামড়াটা হাড়গুলো ঢেকে রেখেছে, গাল তুবড়ে গেছে। অনেকগুলো দাঁত স্থানচ্যুত হয়েছে, মাথার চুল উঠে গেছে প্রভুত পরিমাণ। যা আছে তার অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে।

ননীবালা, মরিবালা, আরও কত বালা কলকাতার ফুটপাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাঁচার আশায়। কেউ এসেছিল জোতদার মহাজনদের অত্যাচারে ও শোষণে, কেউ এসেছিল গ্রাম্য জীবনের বেকারত্ব সহ্য করতে না পেরে, কেউ এসেছিল শরিকী সংঘর্ষে, আবার কেউ এসেছিল অপ-রাজনীতির ধাক্কায়, যে কোন কারণেই আসুক তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল উদর পূর্তি। বাঁচার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসকে ব্যঙ্গ করে বিপিনের মত কত শত বিপিন পথের ধারে, ফুটপাতে, আস্তাকুঁড়েতে প্রাণ হারিয়ে সমাজ ও সভ্যজনের অবহেলায় লয় পেয়েছে তার সঠিক হিসাবে আজও হয়নি। কবে হবে অথবা হবে না তাও কেউ-ই বলতে পারে না।

কৃষি ভিত্তিক সমাজে এই সব অনাদৃত মানুষরা আজও মাটির মায়া ছাড়তে পারেনি। আজও চিন্তা করে সেই ফেলে আসা গ্রামকে যার সঙ্গে তাদের ছিল নাড়ীর সম্পর্ক।

মরিবালা ফিরে যেতে চায় তার গ্রামে। ননীবালাও মাঝে মাঝে ফিরতে চেয়েছে কিন্তু তাদের উত্তর পুরুষরা ভুলেই গেছে তাদের অতীত,পেটের জ্বালায়। তারা ভুলে গেছে তাদের পিতৃপুরুষদের, ভুলে গেছে তাদের পূর্বপুরুষরা কোন সময় গ্রামের সহজ সরল আনন্দময় জীবন যাপন করত। অনেকে ভুলে গেছে নিজেদের গ্রামের নাম, অনেকে মায়ের পরিচয় দেয়। বাবার নামটা বলতে পারে না। অবক্ষয়িত সমাজের এই ছবি দৃষ্টিকটু, নিন্দনীয় ও অপ্রার্থিত হলেও তবুও এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে পথের সন্ধান পায়নি ওরা। জীবনের ধারাবাহিকতাকে আঁকড়ে ধরে আছে কেবল মাত্র বাঁচার আশায়। জান্তব এই বাঁচা যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, এই কথাটিও তারা মানে না ও বোঝে না। জানার চেষ্টাও করে না, বোঝার চেষ্টাও করে না।

রাজকুমার ধীরস্থির পোড়-খাওয়া লোক। জওয়ান বয়সে কলকাতায় এসেছিল পেটের ধান্দায়। তারপর কয়েক দশক চলে গেছে। এই কয়েক দশকেও সে সংসার গড়তে পারেনি। কিন্তু বুঝেছে সংসার করা আর সংসার গড়া একটা কাজ নয়। ছেলেমেয়ে বড় হলেই তারা ছুটে বেড়ায়। তারাও তারই মত বাঁচতে চেয়ে অপমৃত্যুকে সাদরে ডেকে নেয়। আগে সে মনে করত সন্তান সংখ্যা বেশি হলে তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, তার পাশে তার সন্তানরা সংসার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু কার্যকালে দেখল, সবাই ছুট হয়ে যাচ্ছে নিজের নিজের পেটের তাড়নায়।

অমর তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার ছেলেটা যে তার পাশে আছে এটাই তার ভরসা। চাঁদু তার সামর্থ মত সেবা যত্ন করে ঠাকুরমা আর ঠাকুর-দাদাকে। সংসার গড়ার একটা নেশা জেগেছে চাঁদুর মনে। তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করছে সে। একদিন সেও হবে হয়ত একটা রিকসার মালিক। একটা হলেই আরও একটা করতে কতক্ষণ।

চাঁদু স্বপ্ন দেখে না। সে সত্যকেই স্বীকার করে মেহনত করে।

সত্যি সত্যি একদিন চাঁদু রিক্সা কিনল। রাজকুমার যেমন একটা ভাঙ্গা ঠেলা কিনে তা মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেছে ঠিক তেমনি ভাবে চাঁদুও ভাঙ্গা রিক্সা কিনে মেরামত করে নিয়েছে। ভাঙ্গা ঠেলা আর ভাঙ্গা রিক্সার জন্য বাজার অনুসারে বেশি দাম দিতে হয়েছে দুজনকেই কারণ নতুন রিক্সার লাইসেন্স পাওয়া দুষ্কর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। তাই বেশি দামে ভাঙ্গা গাড়ি কিনতে হয়েছে।

চাঁদু গাড়ি নামিয়েই রাজকুমারকে বলল, চল দাদু, তুই আর দিদিমা গাড়িতে বসবি, আমি তোদের নিয়ে যাব আমার বাবা-মার কাছে।

তুই পাগল হলি নাকি। আমরা বসব গাড়িতে আর তুই টানবি। তা কি হয় চাঁদু।

হতেই হবে। তোদের গাড়িতে বসিয়ে সাইত করব। নে ওঠ গাড়িতে। বলে রাজকুমার আর ননীবালার হাত ধরে টানতে টানতে রিক্সায় বসিয়ে চাঁদু টানতে থাকে।

কোথায় যাবি ?

তোর ব্যাটার কাছে।

সেতো অনেক দূর। অত দূর যেতে পারবিনি রে চাঁদু। আর দরকার নেই, ফিরে চল। সাইত তো হয়ে গেছে। দরকার নেই যাবার।

চাঁদু হেসে বলল, দাদু তুমি তো ঠেলা নিয়ে যেতে। আদ্দেক রাস্তা থেকে ফিরে আসতে বুঝি। ওই ঠেলাটা আছে, তাই তো এখনও কিছু কিছু পাচ্ছ, তারক দাদু ভাগে তো দেয়। আমিও রিকসা টানতে টানতে অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে গেলে সোয়ারী পয়সা দেবে কি ? পেট চলবে কি ? তোমরা বুড়ো

হয়েছ। আমরা তো জওয়ান মরদ। এখন যদি রিকসা টানতে না পারি তা হলে হাত-পা জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ননীবালা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এখানে এসেছিলাম রে একবার।

কি করতে এসেছিলে দিদিমা ?

মিছিলে। তখন তোর বাবার হাত ধরে এসেছিলাম। উঃ সে কত লোক। বললে, গরীবদের আর দুঃখ থাকবে না। ছাই। আমাদের দুঃখ কি কখনও কমে, ভগবান আমাদের কপালে যা লিকেছে তা কি কেউ খন্তাতে পারে।

নদেরচাঁদ যেন হুঁস ফিরে পেল।

বলল, এখানে কতবার এসেছি তার ঠিক নেই। তোর মতই বোধহয় মিছিলে এসেছিলাম প্রথম। সেই গতবার নাদুবাবুর ভোটের সময়। ওরা ভোট ভোট করে। কত যে মিথ্যা কথা বলে তার ঠিক নেই। আমরা বোকা লোক ওদের কথায় বিশ্বাস করে নাজেহাল হই। ওই যে হেঁপো গোবর্ধন, সে তো ইট খেয়েই মরল, হেঁপোর বউটা ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় ঘুরছে। গিয়েছিল নাদুবাবুর কাছে, কি বলেছিল জানিস ? বলেছিল, আমি কি তোদের মারামারি করতে বলেছিলাম। কয়েক বছর পর পর এও যেন এক সার্কাসের খেলা। সেই খেলায় আমরা হলাম বাঁদর আর কুকুর। ওদের কথায় নেচে নেচে খেলা দেখাই। লোক জমায়েত হয় খেলা দেখে। আমরা আবার সেই ফুটপাতেই ফিরে যাই আর ওরা ভোট পেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ওদের ভোটের খেলায় আর যেতে হয় ! বাপ্‌রে।

রাজকুমার এতক্ষণ নাতি-ঠাকুমার কথা শুনছিল। কোন মন্তব্য করেনি।

একটু গাড়ি থামা চাঁদু।

গাড়ির হাণ্ডেল শক্ত করে ধরে চাঁদু বলল, কেন দাদু ?

পঁচিশ পয়সার বিড়ি আর একটা ম্যাচ নিয়ে আয়। এতটা রাস্তা কি শুধু মুখে যাওয়া যায়। কি গো বউ, তোর কিছু চাই কি।

একটা পান খেতে ইচ্ছে করছে। আমার তরে একটা সাদা মিঠে পান আনিস চাঁদু।

রাজকুমার বিড়ি ধরিয়ে বলল, চ চাঁদু।

ননীবালা পান চিবোতে থাকে।

বেশিদূর এগোতে পারল না চাঁদুর রিক্সা।

ধর্মতলায় এসে দাঁড়াতে হল।

বিকট চিৎকার আর ছোটাছুটি।

চাঁদু তাড়াতাড়ি রিক্সাটা একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়ে বলল, তোরা নেমে দাঁড়া। সামনে জোর হাঙ্গামা দেখছি। আর পারা যায় না। রোজ রোজ একটা না একটা হাঙ্গামা এখানে লেগেই থাকে। দেখ না, গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে অফিসবাবুরা ছোটাছুটি করছে। গলির মধ্যে ঢুকেছে। এমন

শালার নচ্ছার শহর কোথাও আর নেই। এতে আমাদের রুটি রোজগার বন্ধ হয় তা কি শালারা জানে না। এক টাকার জায়গায় দেড়টাকা ভাড়া চাইলেই বলে, তোরা চোর, গলা কাটা। কিন্তু এই সব হাঙ্গামায় আমাদের পেটে যে গামছা বাঁধতে হয় সে কথা ওরা কখনো বলেও না, আহা-উঁহু-ও করে না। একটু চা খাবি তোরা। চল ওই গলিটার কাছে, ওখানে কটা চায়ের দোকান আছে ফুটে, এক ভাঁড় করে চা খেয়ে জিরিয়ে নিতে পারবি।

রাজকুমার এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। সে জানে হাঙ্গামা আরম্ভ হলে সহজে থামে না। তাই সহজ ভাবেই বলল, তার চেয়ে চল আমরা ফিরে যাই। এখুনি গলির মধ্যেও পুলিশ তেড়ে আসবে।

তা আসুক। আমরা ঠিক জায়গায় আছি। ঠিক পেঁছে যাব। কলকাতার রাস্তা তো আমার মোটামুটি জানা আছে, তোদের ভয়ের কিছু নেই।

ভয়ের না থাকলেও সেদিন আর ওদের যাওয়া হয়নি।

রাজকুমার যখনই শুনল, ফুটবল খেলা নিয়ে দু'দলের মারামারি মাঠ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পেঁছেছে তখন যাওয়া বন্ধ করা বিনা কোন সৎ উপায় তাদের ছিল না।

ফিরতি পথে চাঁদু বলল, কারা মারামারি করছে জানিস! ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে বোধহয় মহমেডান হেরে গেছে।

ননীবালা বলল, খেলায় হার-জিত তো আছেই।

ওই যে সব মোছলমান মোল্লা ওরা তো এদেশের লোক নয়, ওরা একটা হুজুগ পেলেই মারামারি করে। সবাই বলে শালারা পাকিস্তানী, এখানে মারদাঙ্গা করে লুঠপাট করে। হারা জেতায় থোরাই কেয়ার করে। আসলে সেই সমর দোকানপাট লুঠপাট করে রাস্তায় ছিনতাই করে। এটা ওদের ধান্দা। মুখে বলে মার শালা হিন্দুদের আর মারার চেয়ে লুটপাট করার দিকে নজর থাকে বেশি। আজও তাই হচ্ছে।

ননীবালা আশ্চর্য হয়ে বলে, আমাদের গাঁয়ে তো অনেক মোল্লা ছিল, কখনও তো এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না। তোর মা-ই তো মোল্লার বেটি, তাকে নিয়ে বিশ বছরের বেশি ঘর করছে আমার ছেলে।

চাঁদু হেসে বলল, আমরা গরীব ভিখারী। আমাদের তো কোন জাত ধর্ম নেই দিদিমা। আমাদের জাতের হদিশ করতে হলে পেটের দিকে তাকাতে হয়। জাত ধর্ম ওই পেটে বুঝলি। আমার মা হিন্দুও নয়, মোল্লাও নয়। আমার বাবা হিন্দুও নয় মোল্লাও নয়। আমাদের জাত আর ধর্ম হল আমরা গরীব। আমাদের মন্দির মসজিদ হল নিজেদের পেটের সেবা, তাই তোর গাঁয়ে এখনও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি, হবেও না।

রাজকুমার বলল, ঠিক বলেছিস চাঁদু। ভগবান আমাদের পেট, পেটে ভর্তি

থাকলেই আমাদের জিউ ঠাণ্ডা থাকে ভগবানও তুষ্ট হয়।

চাঁদু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ কিছু ভাল উপায় হবে। যখন বাবার কাছে যাওয়াই হল না তখন বর্ষার টিপগুলো ধরতে হবে। বেশ জোর বৃষ্টি নামলেই বাবুদের রিক্সা দরকার হবে বেশি, আমাদের আয়ও হবে বেশি।

চাঁদু ছুটতে ছুটতে বউবাজারের আস্তানায় ননীবালা আর রাজকুমারকে নামিয়ে রেখেই বেরিয়ে পড়ল, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

রাত এগারটা নাগাদ চাঁদু ফিরে এসে ননীবালার হাতে আঠাশটা টাকা দিয়ে বলল, খরচখরচা বাদে এক বেলায় এই পেলাম।

ননীবালা টাকা গুণে চাঁদুর হাতে দিয়ে বলল, তুই রেখে দে।

না, তুই রেখে দে দিদিমা। জমিয়ে জমিয়ে কালাচাঁদের হারিয়ে যাওয়া জমি আবার আমি খুঁজে বের করব। দুটো বছর। দুটো বছরেই সব ঠিক করে নেব।

চাঁদুর অনেক আশা।

আবার গ্রামে ফিরে যাবে, জমি চষবে, চাষীর জীবন ফিরে পাবে।

রাজকুমারও আশা করেছিল তার ঠেলার আয় থেকে কালাচাঁদের হারিয়ে যাওয়া জমি ফিরিয়ে আনবে কিন্তু তা পারেনি। তার উপার্জনের যে কেন্দ্র বিন্দু তার দেহ, সেই দেহটি সবার আগে অপটু হতে থাকে। তবু চাঁদুর আশা তাকে আনন্দ দান করেছিল। একথা তার ছেলে অমর কখনও প্রকাশ করেনি, অমর তার মত সহজে ফুটপাতের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল, ফুটপাতের ধারাবাহিকতা মেনে ছিল, চাঁদু তা পারেনি। এটাই রাজকুমারের সন্তোষের কারণ।

কদিন পরে পাঁচবালা এসেছিল ননীবালার কাছে।

অমরের কথা বলল, তার ছোট ছেলে আর মেয়ের কথা বলল, সবশেষে বলল, সুবীর বিয়ে দিতে হবে মা।

তোর ওপাড়ায় পাত্র পেলি নি?

পাত্র তো হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ঘর করার মত পাত্র না পেলে বিয়ে দেওয়া কি ভাল হবে। হাত বাড়িয়ে পাত্র আমিও ধরেছিলাম। ঘর করতে পারিনি। আসিমের অত্যাচারে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, ফিরে আসতে হয়েছিল তোর ছেলের কাছে। তাও তো বিশ বাইশ বছর ঘর করলাম। তাই ভাবছি খুকীকে এমন লোকের হাতে দেব যাতে সে ঘর করতে পারে।

সেইদিনই নমিতা এসেছিল বিকেলে। পাঁচকে দেখেই বলল, কেমন আছিস বউদি।

ভাল।

তোর ছোট ছেলে আর মেয়ে সুবী কেমন আছে।

পাঁচ হেসে বলল, ওদের, কথাই তো মাকে বলতে এসেছি। তোর দাদা

তো কিছুই দেখে না। রাজের জোগাড় দেয়, সারাদিন খেটে খুটে এসে দেয় টানা ঘুম। ছেলেটা বড় হয়েছে সেও বাপের সঙ্গে যায় রাজের জোগাড় দিতে কিন্তু ভাবনা হল মেয়েটাকে নিয়ে। তার জন্য একটা ভাল পাত্র খুঁজছি রে বিন্তি। আছে তোর খোঁজে।

আছে। তবে বাগ্‌দীর ছেলে।

বাগ্‌দী আর বামুন আমার কাছে সব সমান। ছেলে ভাল হলেই হল। আমরা তো সারা জীবন ফুটে কাটালাম, যদি তার মাথা গোঁজার একটা জায়গা থাকে তা হলেই সবচেয়ে ভাল। নিশ্চয়ই কিছু কাজকর্ম করে।

কাজকর্ম করে। ধাপার মাঠে টালির একটা আস্তানা আছে। তবে অনেক দাবী। পারবি দিতে?

দাবী না শুনে কি করে বলি।

এক নম্বর হল নগদ দু'হাজার টাকা। দুই নম্বর হল মেয়ের কানে আর ছেলের হাতে সোনা দিতে হবে, তিন নম্বর হল একটা সাইকেল। ছেলে ক্যানসার হাসপাতালে কাজ করে। ট্রাম-বাস ভাড়া দিয়ে সে হাসপাতালে যেতে নারাজ, অনেক খরচ, একটা সাইকেল পেলে সে নিজেই স্বাধীন মত যাওয়া আসা করতে পারবে।

দাবীর কথা শুনে পচির মুখ শুকিয়ে গেল। এমন পাত্র পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে ধরা। ফুটপাতের জমিদাররা এমন পাত্রের কথা চিন্তাও করতে পারে না।

নমিতা বলল, শুনলি তো, এবার বল পারবি?

তোর দাদার সঙ্গে কথা বলব। বড় ছেলের সঙ্গে কথা বলব। তারপর তোকে বলব।

রাজকুমারের পরিবারে কথাটা চাউড় হয়ে গেল।

নমিতাকে জিজ্ঞাসা করল রাজকুমার, এত দিলে খুকী ঘর করতে পারবে তো?

সেটা ওর ভাগ্য। কত রাজামহারাজার ঘরে বিয়ে দিলেও তো ঘর করতে পারে না।

তা তো ঠিক তবে আজকাল যে ভাবে বউ মরছে তাতেই ভয় পাচ্ছি।

সেটা তো পরের কথা। এসব দিতে পারবি?

ভেবে দেখি, অমর আর চাঁদুর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

আলোচনা করে স্থির হল, চাঁদু কালাচাঁদের জমি ফিরে পেতে যে টাকা জমিয়েছে সেটা থেকে নগদ টাকাটা দেওয়া হবে। রাজকুমার তার ঠেলা বিক্রি করে আংটি আর কানের ফুল দেবে। সাইকেল অমর।

বিয়ের খরচ।

সংগ্রহ করতে হবে।

নমিতার ঘটকালিতে বিয়েটা স্থির হল। পাকাপাকি কথাও হল। সমস্যা দেখা দিল কোথায় বিয়েটা হবে? ফুটপাতের জমিদারদের সম্বন্ধ করে বিয়ে তো কখনও হয় না। গ্রামে যখন এদের শেকড় ছিল তখন সম্বন্ধ করে, ঘটকালি করে বিয়ে হত। ফুটপাতের অলিখিত আইনে সম্বন্ধ করে বিয়ে এতকাল ছিল অভাবনীয়।

তাহলে গ্রামেই ফিরতে হয়।

সেখানেও তো মাথা গোঁজার জায়গা নেই। কালাচাঁদের ভিটে উদ্ধারের সদিচ্ছা যেমন ছিল রাজকুমারের তেমনি আছে নদেরচাঁদের। রাজকুমার তার ইচ্ছা পূরণের কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলেও নদেরচাঁদ যেভাবে অর্থ সঞ্চয়ে মন দিয়েছিল তাতে আশা করা গিয়েছিল কালাচাঁদের ভিটে হয়ত ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু খুকীর বিয়েতে তার সঞ্চিত টাকা বরপণ দিতে হবে, এরপর আবার চলবে উদয়াস্ত পরিশ্রম, আবার হয়ত দু'বছর পর সুযোগ আসবে তবে সেটাও অনিশ্চিত। নিজের বোনের বিয়ে। এই বিয়েতে বাবুদের বাড়ির বিয়ের মত যদি হৈ-হুল্লোর করতে হয় তা হলে টাকার মায়া করা চলবে না। কিন্তু টাকা কোথায়। টাকা জুটলেও ঠাঁই জোটে না। তাই এখন চিন্তা কোথায় খুকীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

ননীবালা বলল, তারকের কাছে যা অমর। মরিবালা দেশে ফিরে গেছে। তার হিস্যা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে। মরিবালাকে বলে তাব বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

রাজকুমার বলল, গ্রামে নিয়ে গেলে বিয়ের খরচ বাড়বে, গাঁয়ের জানাশোনা সবাইকে নেমন্তন্ন করতে হবে। ভোজ দিতে হবে। এত খরচ করার টাকা কোথায় পাবিরে হতভাগা?

কথাটা মিথ্যে নয়। কলকাতার আশেপাশে কোন ব্যবস্থা করতে পারলে এই সব হাঙ্গামা কম হবে। খরচও কম হবে। শেষ পর্যন্ত তা করা যায় নি।

নদেরচাঁদ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অর্থ সংগ্রহ করছে বোনের বিয়ের জন্য। বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে পাঁচ ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে মরিবালার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাল। রাজকুমার আর ননীবালা জিনিসপত্র নিয়ে বিয়ের আগের দিন গ্রামে পৌঁছাবে স্থির করেছিল আর নদেরচাঁদ বিয়ের দিন সকালে মালপত্র কিনে পৌঁছবে। সব কিছুই স্থির। প্রোগ্রাম অনুসারে কাজও হয়ে চলছিল কিন্তু বিয়ের দিন নদেরচাঁদ না পৌঁছোনতে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। অমর স্থানীয় ভাবে জিনিসপত্র কিনে নিজের বড় ছেলেকে শাপশাপান্ত করেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সন্ধ্যারাতে বিয়েটা দিয়ে সে-ই যাবে কলকাতায় নদেরচাঁদের সন্ধান করতে। অমর রাতের বেলায় রাজকুমারের পুরানো আস্তানায় এসে নদেরচাঁদের দেখা পেল না!

বর্ষাকাল।

আকাশে ঘন কালো মেঘ।

নদেরচাঁদ কাল বোনের বিয়েতে যাবে তাই কিছু মোটা উপার্জনের আশায় শিয়ালদহ চত্বরে অপেক্ষা করছিল। বৃষ্টিতে জলে বিপন্ন দূরের যাত্রী পেলে আয় মন্দ হবে না মনে করেই বসেছিল।

এমন সময় একজন খদ্দের এল।

হাঁরে উল্টোডাঙ্গায় যাবি ?

বাবু, এই বৃষ্টিতে আর কোথাও যাব না। গাড়ি তুলে দেব।

দেখ, বৃষ্টিতে আমরাও কষ্ট পাচ্ছি। তোকে ডবল ভাড়া দেব।

ডবল ভাড়ার লোভে নদেরচাঁদ রাজি হল। বলল, উঠুন গাড়িতে।

একটা মাল আছে। রেলের কুলিরা মালটা নামিয়েছে। একটা বাক্স। চল, তুলে নিতে হবে। বলেই খদ্দেরটি রিক্সায় উঠে বসল। নদেরচাঁদ লোকটাকে ভাল করে দেখল। বেশ ভদ্রঘরের লোক বলেই মনে হল। সুন্দর চেহারা। তবে গালে একটা কাটা দাগ আছে।

রেল চত্বর থেকে ধরাধরি করে দুজনে বাক্স রিক্সায় তুলল।

উল্টোডাঙ্গার একটা বস্তির কাছে এসে লোকটি বলল, দাঁড়া।

লোকটি রিক্সা থেকে নেমে নদেরচাঁদের হাতে কুড়ি টাকার একটা নোট দিয়ে বলল দাঁড়া, এসে গেছি। বাড়ি থেকে লোক ডেকে আনি বাক্সটা তুলে নিতে।

নদেরচাঁদ বসে রইল।

লোকটি গেল তো গেলই।

ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। রাতও বাড়তে থাকে। লোকটা আর ফিরে এল না দেখে নদেরচাঁদের সন্দেহ হল। একবার মনে করল বাক্স ওখানে নামিয়ে রেখেই চলে যাবে। আবার ভাবল, না বাক্সটা থানায় জমা দেওয়াই ভাল। অনেক ভেবে চিন্তে নদেরচাঁদ উল্টোডাঙ্গার থানায় হাজির হল। তখন আকাশ ফর্সা হতে আরম্ভ করেছে।

থানায় বাক্স নামিয়ে ডায়েরী লিখে বের হবার আগে কেমন একটা পচা গন্ধ বের হতে থাকে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বাক্সের ডালা ভেঙ্গে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা মেয়ের লাশ। দু'টুকরো করে কাটা। নদেরচাঁদ আটকে গেল থানায়। তাকে নানা ভাবে জেরা করে রিক্সা থানায় আটকে রেখে পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে নদেরচাঁদকে নিয়ে গেল সেই বস্তির কাছে, সেখান থেকে শেয়ালদহ স্টেশন, সেখানে রেলের কুলিদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হল, নদেরচাঁদের আর ছুটি মিলল না। সারাদিন কেটে গেল পুলিশের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। সন্ধ্যাবেলায় পুলিশ বলল, তোকে গ্রেপ্তার করলাম।

আমার কি কসুর হুজুর।

কসুর জানি না, তদন্তে তোকে দরকার হবে, তুই পালালে খুনীকে সনাক্ত করবে কে।

হুজুর আজ আমার বোনের বিয়ে। সকালে বাড়ি যাবার কথা। সবাই ভাবছে। তারা জানতেও পারবে না কি ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনারা ডাকলেই আমি আসব। গাড়িটা আমার নিজের। এই দেখুন লাইসেন্স। গাড়ি জামিন রইল।

অনেক কাঁদাকাটি করে হাতে পায়ে ধরে নদেরচাঁদ যখন মুক্তি পেল তখন রাত বারটা বেজে গেছে। দেশে যাবার শেষ গাড়িটাও চলে গেছে, নিরুপায় নদেরচাঁদ হাঁটতে হাঁটতে হাজির হল শেয়ালদহ স্টেশনে সকালের প্রথম গাড়িটা ধরতে।

নদেরচাঁদ যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন বেশ বেলা হয়েছে। আকাশ গত-কালের মতই মেঘে ঢাকা। তাকে দেখে সবাই উৎসাহিত হল। সবাই জিজ্ঞাসা করল, বিয়ের সময় সে কেন আসতে পারেনি। পাঁচ তো সারারাত জেগে কাটিয়েছে, ননীবালা বার বার চোখের জল মুছেছে। রাজকুমারের স্থির বিশ্বাস কোন অঘটনে আটকে গিয়েছিল তাদের চাঁদু। নইলে চাঁদুর মত ভাল ছেলে নিজের বোনের বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না, এতো হতেই পারে না। রাজকুমার হাত ধরে নদেরচাঁদকে পাশে বসিয়ে পাঁচকে বলল, বউমা, তোর ছেলেকে আগে কিছু খেতে দে। দেখছিস না, ওর মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে ঘটনাটা সবাই শুনল।

তবুও যে দারোগাবাবু দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে এটাই ভাগ্য।

বিয়ের হাঙ্গামা মিটে গেছে। নতুন বর গোপাল দাস খুকীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। পরিবেশটা বেশ শান্ত। এমন সময় মরিবালা এসে বলল, আমি তোদের সঙ্গে কলকাতা যাব।

আবার কলকাতা যাবি কেন ?

এখানে থাকা মুস্কিল। তারক আমার সহায়। তার বউ বামনী আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমি যে ভাগীদার। ভাগীদারকে কে সহ্য করে বলত। ওদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করতেও পারব না, আবার পঞ্চায়েতের বিচারও চাই না। একটা পেট খেটে খুটে খেলে কলকাতার ফুটপাতে শেষ কটা দিন কাটাতে পারব।

ননীবালা চুপ করেই থাকল।

কথাটা তারকের কানে উঠেছিল। সে এসে বলল, তুই কেন কলকাতা যাবি কাকী ?

এখানে ভাল লাগছে নারে তারু। এতদিন কলকাতায় ছিলাম, এখন এখানে এসে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ শোন্, তুই আমার অনেক করেছিস, আমি আর ফিরে আসব না। আমার ভাগ তোকে দিয়ে যেতে চাই। লেখা পড়াটা করে নে।

মরিবালার এই প্রস্তাব তারক সহজে মেনে নিতে পারেনি। তবে মরিবালা

বারবার তাকে যখন বুঝিয়ে বলতে থাকে তখন তারক বলল, বেশ লেখাপড়া কর, তবে এখন তোর ভাগ তোরই থাকবে তুই মরলে আমি পাব।

বেশ তাই হবে।

রাজকুমারও তারকের প্রস্তাবে রাজি।

তারক যখন শুনল মরিবালার গ্রাম ছেড়ে যাবার পেছনে আছে তার স্ত্রী বামনীর চক্রান্ত তখন ক্ষিপ্তের মত বামনীকে পেটাতে থাকে। ছুটতে ছুটতে বামনী এসে পড়ল রাজকুমারের কাছে, বলল, আমাকে বাঁচা কাকা। আমি তো কাকীকে তাড়াতে চাইনি। কার কাছে শুনেছে আমি কাকীকে তাড়াচ্ছি।

ঘটনা আর এগোতে পারেনি।

সবার সালিশে তারক শান্ত হল, কিন্তু মরিবালা লেখাপড়া করে কলকাতায় রওনা হল। তাকে আর গ্রামে আটকে রাখা গেল না!

খুকীর বিয়ের পর সকালে অমর ফিরে এল আবার তাদের পুরানো আস্তানায়।

জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। একই ভাবে চলছে রাজকুমার পরিবারের জীবন যাত্রা।

মরিবালা ননীবালার পাশে জায়গা করে নিয়েছিল।

সকালবেলায় কাজের খোঁজে গিয়েছিল তার পুরানো পাড়ায়।

কাজ সে পেয়েছিল।

পুরানো দিনের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। সবাইকে হাসি মুখে কুশল সংবাদ দিল।

অমর তার ছোট ছেলেকে ননীবালার কাছে রেখে পাঁচবালার সঙ্গে আবার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল দক্ষিণের হাজরা পার্কের পাশে। এবারও সে ঝুপড়ি বেঁধেছে কিন্তু এবার জায়গা পেতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। ফুটপাতের জমিদারীতে ভাগীদারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছিন্নমূল বেকার মানুষের দল বিহার, ওড়িশা এমন কি দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান থেকে এসে সাড়ে তিন-হাত জায়গার আশায় ভিড় করেছে। তবে অমরের দাবী কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেনি, তার দাবী কায়েমী সত্ত্বের।

পাঁচি এখন কালী মন্দিরের কিছুটা দূরে আদি গঙ্গার সেতুর ধারে তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসে। আনাজ সংগ্রহ করে অমর বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে। মোটা-মুটি আয় হয়। যাদের জীবনের প্রয়োজন থাকে কম, যাদের অভিলাষ স্তিমিত তারা পরণের একখানা বস্ত্র ও দিনান্তে একমুঠো ভাত পেলেই আর কিছু চায় না। অমর সারাদিন মেহনত করে সন্ধ্যাবেলায় সমবয়সীদের সঙ্গে বসে, লাইট পোস্টের নিচে বসে তাস খেলে। রাত হলেই ভাল মানুষের মত ঝুপড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে পাঁচির পাশে শুয়ে পড়ে।

নদেরচাঁদ বেশ কয়েকদিন পুলিশের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার উপার্জনে টান ধরেছে। তবু খুনের ফয়সালা যাতে হয় তার জন্য পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ত্রুটি করেনি।

সেদিন মরিবালা সন্ধ্যাবেলায় এসেই শুনল ননীবালা গেছে শিয়ালদহ স্টেশনে। রাজকুমারও গেছে সঙ্গে। তাদের আস্তানায় বসেছিল অমরের ছোট ছেলে। মরিবালাকে দেখেই বলল, পিসি তুই স্টেশনে যা। ঠাকুমা তোকে যেতে বলেছে।

কেন যাবে তা বলতে পারেনি অমরের ছোট ছেলে।

মরিবালা দক্ষিণের স্টেশনে আসার মুখেই দেখতে পেল রাজকুমার আর ননীবালা একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হল। লোকটার হাতে একটা বাঁশের লাঠি। আর লাঠির মাথায় ঝুলছে একটা টিন। একেবারে টাইপ ভিখারি। মরিবালা এগিয়ে গেল।

বুড়ো লোকটাও এগিয়ে গিয়ে ট্রেনের যাত্রীদের কাছে তখন ভিক্ষা চাইতে থাকে।

মরিবালা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা-চেনা মনে করল। এগিয়ে এসে ভাল করে তাকে দেখল। যেবার ডাকাত দলকে ধরিয়ে দিয়েছিল সেবার যে লোকটা পীরের পেয়াদা হয়ে এসেছিল বিপিনকে ডাকতে এ যেন সেই লোক। গালভরা দাড়ি। মাথায় একটা নোংরা টুপি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি তবুও খুব অচেনা মনে হল না। মরিবালা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

বুড়ো লোকটা তখন ট্রেনের যাত্রীদের সামনে তার টিনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, দশটা পয়সা দাও বাবা। আল্লা তোমার মঙ্গল করবে, বলে ভিক্ষা চাইতেই মরিবালা বেপরোয়া ভাবে সামনে এসে বলল, মিঞা। তুমি তো আল্লার বান্দা।

বুড়ো মুখ তুলে বলল, হাঁ মা।

আল্লা তার বান্দার খোরাক জোটায় না। তুমি আল্লার নাম করে কেন ভিক্ষা চাইছ। এতে আল্লার অসম্মান হয়। আল্লার কাছে ভিক্ষা চাও মিঞা। মানুষের কাছে ভিক্ষা কেন চাইছ?

বুড়ো থমকে গেল। এমন কথা ওরকম মহিলার কাছে আশা করেনি। সামনে গিয়ে হেসে বলল, আল্লা মানুষের হাত দিয়েই তার রহম বিলিয়ে দেয় মা। মানুষ হল আল্লার সবচেয়ে বড় পয়দা।

মরিবালা ঝাঁজের সঙ্গে বলল, আমরা মানুষ! তা বটে? বিপিনের ঠ্যাং ভাঙ্গার সময় একথা তোমাদের মনে ছিল না। বিপিনকে মানুষ মনে করনি তুমি?

কোন্ বিপিন?

ডাকাতি করতে যার নৌকা নিয়ে যেতে সেই বিপিন।

বুড়ো আর দাঁড়াল না। জনসমুদ্রে মিশে গেল।

মরিবালা হাসল।

ননীবালা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, ভিখিরির সঙ্গে কি কথা বল-ছিলে মরি?

এই বুড়ো ছিল ডাকাতদের দলে। পীরসাহেব ডাকাতের পেয়াদা। ওদের খপ্পরে পড়ে বিপিন পা হারিয়েছিল। বিপিনকে পিটিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে ছিল যারা তাদের দলে ওই বুড়োটা ছিল। ডাকাতির মামলায় জেল খেটে এসেছে। বুড়ো বয়সে আর কোন পথ না পেয়ে আল্লার নাম ভাঙ্গিয়ে পেটের দানা জোগাচ্ছে। আমি ওকে চিনতে পেরেই বলছিলাম, আল্লার বান্দা তুই। তোর খোরাক তো আল্লা জোটাবে। মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইলে আল্লার অপমান হয়। এই সব শুনে ওই ডাকাতটা পালিয়ে গেল। ওসব কথা থাক্। পাপের শাস্তি ওরা পাচ্ছে ও পাবেই। এবার তোরা কেন ডেকেছিস তাই বল।

বলছিলাম, তুই কাজ করতে যাস অনেক দূরে। এই মহল্লায় অনেক কাজ পাবি। অতদূর আর যাসনে। এখানেই দেখে শুনে কাজ নে। আমাদের কাছেই থাক সারা দিন। অত হুটোপুটি করে সাত সকালে আর দৌড়াসনি।

রাজকুমারও চায় মরিবালা তাদের সঙ্গেই থাকুক।

নদেরচাঁদ কদিন খুব ব্যস্ত।

একবার থানায় একবার আদালতে হাজিরা দিতে দিতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। সারা দিনের ট্রিপ মার খাচ্ছে কদিন ধরে। পুলিশ আসামী পাকরাও করেছে। তাকে নদেরচাঁদ সনাক্ত করেছে। সে যখন ডায়েরী করেছিল তাতেই উল্লেখ ছিল গালে কাটা দাগ। কোথায় সেই দাগ তাও তখন লিখিয়ে দিয়েছিল থানায়। পুলিশ আসামীকে খুঁজে বের করেছিল। নদেরচাঁদ সনাক্ত করে ছিল। এরপর বড় আদালতে দায়রা বিচার।

মরিবালা জিজ্ঞেস করেছিল, হারে চাঁদু, পুলিশ নাকি খুনীকে ধরেছে।

হাঁ পিসি ধরেছে। এ বার দায়রার বিচার হবে।

মেয়েটা কে!

ওই আসামীর বউ। বড়ঘরের বড় কথা। বুঝলি। আমাদের ঘরে বউ পছন্দ হল না, ছেড়ে দিলাম। বউ আবার একটা বিয়ে করে অন্যত্র সংসার পাতল। সোয়ামীও নতুন করে বউ খুঁজে নিয়ে সংসার পাতল। খুনোখুনিটা আমরা করি না পিসি। এরা বড়লোক। বিয়ের সময় দশ হাজার নগদ, গয়না, আসবাব দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল বউটাকে। জানিস পিসি ওই সব বড়লোকদের ক্ষিদে কেউ মেটাতে পারে না। যত পায় ততই লোভ বাড়ে। তিন বছর হয়নি এর মধ্যে মেয়ের বাবার কাছ থেকে আরও দশহাজার আদায় করেছে, তাতেও ওর লোভ মেটেনি। আরও দাও। দিতে পারেনি। তাই মেয়েটার গলা কেটে বাক্সে ভর্তি করে চালান করেছিল। এখন মজা বুঝুক।

মরিবালা গম্ভীরভাবে বলল, বড়লোকদের কথা কেন বলছিস। তোর পিসে কষ্ট করে কয়েক বিঘে জমি করেছিল। এই পর্যন্ত। ভোগ করতে পারেনি। ভাইরা ওকে ঠকিয়ে সব নিজেদের করে নিয়েছে। তোর পিসেও অঘোরে ফুটপাতে মরল, আমিও বাঁদীগিরি করে পেট ভর্তি করছি।

আমিও ভাবছি পিসি খুকীর কথা। ওর বিয়েতে অনেক খরচ করেছি শেষ পর্যন্ত আমার বোনটা বাঁচবে তো?

কেন বাঁচবে না। বড়ঘরের বড় কথা। তাই ওদের ঘরে খুনখারাবি হয়। আমাদের ঘরে খুনখারাবি হবে না। খুকীকে তাড়িয়ে দিতে পারে। এর বেশি আর কি করবে। খুকীর কথা ভেবে মন খারাপ করিস নি। তোর তো আরেক ফ্যাসাদ সাক্ষী দিতে হবে।

সাত আটদিন পুলিশ তো চাকার মত ঘোরালো। ও কদিন একটা পয়সাও উপায় করতে পারিনি। এবার বিচার হবে। ক'দিন ঘুরতে হবে কে জানে!

খোরাকি দেয় না?

না। পিসি দিলেও আমি পাই না। বোধহয় আদালতের বাবুরা খেয়ে নেয়।

মরিবালা ভাবছিল পুরানো দিনের কথা। ডাকাত ধরে দিতে আর বিপিনকে বাঁচাতে সেও অনেকবার থানায় গিয়েছিল। এরজন্য কোন পুরস্কার তো পায়নি। উপরন্তু ডাকাতদের হাত থেকে তার স্বামীকে বাঁচাতেও পারেনি।

কি ভাবছিস পিসি?

ভাবছি, তুই এত দিন বিয়ে করিস নি কেন?

খাওয়াব কি? নিজের পেটের ভাত জোটাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে আমার! বাপ্‌রে। জানিস পিসি, বাবার ঠাকুরদার বাবা কালাচাদের বিষয় সম্পত্তি ছিল। তা গ্রাস করেছিল মহাজনরা। গতর খাটিয়ে আমার ঠাকুরদার কর্জা কয়েক শ' টাকা যেমন তিন পুরুষেও শোধ দিতে পারেনি। আমার ঠাকুরদা তাই সব জমিজমা মহাজনকে দিয়ে বাপ্‌ঠাকুরদার কর্জা শোধ করেছিল। কলকাতার ফুটপাতে ঘর বেঁধেছিল তাও প্রায় চল্লিশ বছর আগে। ভেবেছিলাম, কালাচাঁদের হারিয়ে যাওয়া জমিটা কিনে নেব। তাও হল না। খুকীর বিয়েতে সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। আবার চেষ্টা করছি যাতে কালাচাঁদের ভিটেটা কিনতে পারি। কি হবে কে জানে।

মরিবালা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, কিনলেও ভোগ করতে পারবিনে চাঁদু। দশ ভূতে তোর সম্পত্তি খাবে। টাকাই জলে যাবে।

পরোয়া করি না। জলে যাক আর সমুদ্দরে যাক সবই আমার কাছে সমান কিন্তু ভিটেটা উদ্ধার করতেই হবে। তারপর যদি বয়স থাকে বিয়ে করব। তবে নিজের পছন্দমত।

বিয়ে করলে শউরের কাছ থেকেও তো কিছু নিতে পারিস !

চাঁদু হেসে বলল আমাদের মত ফুটপাতের জমিদারদের শউর থাকে না পিসি। আমরা শাউড়ির মেয়েকে বিয়ে করি। ওদের পকেট আমাদের মতই খালি। দুই সন্ধ্যে সবাইয়ের জোটেও না। নগদ টাকা ? ছোঃ। ওসব বড়লোকের কথা। যাক ওসব কথা। আমাদের বিশ মন তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। তুই আজ বিকেলে কাজে যাবিনি ?

ওপাড়ার কাজ সব ছেড়ে দিয়েছি রে চাঁদু। এ পাড়ায় কাজ তালাস করছি।

বেলা বারটা নাগাদ নদেরচাঁদ রিকসা নিয়ে বসেছিল শেয়ালদহ কোর্টের সামনে। কয়েকজন পুলিশ প্রায় পঞ্চাশজন বিভিন্ন বয়েসী মেয়ে পুরুষকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল আদালতে। এমন দৃশ্য রোজই দেখা যায়। নতুন কিছু নয়। বিনা টিকিটে যারা রেলে যাতায়াত করে তারা যখন আটক পড়ে তখন এইভাবে পুলিশ তাদের নিয়ে যায়। আদালতে বিচার হয়। বিচারক মুখ তুলে তাকায় না অপরাধীদের দিকে। ছোটবাবুর দেওয়া তালিকা অনুসারে জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে না পারলে দু'মাস পর্যন্ত জেল। যারা বিনা টিকিটের যাত্রী তাদের শতকরা আশীজনেরই ভাড়া দেবার ক্ষমতা থাকে না। গ্রামাঞ্চল থেকে আহার্যের সন্ধানে শহরে আসে। শহরে আসার মত রেস্ত তাদের থাকে না। তাই তারা ঘরের গাড়ি চেপে শহরে আসে পেটের ধান্দায়। বিনা টিকিটের যাত্রীদেরও শতকরা নব্বইজনকে জেলে পাঠানো হয়। দণ্ডিত অপরাধীদের এসবে বিকার নেই। গ্রামেও তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে, শহরের জেলখানায় তাদের বন্দী জীবনে দু'মুঠো ভাত তাদের জোটে। এরপরই ওরা ছাড়া পেয়ে শহরের পথে নেমে পড়বে। তখন পেটের ধান্দায় সৎ অসৎ যে কোন পথ ওরা অবলম্বন করবেই।

নদেরচাঁদ অত বোঝে না।

তবে এইটুকু বোঝে। কয়েকদিন ওরা খেতে পাবে। খালাস পেলে বাইরে এসে ফুটপাতের জমিদারীতে হামলা করে আশ্রয় খুঁজে নেবে।

আজ নদেরচাঁদ অবাক হয়ে দেখল বন্দীদের আদালতে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন তার পাশাপাশি চলছে মীনু, হেঁপো গোবরার বউ।

রিকসাটা অন্যের হেপাজতে রেখে এগিয়ে গেল নদেরচাঁদ।

আরে মীনু বউদি যে ! এদের সঙ্গে কেন ?

একজন বন্দীর সঙ্গে মীনু কথা বলছিল। নদেরচাঁদের গলার শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। চেহারাটা চেনা চেনা মনে হল।

চিনতে পারলে নি ? আমি চাঁদু, নদেরচাঁদ। সেই যে হেঁপোদার সঙ্গে ভোট-ভোট খেলতে গিয়েছিলাম।

মীনু এবার চিনতে পারল।

ওটা কে?

আমার ননদাই, আমার সঙ্গে মাছের ব্যবসা করে। জামিন হতে হবে।

এতে আর জামিন হয় না। জরিমানা হয়, না দিতে পারলে জেল হয়।

কত টাকা জরিমানা হয়?

ঠিক নেই। হাকিমের ইচ্ছা। বিশ পঞ্চাশ একশ কখনও আরও বেশি।

মীনুর মুখ শুকিয়ে গেল।

ভয় পেও না বউদি। দুটোর সময় বিচার হবে। তখন কি হয় জানতে পারবে।

দুটোর সময় বিচার ফল জানা গেল। চল্লিশ টাকা জরিমানা, দিতে না পারলে সাতদিনের জেল।

ঠিক দুটোর সময় নদেরচাঁদ এসে দাঁড়িয়েছিল আদালতের দরজায়। হাকিমের আদেশ শুনে মীনুর বুক ধরফর করতে থাকে। অত টাকা কাছে নেই।

কত আছে তোমার কাছে।

পঁচিশ টাকা।

পনের টাকা আমি দিচ্ছি। জরিমানাটা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে এস বউদি। রসিদ দেখালে তবে তোমার কুটুমকে ছাড়বে।

টাকা জমা দিতে গিয়ে মীনু ফিরে এল।

কি হল বউদি?

আরও পাঁচটাকা আট'আনা চাই।

কেন?

যে রসিদ লিখছে তার পাঁচ টাকা আর পেয়াদার আট আনা। না দিলে রসিদ হবে না। আসামীকে জেলে পাঠিয়ে দেবে।

নদেরচাঁদ এরকম জুলুমের বিরুদ্ধে কিছু বলবে বলেও বলতে পারেনি। নিজের তহবিলে পাঁচ টাকা আট আনা না থাকায় তার সঙ্গী রিক্সাওলার কাছ থেকে কটা টাকা ধার করে নিয়ে দিল মীনুর হাতে।

এবার তোমার কুটুমকে ছাড়িয়ে আন।

আধ ঘণ্টা পরে মীনু তার নন্দাই বিশুকে নিয়ে ফিরে দেখে নদেরচাঁদ স্ট্যাণ্ডে নেই। কোন ভাড়া পেয়ে চলে গেছে।

মীনু তো নদেরচাঁদের ঠিকানাও জানে না। কি করবে। পাশের রিক্সা-ওলাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল চাঁদু রোজই এখানে আসে সোয়ারী তুলতে।

চাঁদু রাতের বেলায় ফিরে এসে ননীবালাকে বলল, ভোটরঙ্গ দেখলাম ঠাকুমা। ভালই লাগল।

আবার ভোট।

হাঁগো হাঁ। তোরা তো শুনবি না, সেই যে সেবার ভোটের বাজারে নেমে পড়েছিলাম! সে সময় হেঁপো গোবরা লাঠির চোটে মরেছিল। তার বউ মীনুর সঙ্গে দেখা হল শেয়ালদহ ইস্টিশনে। সেদিন গোবরা না মরে যদি আমি মরতাম তাহলে কি হত বল দেখি।

ও কথা বলিস না চাঁদু। আমি তো তোকে মানা করেছিলাম। দেখলি তো মজা। মীনু এখন কেঁদে বেড়াচ্ছে আর ভোটের বাবুরা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুরছে।

ননীবালার কথা আর শেষ হল না। উল্টোদিকের ফুটপাতে তখন গলাবাজির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। নবীনের বউ আর সমীরের বউ তখন ঝগড়ার তুঙ্গে। নবীনের বউয়ের পক্ষে সহধর্মীর সংখ্যা বেশি হলেও সমীরের বউ হাতে ঝাঁটা নিয়ে যখন তেড়ে যাচ্ছে নবীনের বউয়ের দিকে তখন পুরুষরা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু কোন পুরুষই কোন পক্ষকেই সমর্থন করছে না ঝগড়া থামাবার চেষ্টাও করছে না। নবীন আর সমীর একটু দূরে বসে তখন বিড়ি টানছে আর মজা দেখছে। ঝগড়ায় অংশগ্রহণকারী সবাই মেয়ে।

নদেরচাঁদ বলল, ওদের কথা শুনিসনি। ওরা একটাও মানুষ নয়। কালরাতে তাড়ি খেয়ে এসে সমীর বউয়ের কাছে ভাত চেয়েছিল, বউ ঝামটা দিয়ে বলেছিল চাল কিনে দিয়ে যাসনি, কি খেতে দেব তোকে। তাড়ির ঝোঁকে সমীর কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিল তার বউকে।

ননীবালা বলল, বুঝলাম।

কি বুঝলি। ওই নবীন সমীরকে নিয়ে যায় তাড়ি আর চোলাইয়ের ঠেকে। সমীরের বউয়ের যত রাগ পড়ল নবীনের বউয়ের ওপর। তারই ফয়সালা করছে দুজনের বউ।

ননীবালা মৃদুস্বরে বলল, যার পেটে ভাত নেই সে যদি সোয়ামীকে তাড়ি খেতে দেখে তাহলে রাগ হবে বই কি। কিন্তু সমীর তো এমন ছিল না।

নবীন ওকে নেশা করতে শিখিয়েছে। তাই সমীরের বউ ঝাঁটা নিয়ে তাড়াচ্ছে নবীনের বউকে। তুই নিজের মরদ সামলা, অন্যের ঘরে আগুন কেন দিবি। এই সবই তো বলেছে। ওদের ঝগড়া আজ শেষ হবে না।

ননীবালা কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

ঝগড়াটা কতদূর গড়াতো বলা কঠিন।

রাস্তা চলা লোকের ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, পুলিশ আসছে।

ব্যস সব ঠাণ্ডা। যে যার মত পথ ধরল।

পুলিশের হাঙ্গামায় কেউ কি যেতে চায়।

সমীরের বউ যেমন ফোঁসাচ্ছে নবীনের বউও তেমনিই ফোঁসাচ্ছে। প্রত্যেকই প্রতীক্ষা করছে। নিজের নিজের স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

এসব পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কেউ অপরের বিষয়ে নাক ঢোকায় না তবুও

আলোচনাটা সবাই করে। আলোচনাটা এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে এগিয়ে যায়। যার সূত্রপাত নবীন আর সমীরকে নিয়ে তা গড়িয়ে অবনী পর্যন্ত সবার অজান্তেই পেঁছে গেছে।

অবনী কেন তার বোন বুচিকিকে মারল তা নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে।

বিধবা পদ্মরাণীর ছেলে অবনীর বয়স প্রায় বিশ বছর। গ্রাম থেকে পেটের দায়ে ছেলে আর এক মেয়ের হাত ধরে পদ্মরাণী এসেছিল কলকাতায়। আশ্রয় নিয়েছিল ফুটপাতে।

পদ্মরাণী বাড়ি বাড়ি বাসন মাজা কাপড় কাচার কাজ নিয়ে মোটামুটি এক বেলার অন্ন সংস্থান করেছিল। অবনীও জোগারের কাজ করে দিন গেলে বার চোদ্দ টাকা নিয়ে আসত। হাঙ্গামা বাধল চোর বাসুকে নিয়ে।

পদ্মরাণীর মেয়ে বুচিক যুবতী। প্রৌঢ়া নয়। যৌবনের সীমায়। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে দেহের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে দেরি করল না। চোর বাসু তাকে ফুসলে ফাসলে নিয়ে গেছে হরতুকী বাগানের বস্তিতে। রাতের বেলায় মা ও ভাইকে ফুটপাতে রেখে বুচিক চলে যায় চোর বাসুর কাছে। আবার খুব সকালে ফিরে এসে কাজের বাড়িতে চলে যায়।

অবনী শুনেছিল, চোখে দেখেনি। যেদিন চোখে দেখল চুপি চুপি তার বোন যাচ্ছে হরতুকী বাগানের দিকে সেদিন আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না। ছোট একটা লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করল বুচিককে। বুচিক স্বীকার করল না তার সম্পর্ক রয়েছে চোর বাসুর সঙ্গে। বুচিক গেল থানায়। জখম দেখাল। ডায়েরী করল ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

ভোর রাতে অবনীকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ।

বিকেলবেলায় অবনী ফিরে এল। তখন তার ট্যাক খালি। পুলিশ তার ট্যাকের সব কিছু হাতড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

অবনী কদিন পরে গিয়ে উঠল গড়িয়াহাটের মোড়ে। আশ্রয় নিল ফুটপাতের ফেরীওলাদের দোকানের মাচাং-এর নিচে। সেখান থেকেই সে কাজে বের হত। কাজ থেকে ফেরবার সময় খাবার জোগাড় করে আনত। পদ্মরাণী প্রথমে অবনীর খোঁজ করেনি। পরে যখন খোঁজ করে জানল অবনী গড়িয়াহাটে আছে তখন খুঁজতে খুঁজতে হাজির হল সেখানে।

আবার লাগল লড়াই।

এবার হাতে নয় মুখে।

অবনী জিজ্ঞাসা করল মাকে, তুই কার কাছে থাকবি?

পদ্মরাণী বলল, মেয়ের কাছে।

অবনী হেরে গেছে। পদ্মরাণীকে বলল, বুচিককে ভাল হতে বলবি। তা না হলে তোদের খুন করে ফাঁসি যাব।

পদ্মরাণী কোন জবাব না দিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশন হয়ে শেয়ালদহ পেঁছল।

সমীর আর নবীনের কেচ্ছা শেষ করতে না করতেই পদ্মরাণীর প্রসঙ্গ নিয়ে ফুটপাতের জমিদার গৃহিনীরা রসাল আলোচনা আরম্ভ করল। তাও বেশি-ক্ষণ নয়। বাবুদের বাড়ির কাজের সময় পেরিয়ে যাবে তাই সবাই নিজের নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ল।

বউবাজারের ফুটপাতে রাতের বেলায় যখন সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় তখন জমিদার বাড়ির গৃহিণীরা তিনখানা ইঁটের উনুন জেলে রান্নায় বসে। রাত দশটার মধ্যে রান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সকালের জন্য পান্তা রেখে যে যার মত শুয়ে পড়ে।

রাজকুমার কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিল জওয়ান ছেলেরা সবাই ভুলে গেছে তাদের এই দীনতাপূর্ণ জীবনের কৃচ্ছতা। এই জীবনকে তারা মেনে নিয়েছে। আগে অনেকেই চিন্তা করত আবার তারা ফিরে যাবে তাদের গ্রামে। আজকাল সে সব চিন্তা যেন লোপ পেয়েছে। রাজকুমারের বয়সী যারা তারা গ্রাম থেকে এসেছিল। মাটির সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল তাই গ্রামের মাটির গন্ধ তাদের আকর্ষণ করত কিন্তু বর্তমানের জওয়ান ছেলেমেয়ের অনেকেরই জন্ম কলকাতার ফুটপাতে তাই তাদের গায়ে আর গ্রামের গন্ধ নেই।

শহরের ভাল জিনিসগুলো রপ্ত করতে না পারলেও খারাপগুলো সহজেই রপ্ত করেছে।

অনেক রাতে চোলাই খেয়ে টলতে টলতে আসে নিমু, দাসু, অনন্ত ইত্যাদি।

মানসিক কোন বিকার নেই এদের। সারাদিন যা উপার্জন করে তার বেশির ভাগই দিয়ে আসে চোলাই মদে। যাদের বউ আছে তাদের সঙ্গে বউদের লেগে যায় ঝগড়া। মাঝরাতে পুরুষরা যৌন তৃষ্ণা মেটাতে বউকে ডাকাডাকি করলে তখন ঝগড়া চরমে ওঠে।

শেষ রাতে কাউকে কাউকে চুপি চুপি উঠে যেতে দেখে রাজকুমার। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরানো শহরে অলিগলির শেষ নেই। ওরা ওঁত পেতে বসে থাকে। সকালের ট্রেন ধরতে যারা যায় তাদের অসহায় একক ভাবে পেলেই তাদের সব কিছু ছিনিয়ে অলিগলি ঘুরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে। এদের সংখ্যা খুব কম হলেও এমন জীবনযাত্রার পদ্ধতি রাজকুমার যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিল তখন দেখেনি।

চোলাইখোর স্বামীরা অনেক রাতে ফেরে। কখনও কখনও ফেরেও না। নর্দমায় রাত কাটায়। তাদের বউরাও সতীলক্ষ্মী নয়। তারাও প্রথম রাতে খদ্দের ধরে বেড়াতে কসুর করে না। অবশ্য সবাই নয়, অনেকেই।

রাজকুমার ভাবে এমন তো ছিল না আগে।

ননীবালা এসব দেখে চিন্তিত হয় নদেরচাঁদের জন্য। এদের দলে নদের-চাঁদ যদি যোগ দেয় তা হলে তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে। শুধু তাই

নয় চোলাই খেয়ে নিমাই আর আজিজুলের পেটের ব্যামো হতেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তারা আর ফিরে আসেনি। লিভার পচে তারা মারা গেছে।

রাজকুমারের মত ননীবালাও ভাবে এরা সবাই চাষার ঘরের ছেলে এরা একবারও মাটির টানে ঘরে ফেরার কথাও ভাবে না। ফুটপাতের ছেলেরা জানেই না বোধহয় কোথায় ছিল বাপ-পিতামহদের আস্তানা, আশ্রয় এবং নিরিবিলি ঘর! অনেকেই বলতে পারে না বাবার নাম! পরিচয় দেয় মায়ের নামে।

অমরের ছোট ছেলেটা ফুটপাতের পাঠশালায় পড়ে, কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। নিজের নাম লিখতেও পারে। আরও হয়ত পড়তে পারত কিন্তু পাঠশালা উঠে যাওয়াতে আর পড়াশোনা করতে পারেনি। যখন রাজকুমারের কাছে আসে তখন ক্ষোভ জানায়। এ ক্ষোভ অক্ষমের আর্তনাদ। দক্ষিণের এক পুলিশ কর্মচারীর বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়েছে। খেয়ে দেয়ে পঁচিশটা টাকা পায়। মাইনে পেলেই তা এনে দেয় পচির কাছে। অমর জানে সবই কিন্তু কখনও পচির কাছ থেকে ছেলের টাকা চায় না। কখনও জানতেও চায় না কত টাকা বেতন পায় তার ছোট ছেলে।

আবার ভোটের বাজনা বেজেছে।

আবার শুভাকাঙ্খীরা ফুটপাতের জমিদারদের কাছে আনাগোনা করছে। মিছিল আর সভা চলছে সব প্রার্থীর। দেওয়ালে পোস্টার। রাতের বেলায় পোস্টার মেরে গেলে বিকালবেলায় লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো ছিড়ে বস্তা বন্দী করে ফুটপাতের নব প্রজন্মরা। তিরিশ পয়সা দরে ছেঁড়া কাগজ বিক্রির মরশুম তো ভোটের বাজারে। রোজই নতুন নতুন পোস্টার সেঁটে দিয়ে যায়। রোজই হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে যায় আর ওরা সেগুলো সংগ্রহ করে বস্তা ভর্তি করে রাখে।

এবার ভোটের বাজার বড়ই গরম।

এখানে ওখানে বোমা ফাটছে। পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়াচ্ছে। যাদের কাছে ট্রানজিসটার আছে তারা বিবিধ ভারতীর গান শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে খবর শোনে। আগের মত অজ্ঞ নয় এরা। এবার চুক্তি করে নেমেছে কজন। রোজ দিতে হবে ডবল। একটা জোগাড়ের রোজ তের টাকা, দিতে হয় ছাব্বিশ টাকা। চা পাঁউরুটি আর এক প্যাকেট বিড়ি আর একটা দেশলাই অবশ্যই চাই। নইলে কেউ ভোটের কাজ যাবে না। বাবুরা এতেই রাজি। তবে এদের কোন নির্দিষ্ট দল নেই। সকালে তেরঙ্গা নিয়ে যারা বের হয় তারাই আবার বিকালে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে বের হয়। কখনো গেরুয়া ঝাণ্ডাও হাতে তুলে নেয়। সবই পয়সার খেলা।

নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করেছে, বাবুরা আমাদের কোন উপকারই

করবে না। ভোটের বাজারে দু'পয়সা কামাই যদি না করি তা হবে বেকুবি। রোজ রোজ তো ভোট হবে না। এতকাল বাবুরা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়েছে, এবার যতটা পারি টাকা না বানিয়ে ছাড়ব না।

ছিনতাই করতে গিয়ে সমীর আর নবীন দুজনেই আটক ছিল জেলখানায়। হঠাৎ তারা ছাড়া পেয়েছে। সোজা এসে তাদের বউদের পাশে জায়গা নিয়েছে।

যাক বাঁচা গেল। কবে এলি সমীর ?

এই তো কাল রাতে। বিকেলবেলায় ছাড়া পেয়েছি। আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল।

তোর তো দু'বছরের মেয়াদ ছিল। এত তাড়াতাড়ি ফিরলি কি করে।

নবীন গম্ভীর ভাবে বলল, ভোট!

হাঁ। ভোটের বাজারে সমীর নবীনের মত ছ্যাঁচড়া চোর বদমাইশ পাকা খুনীদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে খোলা মাঠ চরে বেড়াতে, ভোটের দালালী করতে আর জায়গা বিশেষ বোমা পিস্তল-ছুরি নিয়ে হামলা করে লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে।

সমীর আর নবীনের কাছে খবর এল কেল্টু নেমেছে ময়দানে।

ডাকাতি মামলার আসামী কেল্টু ছ'বছর জেল খেটে মাস খানেক আগে খালাস পেয়ে এসে সবে মাত্র জেলখানার সাঙ্গাতদের নিয়ে নতুন দল গড়তে নেমেছে এমন সময় ভোট। জেলখানাতেই এই শ্রেণীর কয়েদিরা দল বাঁধে। জেল থেকেই বেরিয়েই একটা ঘাঁটিতে আসে। এদের সবাই এক জেলার লোক নয় কিন্তু একই পথের পথিক। এদের হাতে রাখতে চেষ্টা করে ভোটের বাবুরা। তবে মোটা হাতে না দিলে এরা কাজে হাত দেয় না।

কেল্টু, সাবির আর হাফিজ হল দলের মুখ্য ব্যক্তি। আর সবাই তাদের চেলা চামুণ্ডা। এই তিনজনই দীর্ঘ মেয়াদ খেটে বেরিয়েছে। এরা বেপরোয়া, পয়সার বিনিময়ে যে কোন অকাজ করতে পারে।

সমীর আর নবীন ঠিক করেছে এবার ভোটের আগে বেশ ধুমধাম করে কালীপুজোটা সেরে নেবে।

মনে করা আর কাজ করা ওদের কাছে সহজ ব্যাপার।

সাজগোজ করে পুজো শেষ করে হাতে রয়ে গেল বেশ মোটা টাকা। ওদের পকেট গরম। রাতের বেলায় চোলাইয়ের আড্ডা বসে, তাসের জুয়া খেলে। বাকি রাতটা ফুটপাতে কাটিয়ে সকালবেলায় বের হয় ভোটের দালালী করতে। তবে নবীন আর সমীর ঠিক করেছে এবার ফলস্ ভোটের জন্য আগের রেট আর চলবে না। এবার ভোট পিছু তিরিশ টাকা দিতে হবে। যারা ফলস দেবে তারা পাবে পঁচিশ আর সমীরের পাঁচ। বুথ দখল করতে হলে, ভোটকেন্দ্রে সবার আগে লোক জমায়েত করতে হলে প্রত্যেক কাজের উপযোগী টাকা অগ্রিম দিতে হবে। পুলিশ ধরলে তার হ্যাপা নেতাদের পোয়াতে হবে। নইলে

বপক্ষের ক্যাম্পে হাঁটা দেবে।

রাজকুমার সব শুনেছে। বেশ শঙ্কিত হয়েছে কিন্তু তার করার কিছু নেই। তার ভোট দেবার অধিকারও নেই! তারা যে এদেশের অধিবাসী অথবা নাগরিক এমন কোন প্রমাণও তাদের নেই।

নন্দেরচাঁদ এসে বলল, এবারও বাবুরা আগের বারের মত কথা বলছে জানিস দাদু, বোধহয় ভোট হয়ে গেলেই আমরা ঘর ফিরে পাব, জমি ফিরে পাব আর পাব কাজ। এই কথাগুলো গেল বারও আমাদের শুনিয়েছিল। ভোটের শেষে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল তোরা বুড়ো আঙ্গুল চুষতে থাক। এবার বাছাধনদের ত্রিভুবন দেখতে হবে। যত সব বদমাইশরা দু'দলে জুটেছে। এবার একটা দুটো মরবে না রে দাদু, গাদা দিয়ে মরবে।

রাজকুমার মৃদুস্বরে বলল, চল আমরা গ্রামে ফিরে যাই রে চাঁদু। শহর আর সহ্য করতে পারছি না। এখানে পেটের ভাত কোনরকমে সংগ্রহ হয় কিন্তু শান্তি নেই।

চাঁদু হেসে বলল, আর দু-একটা বছর অপেক্ষা কর দাদু। কালাচাঁদের জমি উদ্ধার করার মত টাকা এখনও জোটেনি। গ্রামে যাব মান নিয়ে। ভিক্ষে করতে নয়।

অতদিন কি আমি বাঁচব!

কেন বাঁচবি না। জানিস দাদু, তোকে বাঁচিয়ে রাখছি তোকে তোর বাবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। খুকীর বিয়ে দিতে না হলে এতদিন একটা কিছু করতে পারতাম। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। বুঝলি তো।

সব বুঝেও সাহস পাচ্ছি না। ভরসা করেছিলাম তোর বাবার ওপর কিন্তু বিয়ে পাগল হয়ে অমর আমাদের দুঃখটা ভুলেই গেল।

চাঁদু জোর দিয়ে বলল, আমি ভুলব না দাদু। দেখছিস না আমি বিয়েই করলাম না এতদিন। প্রতিজ্ঞা করেছি কালাচাঁদের জমি ফিরে পেলে তবেই বিয়ে করব।

তা হলে আর তোর বিয়ে হবে না। মাথার চুলে পাক ধরবে, দাঁত পড়বে। আমার মত তোর চেহারা হবে। তারপরে যদি কালাচাঁদের ভিটেতে গিয়ে বসতে পারিস তখন আর বিয়ের সময় থাকবে না। কেউ আর তোর ঘর করতে আসবে না। কালাচাঁদের ভিটের ঘর খালিই থাকবে।

তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক দাদু। তবে মরণকাল অবধি আমি চেষ্টা করব।

চেষ্টা করা ভাল।

আর কিছু বললি না তো দাদু।

আর কি বলব ভাই। আমরা এই শহরে এসেছি পেটের দায়ে। কিন্তু মনটা আমার পড়ে আছে সেই গ্রামে। ছোটবেলার কত কথা মনে পড়ে।

অনেক সময় জিউটা হু-হু করে ওঠে। বয়স যখন ছিল তখন মাঝে মাঝে গ্রামে যেতাম। সেখানে মাথা গোঁজার স্থান না থাকলেও যে ভিটে থেকে এসেছিলাম, সেই ভিটেটা দূর থেকে দেখেও শান্তি পেতাম, আবার কষ্টও পেতাম। যাক ওসব কথা। তুই যেন ভোট ভোট করে লাফিয়ে বেড়াস না। মরশুমী এই হুজুগে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি।

তুই পাগল হয়েছিস। ন্যাড়া বেলতলায় দুবার কখনও যায় কি? এখনও মাঝে মাঝে হেঁপো গোবরার বউয়ের সাথে দেখা হলেই মনে পড়ে যায় আগের বারের ভোটের খেলা।

খেলাই বটে। কেউ জেতে কেউ হারে। আমরা যারা খেলা দেখি তারা হাড়ে হাড়ে টের পাই এই খেলার আমেজ। হাঁরে চাঁদু, তোদের সেই হেঁপো গোবরার বউ কি আবার বে করেছে।

জানি না, তবে মনে হয় করেনি। মাথায় সিঁদুর দেখিনি।

সকালবেলায় চাঁদু রিক্সা নিয়ে বেরিয়েছিল। সারাদিনের রোজগার পকেটে নিয়ে দুপুরবেলায় ফিরে ননীবালাকে বলল, দিদিমা খেতে দে।

ননীবালা বিব্রত হল। কোনদিন নদেরচাঁদ এসময় ফিরে আসে না। আজ অসময়ে ফিরে এসে খেতে চাইবে ভাবতেও পারেনি। বলল, এখনও রান্না করিনি।

বেশ করেছিস। তোরাও তো খাসনি। বলেই রিকসার সিট উল্টে টাকা বের করে গেল বাজারে। রুটি তরকারি কিনে নিয়ে এসে বলল, বস, সবাই এক সঙ্গে খাব।

ননীবালা খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, তুই আজ এই সময়ে কেন ফিরে এলি?

গোলমাল দিদিমা। ভীষণ গোলমাল। বাবুদের ভোটের গোলমাল বড়-বাজারের মুখে। ফিরে এলাম। ভাবলাম ধর্মতলায় ট্রিপ ধরব। সে রাস্তাও বন্ধ। লাঠালাঠি বোমাবাজি চলছে। ফিরে এলাম। গাড়িটা তো আমার নিজের। যদি ভেঙ্গে চুড়ে দেয় তা হলে কাল থেকে পেটে ভাত জুটবে না। বুঝলি।

ননীবালা মাথা নেড়ে খেতে থাকে।

রাজকুমার রুটি তরকারি সামনে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। তাকে লক্ষ্য করে নদেরচাঁদ জিজ্ঞেস করল, তুই মুখ নাড়ছিস না কেন দাদু?

দাঁতের ব্যথা। দাঁতের ব্যথায় চোখ টাটানি, কানে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। মুখ নাড়ছি আর যন্ত্রণা বাড়ছে। তাই থামতে হচ্ছে।

কাল দিদিমাকে নিয়ে দাঁতের হাসপাতালে যাবি সকালবেলায়। তোদের পোঁছে দিয়ে আমি ভাড়া খাটতে বের হব।

রাজকুমার মাথা নেড়ে বলল, বেশ।

ননীবালা রাতের বেলায় এপাশ ওপাশ করছিল। ঘুম আসছিল না চোখে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল রাজকুমারের কাতরানি।

নন্দেরচাঁদ অঘোরে ঘুমুচ্ছিল।

দাঁতের যন্ত্রণায় রাজকুমার মাঝে মাঝে ঘুমুচ্ছে আবার জেগে উঠছে।

ওপাশের নতুন সংসারে শিশুদের কাঁদার শব্দ।

নন্দদুলালের সংসার। তার বউ বলতে পারে না কবে তার বিয়ে হয়েছে। তবে বিয়ের পর আট বছরে পাঁচটা ছেলের মা আদুরি এবার ঠিক করেছে হাসপাতালে যাবে আর যাতে ছেলে না হয় তার জন্য অপারেশন করতে। নন্দদুলাল খবর নিয়ে জেনেছে, অপারেশন করলে নগদ টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকাটাই তার লাভ। আদুরিও রোগা রোগা পাঁচটা ছেলে নিয়ে হাঁপসে উঠেছে। বুকের দুধে ছোট ছেলেটার পেটও ভরে না। তার ওপরেরটা এসে ছোট ছেলেটাকে সরিয়ে মায়ের শুকনো স্তনে মুখ দেয়। সন্তানকে স্তন্যপান করানোর স্বর্গীয় অনুভূতি যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

নন্দদুলালের পাশে নতুন এক দঙ্গল যুবক-যুবতী এসেছে। তারা সবাই বিহার থেকে এসেছে। জাতে দোসাদ। আসাটাই তাদের প্রয়োজন ছিল প্রাণ বাঁচাতে। পনের ষোল দিন আগে গ্রামের জোতদারদের লোরিক সেনার গুলিতে বহু মানুষ মারা গেছে, দোসাদদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রাণের ভয়ে তারা গ্রাম ছাড়া হয়েছিল কিন্তু বিহারে থাকতে পারেনি। লোরিক সেনার অত্যাচারের কোন ফয়সালা তো হয়নি। উপরন্তু পুলিশ এসে গ্রামের নিরপরাধ অন্ত্যজ শ্রেণীর জওয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে হাজতে পুরেছে।

ওদের কাছেই নন্দদুলাল সব শুনেছে।

তা হলে আমরা ভালই আছি, কি বলিস আদুরি।

তা বটে। জানটা তো আছে। কিন্তু পেটটা তো আছে। তাই জান গেলেই পেটের জ্বালা আর থাকতোনি।

রাজকুমার বউয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

মাঝরাতে শিশুদের কান্নায় অস্থির হয়ে নন্দদুলাল বড় ছেলেটাকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল।

মারছিস' কেন? লজ্জা করে না তোর। ভাত দিতে পারিস না ভাতার হয়েছিস কেন? বছর বছর ছেলেই বা হয় কেন, বলতে পারিস।

মুখ সামলে কথা বলিস আদুরি। বেশি কথা বললে তোর মুখ ভেঙে দেব।

ওইটুকুই পারিস। মুরোদ তো নেই। বউ ঠাঙ্গানোটাই তোর মুরোদ। অন্য মেয়ে হলে তোর মুখে নুড়ো জেবলে চলে যেত। আমি বলে থেকে গেছি।

পাশের বিহারী দঙ্গলেও তখন কথার লড়াই চলছে। দেহাতি হিন্দি ওরা না বুঝলেও সবাই স্থির জেনেছে ওরা লড়াই করছে কথার পিঠে কথা চাপিয়ে। কে যে কার স্বামী কে যে কার ছেলে কে যে কার মেয়ে তা কেউ জানে না। তবে সবাই যে এক গাঁয়ের মেয়ে ও ছেলে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। ওদের কথায় তা জানাও গেছে।

পরের দিন সকালবেলায় বিহারীদের দঙ্গল লোটা কম্বল নিয়ে উঠে গেল নতুন আস্তানার সন্ধানে। খিদিরপুরের দিকে ওদেরই একজন থাকবার মত ফুটপাত দেখে এসেছে। ওখানে নতুন সাঁকোর কাজ হচ্ছে। মাটি কাটা, মাল বহার কাজ পাওয়া যাবে। এই আশায় ওরা বেরিয়ে পড়ল। জায়গাটা খালি হবার দু'ঘণ্টার মধ্যে জায়গা দখল করল ওপার বাংলার ছিন্নমূল কয়েক-জন সপরিবারে।

ওদের একজনও সহজ পথে এদেশে আসেনি। চোরাপথে এসেছে সীমান্তে ঘুষ দিয়ে। ওদের অভিযোগ মুসলমানরা ওদের জমিজমা যেমন দখল করেছে তেমনি ঘরের সেয়ানা মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল দেশে থাকার কিন্তু আর থাকা গেল না।

এখানে পুলিশ যদি ধরে।

না ধরবে না। খোঁজাডাঙ্গা পার হয়েছি আর ভয় করি না।

ওদের মধ্যে মুরুব্বি একজন বলল, থাকুম না কর্তা। আমাগো কুটুম আছে মুর্শিদাবাদে। তাগো সন্ধান পাইলেই চইলে যামু।

সকালবেলায় বেসরকারী ট্যাক্স কালেকটার এসেই চেপে ধরল ওদের।

তোরা কোথা থেকে এসেছিস?

খুলনের সুন্দরবন থিকা।

ট্যাক্স দিয়েছিস?

কিসের ট্যাকসো গো বাবু?

এখানে থাকতে হলে রোজ এক টাকা। আর নজরআনা ও সেলামি মাথা পিছু তিন টাকা।

এক ট্যাকা তো নেই বাবু।

তা হলে পুলিশে যাবি, টাকা বের কর। চালাকি চলবে না এখানে।

সবাইয়ের ট্যাঁক হাতড়ে যা হল তা ট্যাক্সবাবুর হাতে দিয়ে বলল, দয়া করগো কর্তা। আর খাটাখাটুনি করে তোমাদের পাওনা মিটাব।

মিটল তাদের সাময়িক উৎপীড়ন।

সবাই মিলে পরামর্শ করে কাজের ধান্দায় বের হল। রয়ে গেল কয়েকটি মহিলা। একজনের ছোট ছেলের প্রচণ্ড জ্বর। তাকে ফেলে তো যেতে পারেনি।

ওদেরই একজন এসে ননীবালাকে বলল, কণার পোলাডার গায়ে ত খুব

তাপ। কি করি বলতো দিদি ?

ননীবালা বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাও।

আমরা কলকাতায় নতুন। হাসপাতাল কোথায় জানি না। কোন্ রাস্তায় যাব কওতো ?

ননীবালা তাদের রাস্তা বাতলে দিল।

বিকেলবেলায় ওদেরই একজনের প্রসব বেদনা উঠতেই ওদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ আরম্ভ হল। নদেরচাঁদ সবে রিকসা নিয়ে ফিরে এসেছে। সব শুনে সে বলল, চল, আমার রিকসায়। রোগীকে হাসপাতালে দিয়ে আসি।

হাসপাতালে রুগী ভর্তি করে নদেরচাঁদ ফিরল প্রায় সন্ধ্যাবেলায়। ননীবালা গরম ভাত নামিয়ে নদেরচাঁদকে বলল, গরম গরম চাট্টি খেয়েনে চাঁদু। সেই সকালে বেরিয়েছিলি। এখনও পেটে দানা পড়েনি।

নদেরচাঁদ একটু হেসে বলল, দে। তাড়াতাড়ি দে।

ভাত খেতে খেতে নদেরচাঁদ বলল, একটা মজার ঘটনা আজ দেখলাম। সারা শহর ঘুরলে কত না মজার মজার ঘটনা চোখে পড়ে। তা আর বলে শেষ করা যায় না।

ননীবালা উদগ্রীব ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি ঘটনা।

শুনে কাজ নেই। তোর মন খারাপ হবে।

আমার মন খারাপ হবে। তাতে তোর কি ? বল।

হাওড়া ইস্টিশানে একটা পাগলীকে মাঝে মাঝে দেখতাম।

তাতে কি হল ?

জওয়ান মেয়ে। ছেঁড়া একটা জামা পড়ে বেড়াত। মাস কয়েক আগে দেখলাম একটা কচি বাচ্চাকে বুকের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। নদীর ধারে সিঁড়িতে বসে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে।

ননীবালা বলল, আহা রে। কোন শয়তান ওর সর্বনাশ করেছিল।

আজ হাওড়া ইস্টিশানের ওই পাগলীটাকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক। তারা ওর কোল থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।

ওরা কি গুণ্ডা বদমাশ ?

নারে না। গতকাল ছেলেটা মারা গেছে। ছেলেটা বুকের দুধ খাচ্ছে না দেখে পাগলী একজনকে জিজ্ঞেস করেছিল, ছেলে দুধ খাচ্ছে না। লোকটা দেখে শুনে বলল, তোর ছেলে মরে গেছে। পাগলী বিশ্বাস করল না। মরা ছেলেটাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে কাল থেকে পথে পথে ঘুরছে। বারবার ছেলেটার মুখে স্তন তুলে দিচ্ছে। আর বলছে খা পেট ভরে খা।

আহা রে।

লোকজন ভিড় করেছে পাগলীর কাছ থেকে ছেলেটা নেবার জন্য। কেউ বুঝিয়ে বলছে। কেউ জোর করছে কিন্তু পাগলী কিছুতেই ছেলেটাকে বুক

থেকে ছাড়ছে না। এদিকে ছেলেটা পচে উঠে গন্ধ বের হচ্ছে। দেখে এলাম পাবলিকরা পুলিশে খবর দিতে লোক পাঠিয়েছে।

এটা তো মজার কথা নয় রে চাঁদু। এটা যে দুঃখের কথা। পাগলীটাও তো মা। তাই ছেলে মরে গেছে বললেও ও বিশ্বাস করছে না। মায়ের মন। আহা রে।

নদেরচাঁদ ননীবালার কথা শুনেই থেমে গেল। মায়ের কাছে সে বড় না হলেও তার মা মাঝে মাঝে আসে। ভালমন্দ কিছু পেলে তা নিয়ে আসে। অথচ এই মা-ই একদিন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল অন্যের ঘর করতে। মা যে কি জিনিস তা নদেরচাঁদ ভাল করে জানার সুযোগ না পেলেও আজ তার মনে হল মায়ের মনেও তার প্রতি অশেষ মমতা নিশ্চয়ই সঞ্চিত আছে।

রাতের বেলায় ননীবালাকে ডেকে বলল, কাল আমি মায়ের কাছে যাব দিদিমা।

ভাল কথা। তোর মাকে একবার আসতে বলবি। তোর দাদু আর আমি ঠিক করেছি এবার দেশে ফিরে যাব।

নদেরচাঁদ হেসে বলল, কবে যাবি? যাবার আগে বলিস আমিও তোদের সঙ্গে যাব। জানিস দিদিমা তোরা বেঁচে আছিস তাই দেশ ঘরের কথা জানতে পেরেছি। আমার বয়সী বাঙ্গালী-মেড়ো-ওঁড়িয়া যারা এখানে ফুটপাতে জন্মেছে তারা নিজেদের দেশ গ্রামের কথা বলতেই পারে না। তারা কখনও বলে না দেশে ফিরে যাবার কথা।

ননীবালা পাশ ফিরে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোন উত্তর দিল না।

নদেরচাঁদ হতাশভাবে বলল, দেশ ওদের নেইরে দিদিমা।

আমাদেরও নেইরে চাঁদু। আমরা হলাম ভিখ্ মাঙ্গা ঘরছাড়া মানুষ। আমাদের না আছে দেশ, না আছে জাত, না আছে ধর্ম। না আছে ইজ্জত, না আছে মাথা গোঁজার জায়গা, না আছে পেটে ভাত। আমরা যে কি তা আমরাই জানি না। ওদের মতই আমাদের ছেলেমেয়েরা ফুটপাতে জন্মায়, ফুটপাতে মরে। কেউ চোখের জলও ফেলে না। আহা উহু করে না। পাগলী মেয়েটা যেমন বলতে পারেনি তার ছেলের বাবা কে, তেমনি হাজার হাজার এই ফুটপাতে বাচ্চা কাচ্চা আছে যারা বলতে পারে না তাদের বাবার পরিচয়। নে ঘুমো আবার সকালে বেরতে হবে তোকে।

নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না কেউ-ই। মাঝরাতেই চিৎকার আর কান্নার শব্দ। নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নদেরচাঁদ উঠে বসল।

রাজকুমার বলল, শুয়ে পড় চাঁদু। ওসবে কান দিসনি।

তবুও চাঁদু এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলল, তোরা শুয়ে থাক, আমি দেখে আসি।

রাজকুমার আর ননীবালার নিষেধ অগ্রাহ্য করে নদেরচাঁদ এগিয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এল। তখন ঝগড়া আর কান্না বন্ধ হয়নি।

রাজকুমার ও ননীবালা উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল। নদেরচাঁদ ফিরে আসতেই বলল, কি হয়েছে বাবা ?

চোলাই। চোলাই খেয়ে শরীফ মিঞা বিবিকে পেটাচ্ছে। পাঁচ ছটা ছেলেমেয়েকে সারা দিন খেতে দিতে পারেনি শরীফের বিবি। সারা দিনে শরীফ যা উপায় করেছে তার সবটাই শেষ করে এসেছে চোলাই খেয়ে আর জুয়া খেলে। বউয়ের কাছে ভাত চেয়েছিল, শুনলাম বউ খালি হাঁড়িটা শরীফের মুখের সামনে রেখে বলেছিল, নে খা। বাস্, এরপর যা হয়। একেই আমরা পেটের ভাত যোগাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি আর শরীফ মদ-জুয়াতে সব শেষ করে বউয়ের কাছে এসেছে ভাত চাইতে। রগড় মন্দ নয়।

ননীবালা বলল বুঝলাম। নে, আর রাত শেষ হতে বাকি নেই শুয়ে পড়।

রাতের গোলমালটা একটু বেশি দূর গড়িয়ে ছিল। শরীফের প্রতিবাসীরা পুলিশ ডেকে এনেছিল। পুলিশ শরীফকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যেতেই গোলমাল থেমেছিল। বিকেলবেলায় শরীফ তার শেষ সম্বলটুকু পুলিশের হাতে দিয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু তার বিবির কাছে যেতে সাহস পায়নি। লোকের কাছে শুনল তার বিবি ছেলেমেয়েদের নিয়ে টিকিয়াপাড়ায় গেছে। কার কাছে গেছে তা বলে যায় নি। কাঁথা কম্বল যা ছিল সবই নিয়ে চলে গেছে। শরীফ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিতে থাকে।

তার পাশেই বসেছিল আজমল হক্। উত্তরপ্রদেশের উনাও জেলা থেকে এসেছে। বাংলা কথা মোটামুটি বুঝলেও বলতে পারে না। চেষ্টা করে। হিন্দী নয়, দেহাতি উর্দুতে কথা বলে।

শরীফকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, য়্যা শরীফ ভাই একঠো বিড়ি তো পিলাও।

বিরক্তির সঙ্গে শরীফ আজমলের দিকে তাকিয়ে দেখল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের বরে দিল।

বলতো ইয়ার কাল পুলিশ কে ডেকেছিল ?

মালুম নেহি। মৈনে নেহি জান্তা। হোগী কোহি শয়তান।

শরীফ দুঃখের সঙ্গে বলল, বিশটা টাকা ছিল, শালা হাবিলদার কেড়ে নিল। সারাদিন না খেতে দিয়ে বিকেলবেলায় ছেড়ে দিল।

কেয়া জুলুমবাজি। রুপেয়া পয়সা হ্যায় আপনা জেবমে ?

না ভাই সব কেড়ে নিয়েছে। বিবি ভি বালবাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে।

বহুত খুব। এই লেও দোরুপেয়া, নাস্তাউস্তা কর লেও।

সেই রাতেই দু'লরি বোঝাই পুলিশ ফুটপাত ঘিরে টেনে তুলতে থাকে জওয়ান ছেলেদের।

আজমল জিজ্ঞাসা করেছিল, ক্যা কসুর ?

শালা তোরা ছিনতাই করিস শশুরের ঘরে গিয়ে কসুরের হিসাব হবে।

নিরুপায়। পুলিশ টানতে টানতে কজনকে ভ্যানে তুলল।

সকালবেলায় দেখা গেল নবাগত জমিদারদের হাবেলি প্রায় শূন্য। যারা এখনও আছে তারা বুড়ো হাবরা, শিশু ও মেয়েরা। রাতের ঘটনায় সবাই বিহ্বল। যে যার সব লোটা কম্বল গুটিয়ে পাততাড়ি দিতে ব্যস্ত। মহল্লার যারা ভদ্রজন নামে পরিচিত তাদের কয়েকজন ঘটনাটা শুনে শুধুমাত্র বলল, পুলিশকে বেশি ক্ষমতা দিয়েই সরকার গরীবদের ওপর জুলুম করছে।

কেউ কেউ বলল, সারা শহর চোর ডাকাতে ভর্তি হচ্ছে সেদিকে নজর নেই সরকারের যত জুলুম এইসব গরীবদের ওপর।

কিন্তু কেউ-ই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাল না। কেউ এগিয়ে এল না সাহায্য করতে।

সকালবেলা থেকেই মার্কেটের চারদিকে গলি ঘুপসিতে সাট্টার দালালরা বসে গেছে। তাদের চার পাশে লোক জমছে। কেউ কেউ দাঁড়াচ্ছে। কেউ কেউ টাকা দিয়ে শ্লিপ কেটে চুপি চুপি গা ঢাকা দিচ্ছে। এই সাট্টার দালালদের চর অনুচর রয়েছে অনেক, তাদের দিকে পুলিশ তাকায় না। অথচ আশ্রয়হীন এই সব ফুটপাতবাসীদের ওপর জুলুম চালায় পুলিশ। এরা যেন কামধেনু। পুলিশের পকেট খালি হলেই দু'চারজনকে ধরে নিয়ে যায়। ওদের মেহনতের পয়সা কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে ফেরত পাঠায়।

এসব ঘটনা জানে ফুটপাতের জমিদাররা। এরকম অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রায় সবাইকে। কিন্তু তাদের করার কিছু নেই।

রাজকুমার বার বার নদেরচাঁদকে পুরানো দিনের ঘটনা শুনিয়েছে, বলেছে ফুটপাতের অসহনীয় জীবনযাত্রার কথা, সচেতন করেছে যাতে নদেরচাঁদ পুলিশের ফাঁদে না পড়ে। তবুও নদেরচাঁদ সতর্ক হতে পারেনি। অনেক দিন আগে যখন ফুটপাতে সবাই ছিল ঘুমিয়ে তখন হঠাৎ চিৎকার শুনল বাঁচাও, বাঁচাও, তারপরই বোমা ফাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। ফুটপাতের মানুষগুলো জেগে উঠেছিল। তাদের মুখ চোখ শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ে। তাদের চোখের সামনে তিনটা জওয়ান ছেলে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে, রক্তে রাস্তার কালো পীচ লাল হয়ে উঠেছিল। রাস্তার আলোতে চিক্ চিক্ করছিল তরল রক্ত। একটা গাড়ি এল। লাশগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। সবাই দেখেছিল বাদ প্রতিবাদ বা সাহায্য করার সাহস ছিল না কারও।

রাজকুমার ননীবালার মত আরও অনেকে দেখেছিল। তাদের চোখে ঠুলি পড়াতে আর গলার শব্দ বন্ধ করতে একদল পুলিশ তাদের ঘিরে ধরে বলল, যা দেখলি তা কাউকে বলবি না। যদি বলিস তা হলে তোদের লাশও গড়িয়ে পড়বে, বুঝলি।

এই সহজ সত্য কথাটা সবাই বুঝেছিল।

নদেরচাঁদ তখন ছোট।

ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সেই সব পুরানো দিনের কথা রাজকুমার মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে নদেরচাঁদ সতর্ক হয়ে চলতে পারে।

নদেরচাঁদ বড় হয়ে বুঝেছিল, যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। কেউ বাধা দিলে তাকে সমূলে শেষ করতে চায়। সেই কাজই করছে বড় বড় বাবুরা যাদের ইসারায় পুলিশ চলছে।

নদেরচাঁদ অনেক দিন-ই ভেবেছে এই শহর ছেড়ে চলে যাবে তাদের গ্রামে। যে গ্রাম সে কখনও চোখে দেখেনি, গ্রামের নামটাও ভাল করে শোনেনি। শুনেছে শুধু কালাচাঁদ, ফকিরচাঁদ, নফরচাঁদের পোড়া কপালের গল্প। তার জেদ ছিল কালাচাঁদের ভিটা আবার দখল করার কিন্তু সে সুযোগ না পাওয়াতে শহর ছাড়তে পারছিল না। হতাশাবোধ ধীরে ধীরে তার মনকে দুর্বল করতে থাকে।

একদিন রাজকুমারকে বলল, কালাচাঁদের ভিটে আর দখল করা যাবে না দাদু।

রাজকুমার কঠিন ভাবে নদেরচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হয়ত তাই, আশা ছাড়িসনি চাঁদু। আমরা বেঁচে আছি শুধু আশা নিয়ে। যাদের কিছুই থাকে না তাদের মনে থাকে আশা। আজ যা হল না, কাল হবে, কাল না হলে পরশু হবে। এই নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। লড়াই করতে করতে একদিন আমরা শেষ হব কিন্তু আশার শেষ নেই, তাই লড়াই করতে হবে।

আর লড়াই! দেহটা আর কতদিন চলবে? এই দেহটাই তো ভরসা। জানিস দাদু নীলু সরদার মুখে রক্ত তুলে শহরের রাস্তায় ঠেলার পিছারি করছিল। অসুখ হল। হাসপাতালে গেল। ডাক্তাররা বলল টি-বি। তারপর? ওর বউ পালালো দুটো বাচ্চা নিয়ে। ফুটে একাই পড়েছিল এত দিন। গত বুধবার মরেছে। সেই মরা ফেলতে কেউ চায় না। সরকারি গাড়ি এসে নিয়ে গেছে।

রাজকুমার শুধু হেসে বলল, সরকারি গাড়িতে চাপলে তাড়াতাড়ি স্বর্গবাস হয় রে চাঁদু।

তুই মস্করা করছিস দাদু?

নারে চাঁদু, মস্করা নয়। আমাদেরও স্বর্গে যেতে হবে সরকারি মরা ফেলার গাড়িতে চেপে। আমাদের আর কে নিয়ে যাবে সাজিয়ে গুজিয়ে শ্মশানে পোড়াতে। তবে তখন তো কিছু জানতে পারব না। মরা মানুষ তো কথা বলে না, তাই কেউ জানাতে পারে না। তবে ওটাই আমাদের লাভ। সরকার খেতে দিল না, ঘর দিল না, কাজ দিল না, ওষুধ দিল না তবুও শেষ বেলায়

স্বর্গে যাবার গাড়িটা তো দিল। এর চেয়ে কপালে আর কত সুখ, বল। যত দিন দেহে তাকত ছিল ততদিন খেটে খেয়েছি, এখন তাকত ফুরিয়ে গেছে এখন ওপরওলার ভরসা করে মরার জন্য দিন গুনছি।

ওপরওলা? আমরা তো নিচেরওলা। ওপরওলা যারা তাদের তো ওই সব বড় বড় বাড়ি। ওই বাড়ির এক-একখানা ইঁটের ওপর নিচেরতলার কত চোখের জল তাতো জানিস। তারও ওপরে কেউ নেই রে। তাই তো তুই রাজকুমার রাজা হতে পারলি নি, আমি নদেরচাঁদ নদের মাটি দেখলামনি কখনও। ওসব ভুলে যা। তবে স্বর্গেই যদি যেতে হয় তা হলে সরকারি কালো রং-এর গাড়িকে ভরসা করে ফুটপাতেই পড়ে থাকব।

রাজকুমার বলল, তোরা তাই থাকিস। আমাকে ফিরে যেতেই হবে। দেহটা নিজের গ্রামেই রাখব। কালাচাঁদের ভিটে দখল আর করতে না পারলেও, কালাচাঁদের পায়ে ছোঁয়া মাটিতে আমাকে নিয়ে যাস দাদু। আর কিছুই চাই না।

বিয়ে হয়ে গেল মেনকার।

কালীঘাটে খবরটা পেয়েছিল অমরচাঁদ। পাঁচবালার মারফত রাজকুমারও খবর পেয়েছিল। সে তো এক বছর আগের কথা। সব শুনেও রাজকুমার তার অক্ষম দেহ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছতে পারেনি তার যা কিছু বলার ছিল তা বলা হয়নি।

মেনকার বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অমৃতলাল ছিল খুলনার প্রত্যন্ত গ্রাম নিতাপুরের বাসিন্দা। সুন্দরবনের গা-ঘেঁষে গ্রাম। অমৃতলালের বাবা ছিল পূজারি বামুন। নিজ গ্রামে আর আশে পাশের গ্রামে যজমানী করে কোনরকমে দিন গুজরাণ হত। অমৃতলালের যখন ছয় বছর বয়স সে সময় ভিন্ গাঁ থেকে নারায়ণ পূজা সেরে ঘরে ফিরছিল। কোঁচড়ে ছিল শালগ্রাম শিলা, দু'হাতে ছিল কাপড়ের পোঁটলায় নৈবেদ্যের চাল কলা ফলমূল ইত্যাদি। নোনা জলের বাঁধ দিয়ে ঘরে ফিরছিল, শীতের বেলা শেষ হতেই সে সর্বশক্তি দিয়ে ছুটে চলছিল বাড়ির দিকে।

তখনও সামান্য কিছু পথ বাকি। হয়ত সিকি মাইল পেরোলেই নিজের গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছতে পারত, এমন সময় দুর্ঘটনা।

অমৃতলালের বাবা খুব সতর্ক লোক কিন্তু প্রকৃতির ডাক বড়ই বেয়ারা। পেটে যন্ত্রণা হতেই নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। বাঁধের পাশে সামান্য জল দেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বসেছিল।

বাস্। তার পেছন পেছন যে একটা বাঘ অনেকক্ষণ থেকে আত্মগোপন করে এগোচ্ছিল সে খেয়াল তার ছিল না। সবে সূর্যাস্ত হলেও তখনও ঝাপসা আলোতে পথ দেখার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না কিন্তু বাঁধের পাশে যখন সে

বসেছিল তখন কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। আশঙ্কাও ছিল না।

এরপরের ঘটনা মর্মান্তিক।

রাতের বেলায় অমৃতলালের বাবা বাড়িতে না ফেরাতে তার মা উৎকণ্ঠিত হলেও রাতের বেলায় অমৃতলালের মাকে সাহায্য করতে গ্রামের কেউ-ই বাইরে আসতে রাজি হয়নি! সাহসও পায়নি।

পরের দিন চাল কলার রক্ত মাখা পেঁাটলা ভিন্ন আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি।

অমৃতের বাবা তার মাকে বলত, তোমরা ভয় পেও না। আমার সঙ্গে শালগ্রাম শিলা থাকে। বড় শেয়াল কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু মিথ্যা এই ভরসা তাই প্রমাণিত হল যেদিন সত্যি সত্যি অমৃতের বাবাকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শালগ্রাম শিলা সমেত।

অমৃত পিতার কোন সম্পদ পায়নি। পেয়েছিল কঠিন দারিদ্র। দেশ ভাগের সময় শিশু অমৃতকে কোলে করে তার মা নদী পেরিয়ে এসেছিল ভারতে। আশ্রয় নিয়েছিল বনগাঁও সীমান্তে।

অমৃত বড় হল।

কি ভাবে বড় হয়েছিল তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল।

যে সময় রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় তখন অমৃত ভাগ্য তাড়িত নিঃস্ব।

কারণ?

অমৃতের অসামাজিক কার্যকলাপ।

ঘর একটা তৈার করেছিল সীমান্তের কাছেই। সে ঘর রাখতে পারেনি। পৈতৃক যজমানী ব্যবসাও চালাতে পারেনি, অমৃত ছিল নিরক্ষর। তাই সংস্কৃত মন্ত্রগুলো তার কাছে ছিল অনেক দূরের বস্তু এবং অবোধ্য।

সীমান্ত হল চোরাকারবারের ঘাঁটি, অপরাধীদের স্বর্গ।

স্বর্গচ্যুতি ঘটেছিল অমৃতলালের।

অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যারা দিয়েছিল তারাই স্বর্গরাজ্যে একাধিপত্য লাভ করায় অমৃতকে হটে আসতে হয়েছিল অনেক কিছু খুইয়ে। একদিকে মস্তানদের সঙ্গে রেষারেষি, অপরদিকে সীমান্তরক্ষী ও পুলিশের তাড়না। প্রথমটা হল ভাগাভাগিতে। দ্বিতীয়টা হল ওদের লোভ প্রশমিত করার অক্ষমতায়।

প্রথম প্রথম মোটামুটি উপার্জন ভালই হচ্ছিল।

অমৃত ঘর করেছিল, ঘরণী পেয়েছিল। কিন্তু নিরাপত্তা পায়নি।

ভাগাভাগির লড়াইতে অমৃত পরাজিত ও বিধ্বস্ত।

এমত অবস্থায় একদিন স্ত্রী ও শিশু কন্যা মেনকাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল বারাসতের প্ল্যাটফরমে। সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে কলকাতার ফুটপাতে।

ননীবালাই শুনেছিল বামুনদের একটা বউ স্বামীর ও মেয়ের হাত ধরে এসে আশ্রয় নিয়েছে ধর্মতলায়।

অমৃত শক্ত সমর্থ লোক। দৈহিক পরিশ্রম করতে কখনও পেছপা নয়। কিন্তু কর্ম সংস্থান করা সুকঠিন! আগে যারা এসেছে তারা অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে, তাদের সহযোগিতা ভিন্ন অমৃতের অন্ন সংকট কাটবে না।

অমৃত ফুটপাতের জমিদারীতে আশ্রয় পেয়েছিল অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে।

কিন্তু তিনটি প্রাণীর পেটের চিন্তাই বড় চিন্তা।

শেয়ালদহ দক্ষিণ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ভাত আর রুটি বিক্রি হয়। সেই খবর পেয়েই অমৃত গেল সেখানে সঞ্চয়ের পয়সা দিয়ে খাবার কিনতে।

বানুবিবির মেয়েরা সকালবেলায় গৃহস্থ বাড়ির দরজায় মাগো কিছু আছে আবেদন জানিয়ে ভিক্ষা চায়। এই সব মেয়েরা ভিক্ষা লব্ধ রুটি অথবা ভাত নিয়ে বসে দুপুরবেলায় স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। খরিদ্দার বুঝে দশ পয়সায় একখানা রুটি, পনের পয়সায় এক বাটি ভাত বিক্রি করে অতি দরিদ্র ছিন্নমূল ফুটপাতের প্রজাদের।

অমৃত ভাত কিনেছিল তিন বাটি।

কিছু তরকারী দে?

মুখ ঝামটা দিয়ে বানুবিবি বলেছিল, নুন দিতে পারি। আস্তা বাস্তা) থেকে কাঁচা ঝাল (লংকা) কিনে নে।

অমৃত বানুবিবির কাংস কণ্ঠস্বরে এবং ভাত খাওয়ার সহজ উপকরণের নির্দেশ শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি দেখছিস?

তোকে। তোর এমন সুন্দর চেহারা। যদি তোর মেজাজটা সুন্দর হত তা হলে খদ্দেররা বর্তে যেত।

বানু মুখ উঁচু করে বলল, তোর মত কথা তো কেউ বলে না। তোকে পনের পয়সা করে দিতে হবেনি। দশ পয়সা করে দে। আন্না (রান্না) করতে না পারলি, চলেও আসিস।

তুই থাকবি তো?

থাকব। না থাকলে ওদের বলবি বানুবিবি কোথায়। এরাই দেখ্যে দেবে।

অমৃত ভাত নিয়ে ফিরে গেল।

এভাবে তো দিন চলে না।

অনেক কষ্টে রিক্সা পেলেও চালাতে পারল না। বিনা লাইসেন্সের রিক্সা। পুলিশ চেকিং দেখেই রিক্সা ফেলে অমৃত দৌড় দিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। এবার সে আস্তানা নিল নতুন বাজারের গলিতে।

মাথায় করে মোট বইবার কাজ।

খোট্টাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পেরে ওঠে না।

রোজ দিনই যেত মুটের কাজ পেতে পোস্তায়।

এখানেই পরিচয় রাজকুমারের সঙ্গে।

এসব অনেক দিন আগের কথা।

মেনকা তখন ছিল কয়েক মাসের শিশু। কেবল হাঁটতে শিখেছে।

এরপর দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেছে।

মেনকা বড় হয়েছে। ওদের কথায় সেয়ানা হয়েছে।

রাজকুমার আর কাজ করতে পারে না। তারকের ভরসায় থাকে। অমর না হলেও নদেরচাঁদের অক্লান্ত মেহনতে তাদের অসুবিধা থাকলেও অভাব কিছু ছিল না।

অমৃত মাঝে মাঝে আসত মেনকার হাত ধরে।

একদিন রাজকুমার বলেছিল, তোর মেয়ে তো সেয়ানা হয়েছে।

অমৃত এসব কথা কখনও ভাবেনি। রাজকুমারের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেল। আমতা আমতা করে বলল, তা এগার বছর তো হতে চলল।

ননীবালা বলেছিল ওরকম বয়সে দেশগাঁয়ে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।

সেটা দেশগাঁয়ের কথা। শহরে কি তা হয়? বলেই রাজকুমার উঠে বসে বলল, তবে কি জানিস অমৃত, তোরা যেখানে থাকিস তার দুদিকেই খারাপ মেয়েমানুষ থাকে। উত্তরে সোনাগাছি, আর পুবে রামবাগান। এখানে বড়মেয়ে নিয়ে থাকলে ফুসলে ফাসলে তোর মেয়েকে নিয়ে পালাতেও পারে। তাই গৌরীদান করে দে। মেয়ে হল সোয়ামির সম্পত্তি, সোয়ামির হাতে তুলে দে।

রাজকুমারের কথাটা ঠিকই।

রাতের বেলায় মাতালদের যা উৎপাত! একদিন তো তার বউয়ের হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছিল। ভাগ্যি তার কাছে একটা টাঙ্গি ছিল, নইলে বউয়ের মান সম্মানই থাকত না।

অমৃত সেই রাতেই ফিরে গিয়ে বউকে বলল।

মেনকার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু পাত্র কোথায়। বামুনের মেয়েকে তো যার তার হাতে তুলে দিতে পারব না। বউ বলল, বামুন পাত্র দেখ।

অমৃত বলেছিল, ঠিকই বলেছ কিন্তু এমন পাত্র কোথায় পাব। আমার মা একটা গল্প বলত। শুনবে?

শোনালে শুনব।

কাশীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে। সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

কালক্রমে মেয়ে বড় হল।

ব্রাহ্মণ খবর পেলেন পাণ্ডে হাউলিতে একজন সাত্ত্বিক অবিবাহিত ব্রাহ্মণ পুত্র

বাস করে। অনেক খোঁজ খবর করে ব্রাহ্মণ স্থির করল এই পাত্রটি তার কন্যার উপযুক্ত।

এবার বিবাহের প্রস্তাব।

ব্রাহ্মণ কুমার বিবাহে ইচ্ছুক হওয়াতে শুভকাজটি সম্পন্ন হয়ে গেল।

কালক্রমে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী করালগ্রাসে পতিত হলেন।

তাঁদের কন্যা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে থাকে। তারাও একটি কন্যারত্ন লাভ করে। এই কন্যা বিবাহযোগ্যা হতেই পাত্রের অনুসন্ধান করতে থাকে সেই ব্রাহ্মণ কন্যা ও তার স্বামী।

অনেক খোঁজ খবরের পর পাত্র জুটল। পাতালেশ্বরের গলিতে দেশ ভাগের পর এসে এই ব্রাহ্মণ কুমার বাস করছে। অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। প্রত্যুষে গঙ্গা স্নান করে বিশ্বেশ্বরের মাথায় বেলপাতা না দিয়ে অন্ন গ্রহণ করে না, তাও স্বপাকের অন্ন।

উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

একদিন জামাতাগৃহে প্রবেশ কালে কন্যার মা গৃহস্থ লোকের কথোপকথন শুনে অবাক হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে এসে স্বামীকে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

তার স্বামী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কি সর্বনাশ ?

আমাদের জামাই নাকি ব্রাহ্মণ নয়, নাপিত।

ও! এই কথা। ব্যাটা আমাদের ঠকাতে পারেনি।

স্ত্রী চিৎকার করে বলল, কি বলছ তুমি! আমাদের নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে। আমি ওকে পুলিশে দেব।

লাভ হবে না গিন্নি। ও আমাকে ঠকাতে পারেনি। আমি নিজেই ধোপার সন্তান!

গল্প বলেই অমৃত বলল, দেশ ভাগের পর কত অন্ত্যজ শ্রেণী ব্রাহ্মণ হয়েছে তার হিসাব কেউ কি করেছে। তার চেয়ে জেনে শুনে অন্ত্যজ শ্রেণীর ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই ভাল।

অমৃতের স্ত্রী এতে কোনরূপ সান্ত্বনা পায়নি। সে ব্রাহ্মণ কুমার সন্ধান করতে করতে লাহা বাড়ির ওড়িয়া কর্মচারী মায়াময়কে আবিষ্কার করল। বালেশ্বর আর মেদিনীপুর জেলার সীমান্তের কোন গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তান এই যুবকটি। বলতে গেলে সে বাঙ্গালীও নয় ওড়িয়াও নয়, উভয় রাজ্যের সংমিশ্রন ও কালচার নিয়েই বড় হয়েছে।

বিবাহ স্থির তবে একটি সর্ত কোন ক্রমেই মেনকাকে দেশে নিয়ে যেতে পারবে না। বিয়ের পর মায়াময় ও মেনকা কলকাতাই থাকবে। একটাই মেয়ে। চোখের আড়াল চায় না অমৃত ও তার স্ত্রী।

এই সর্ত মত বিয়ে হল।

খবরটা সবাই জেনেছিল।

সাতাশ বছর বয়সের মায়াময়ের সঙ্গে এগার বছর বয়সের মেনকার বিয়ে হল কালীঘাটের মন্দির চত্বরে।

কালীঘাটেই অমরের সঙ্গে অমৃতের দেখা হয়েছিল। সেখানেই শুনেছিল মেনকার বিয়ের কথা।

এরই এক বছর পর।

মেনকার হাত ধরে অমৃত এসে হাজির হল।

কেমন আছিস অমৃত? জিজ্ঞাসা করেছিল রাজকুমার।

মেনকাকে তোর কাছে রাখতে এসেছি রাজুদা।

কেন রে? ওর নিজের ঘর সংসার বুঝে নিতে দে।

ও পালিয়ে এসেছে। তা বছর ঘুরে এল। কিছুতেই ও মায়াময়ের কাছে যেতে চায় না। সেই যে বিয়ের রাতে মায়াময়ের সঙ্গে গেল, তারপর দিনই ও পালিয়ে এল ওর মায়েব কাছে।

কেন?

ওর মা জানে। ওর মাও এসেছে। বউদি কোথায়?

ওই তো জল নিয়ে আসছে।

বউদিকেই সব বলবে।

ননীবালাকে মেনকা ও তার মা সব কিছুই বলেছিল। সব শুনে ননীবালা বলল, মেনকা আমাদের কাছেই থাকবে।

রাজকুমার ননীবালার কাছে সব শুনেছিল।

বিয়ের রাতে মায়াময়ের যৌন লিপ্সা চরম অত্যাচারে পরিণত হয়েছিল। এগার বছরের একটা অপরিণত বালিকা সাতাশ বছরের পরিপূর্ণ যুবকের শয্যা সঙ্গিনী হবার মোটেই উপযুক্ত নয়। মায়াময়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সকাল হওয়া মাত্র মেনকা পালিয়ে এসেছিল তার মায়ের কাছে।

ননীবালা ও রাজকুমার বুঝেছিল মেনকার সেয়ানা হবার বয়স না হতেই এই অল্প বয়সের বিয়ে কতটা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। দেশাচারই সব কিছু নয়। যেখানে দেহজাত মনুষ্যধর্মটাই বড় কথা সেখানে সমতা ও বোঝাপড়ার বিশেষ প্রয়োজন থাকে।

মেনকাকে রেখে অমৃত সেই যে গেল আর তার দেখা পাওয়া যায়নি।

মায়াময়ও কোন সময়ই তার স্ত্রীর সন্ধান করতে আসেনি।

মেনকা নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে থাকে ননীবালা ও রাজকুমারের আশ্রয়ে। বিবাহ যে কি তা বুঝবার আগেই মেনকা পালিয়ে এলেও বছর না ঘুরতেই মেনকার দেহের পরিবর্তন ঘটল। তখন মেনকার মনে জেগেছে স্বামী সঙ্গের তৃষ্ণা। তার চোখে, কপালে মাঝে মাঝেই এরই নিদর্শন ফুটতে থাকে।

রাজকুমার ও ননীবালা মেনকার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে চিন্তিত।

অমর ও পাঁচবালা চিন্তিত কেন না তাদের জওয়ান ছেলে নদেরচাঁদ তখনও তার পিতামহের আশ্রয়ে ছিল। অঘটন যে কোন সময় ঘটতে পারে।

অঘটনই ঘটল তবে তা অন্য ধরনের।

শ্যামবাজারের মোড়ে আইন অমান্য করছিল একদল মহিলা। হৈ-হট্টগোল হচ্ছিল স্বাভাবিক কারণে। তামাসা দেখতে ভিড় জমেছিল যথেষ্ট। মেনকা ওই পথে যাবার সময় তামাসা দেখতেই দাঁড়িয়েছিল মেয়েদের ভিড়ে।

মহিলা পুলিশ মিছিল ভেঙ্গে দিতে যখন এগোল তখন দু'পাশে যে সব পুরুষ দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল তাদেরই মাঝ থেকে কেউ হঠাৎ ইঁট ছুড়ল মিছিল ও পুলিশ লক্ষ্য করে।

এরপরই ধুন্ধুমার কান্ড।

এই গোলমালে ধাক্কা খেয়ে মেনকা পড়ে গেল রাস্তায়। কতকগুলো পলায়নরত মহিলা তার গায়ের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল। কেউ তাকিয়েও দেখল না তাকে। যখন রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল তখন কয়েকজন আহত মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্সে টেনে তোলা হচ্ছিল তাদেরই একজন মেনকা।

মেনকা গেল হাসপাতালে।

তখন তার জ্ঞান ছিল না। পরেরদিন জ্ঞান হবার পর অন্য সবাইরা যখন তাদের বাড়ির ঠিকানা নাম ধাম দিচ্ছিল তখন মেনকা ভেবে পেল না তার সঙ্গে কোথাকার ঠিকানা জুড়ে দেবে এবং কি পরিচয় দেবে।

যার ঠিকানা থাকে না তাকে ভবঘুরে বিনা আর কি বলা যায়। তবুও মেনকা বলল তার বাবার নাম, দিল বাবার কাছে শোনা বনগ্রামের ঠিকানা।

এখানে কলকাতায় কেউ আপনার পরিচিত আছে।

আছে। তবে তাকে পাবেন কি। থাকে বউবাজারের ফুটপাতে। রাজকুমার তার নাম, বয়সও বেশি। সে বলতে পারবে আমার বাবা কোথায় আছে।

বউবাজার তো অনেক বড় জায়গা।

একটা ব্যাংক আছে, উল্টো দিকের রাস্তায় থানা। সেই ব্যাংকের আশেপাশে খোঁজ করলে রাজকুমারের হদিস পাবেন। তার নাতি নদেরচাঁদের নাম করলেই সবাই চিনবে।

পুলিশ নদেরচাঁদকে খুঁজতে গেল বউবাজারে।

বিকেলবেলায় পুলিশ এসে জানাল, রাজকুমার তার বউ ননীবালা আর নাতি আজই সকালে দেশে চলে গেছে। কেউ বলতে পারল না ওদের দেশ কোথায়।

মেনকা আশা করেছিল তার এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে নদেরচাঁদ অন্তত একবার তাকে দেখতে আসবে। সে আশায় ছাই পড়ল যখন শুনল রাজকুমার সপরিবারে ফুটপাত ছেড়ে দেশে ফিরে গেছে।

কিন্তু কেন তারা গেল।

অসুস্থ রাজকুমার হাসপাতালে না এসে দেশে কেন গেল।

কদিন পর মেনকা হাসপাতাল থেকে খালাস পাওয়া মাত্র পুলিশ জানাল তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা করার অভিযোগ আছে আদালতে। পুলিশ তার কাছ থেকে বণ্ড আদায় করে নির্দেশ দিল পরেরদিন আদালতে হাজির হতে।

মেনকা অবাক হয়ে গেলেও করার কিছু নেই।

আত্মরক্ষার পথ তাকে কে দেখাবে। শেষে স্থির করল, আদালতে সে যাবে না। জনারণ্যে মিশে গেলে একটা মহিলাকে খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, তার তো সবই সুবিধা।

মেনকা হারিয়ে গেল জনারণ্যে।

রাজকুমার ও তার পরিবারের সঙ্গে সংযোগ করার কোন চেষ্টাই করল না।

ফুটপাতের জমিদারদের কারও আর কোন প্রয়োজন ছিল না মেনকার বিয়ে আর পরিণতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার।

মেনকার মত হাজারো মেয়ে ভাসতে ভাসতে ফুটপাতের ডাস্টবিনে আশ্রয় নেয়। হারিয়েও যায় সবাই, ভুলেও যায়। আক্ষেপ করে না কেউ-ই।

অভাব অনটন সহ্য করেও ওরা বেঁচে ছিল। কিন্তু নানা অশান্তি এসে দেখা দিল রাজকুমারের সংসারে।

কয়েকদিন পরে অমর এসে জানাল খুকীর শরীর ভাল নেই। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। খুকীর স্বামী এসে খবর দিয়েছে। তার ছুটি নেই, অমর আর পচিকে কদিন দেখা শোনা করার জন্য বিশেষ ভাবে বলে গেছে।

যাবি তো তোরা ?

যাব মনে করেছি। ছোট খোকাটা কাজে বের হয়। তাকে দুটো ফুটিয়ে কে দেবে তাই নিয়ে সমস্যা হয়েছে বাবা। আমাকে তো সব দিক দেখতে হয়। বাগ্দীদের বড়ই নাক উঁচু। পান থেকে চুন খসলেই গোস্‌সা হয়। খুকীর শ্বশুর তো লোক ভাল কিন্তু শ্বাশুড়ি যায় চেতলা বাজারে আনাজ বিক্রি করতে। দুপুরবেলায় ফিরেই গরম ভাত তার চাই। খুকী হাসপাতালে গেছে তাতেই মেজাজ খারাপ। কি করি তোরাই বল।

ননীবালা পাশে বসে শুনছিল।

মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ছোট খোকাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

তাও ভেবেছিলাম কিন্তু সে যেখানে কাজ করে সেখান থেকে এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করার বড়ই অসুবিধে। এখান থেকে দেড় ঘণ্টা লেগে যাবে তার কাজের জায়গায় পৌঁছতে আবার ফিরতেও অত সময়। তোরা যেতে পারিস কিনা ভেবে দেখ।

রাজকুমার বলল, আমি তো আর আগের মত নড়তে চড়তে পারি না। চাঁদুকে খেতে দেবে কে? তোরাই ব্যবস্থা কর অমর।

অমরও ভাবছিল কি করা যায় এমন সময় ভয়ংকর শব্দ করে একটা দোতলা বাস এসে থামল তাদের আস্তানার পাশে। পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসল একদল লোক।

কি ব্যাপার বুঝবার আগেই মানুষগুলো তেড়ে এসে গাড়িটার ওপর চড়াও হল। ড্রাইভার আর কনডাকটাররা ইতিমধ্যেই গা ঢাকা দিয়েছে।

একজন বলল, রুটি বেলা হয়ে গেছে।

দোতলা বাসের তলায় পাঁচ ছয় বছরের একটা মেয়ে চাপা পড়ে চেপটে গেছে।

অমর ঘটনাটা জেনে এসে বলল, পাথরপ্রতিমার আয়সাবিবি তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওপারের ফুটপাতে কিছুটা দূরে এসে আস্তানা করেছিল। আয়েসার মেয়ে রাজিয়া মায়ের পাশেই বসেছিল। এমন সময় তাদের উল্টো-দিকের ফুটপাত দিয়ে রাজিয়ার ফুফু (পিসি) যাচ্ছিল। তাকে দেখেই রাজিয়া দৌড়ে যাচ্ছিল পিসির কাছে। এমন সময় জাহাজ মার্কা দোতলা বাস আসছিল বেশ বেগেই। গাড়ি ব্রেক করতে না করতেই মেয়েটা গাড়ির তলায় পড়ে চেপটে গেছে। তাকে চেনাই যাচ্ছে না।

আয়েসাবিবি ও তার দলবল কাঁদছে। জনসাধারণ গাড়ি ভাঙ্গার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এমন সময় পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে এক-দল পুলিশ নেমেই তাড়া করল জনতাকে। দেখতে দেখতে রাস্তা খালি। গলির মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ইঁট পাথর ছুটে আসছে পুলিশের ওপর। পুলিশও লাঠি নিয়ে তাড়াচ্ছে।

নিরাপদ অবস্থা নয় মনে করে অমর ঢুকে পড়ল একটা গলির মধ্যে। রাজকুমার ও ননীবালা চুপ করে বসে রইল তাদের ছেঁড়া মাদুরের ওপর।

এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। আবার যানবাহন লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। অমর ফিরে এসে বলল, তোরা ভেবে দেখ। গাড়িঘোড়ায় রাস্তা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে। আমি চললাম।

রাজকুমার আর ননীবালা হাঁ-না কিছুই বলল না।

শেষ রাতে পুলিশের গাড়ি দেখেই ফুটপাত থেকে সোরগোল উঠল, হল্লা, হল্লা। শোনা মাত্র ফুটপাতের জমিদাররা যে যার মত বিছানা গুটিয়ে পাশের অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়তে থাকে। কয়েকজনকে ধরতে পেরে পুলিশ টেনে তুলল গাড়িতে।

তারপর চুপচাপ।

সকাল হতেই যে যার জায়গায় এসে আবার বিছানা বিছিয়ে বসল। বাচ্চা-কাচ্চারা ফুটপাতে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করল। এগারটা না বাজতেই

যাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। সবাইয়ের পকেট খালি। পুলিশের পকেটে টান পড়লেই হল্লার খেলায় নিরীহ লোকদের টেনে নিয়ে যায় থানায়। মোচড় দিয়ে তাদের শেষ কড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়।

অনেকেই মহল্লার বাবুদের অভিযোগ করেছে, অনেক বাবু প্রতিবাদও জানিয়েছে। এতে কোন ফল হয়নি।

থানার বড়বাবুও ভাগীদার! তাই বিচার কেউ পায় না।

থানার বাবুরা বলে, ওরা চোর, ছিনতাই করে।

হয়ত ওদের মধ্যে চোরও আছে ছিনতাই দলও আছে কিন্তু সবাই তো তা নয়। যারা সত্য সত্যই চোর ও ছিনতাইকারী পুলিশ তাদের চেনে, মাসোহারা পায় তাই তারা নিরাপদে থাকে। নিরীহ মানুষরা নির্যাতন সহ্য করে। এমনটা কিন্তু ছিল না। এখন সবাই স্বাধীন, চোরও স্বাধীনভাবেই চুরি করে। পাকা চোর পুলিশও বেপরোয়া লুণ্ঠন করে গরীবদের। প্রতিবিধান কোথাও নাই।

অমরের ছোট খোকা বর্ণ-পরিচয় পড়েছে ফুটপাতের পাঠশালায়। এখন সে তাগ্‌রা মরদ। তার বুদ্ধিশুদ্ধি পাকা। অমরের কাছে শুনেছে কি করে তার ঠাকুরদাদা কলকাতার ফুটপাতে এসে বসেছে। এবার তার কাজের পদ্ধতি বদল হল। ননীবালাকে একদিন সকালে বলল, আমাকে তিরিশটা টাকা দিবি দিদিমা। তোকে বিকেলবেলায় ডবল ফেরত দেব।

কি করবি?

বিজিনেস। টাকায় টাকা লাভ। তবে একবারে বেশি টাকা লাগবে না। তিরিশ দিয়েই আরম্ভ করব। দিবি টাকা?

ননীবালা তার সঞ্চয় থেকে ছোট খোকাকে তিরিশটা টাকা দিতেই সে বেরিয়ে গেল। ফিরল রাত দশটা নাগাদ। ননীবালার হাতে তিরিশ টাকা ফেরত দিয়ে নিজের হিস্যা চল্লিশ টাকা পকেটে রেখে দিতে দিতে বলল, আর তোকে টাকা দিতে হবে না। চল্লিশ টাকা রইল পকেটে। তাতেই হবে।

ছোট খোকা প্রতিদিন সকালবেলায় বেড়িয়ে যায় ফেরে রাত দশটার পরে। কোথায় যায়, কোথায় খায়, কি করে, কেউ জানে না কিন্তু রাতের বেলায় ননীবালার হাতে তিরিশ টাকা রোজই এনে জমা করে।

একদিন আর ছোট খোকা রাতের বেলায় ফিরল না।

প্রায় নটার সময় একটা লুঙ্গিপড়া বেশ সৌখীন ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল, রাজকুমার কার নাম। প্রতিবাসীরা রাজকুমারকে দেখিয়ে দিল।

কি চাই?

আমি রাজকুমারকে চাই।

আমি রাজকুমার। তোমার নাম কি? কি দরকার?

আমার নাম মকসুদ। তোমার নাতিকে কাল রাতে পুলিশে ধরেছে। আজ আদালতে নিয়ে যাবে।

খবর শুনেই ননীবালা ডুকরে উঠল।

তুই থাম মাগী। শুনতে দে। পুলিশ ধরল কেন?

সিনেমার টিকিট বেলাক করছিল।

রাজকুমার আর কোন কথা না বলে চুপ করে শুয়ে রইল। নন্দেরচাঁদ তখন রিকসা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাকেও খবর দেবার উপায় নেই। অমর অনেক দূরে থাকে, তার কাছে যাবার মত লোক নেই। রাজকুমার কিছুই ভেবে না পেয়ে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। মকসুদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে ফিরে গেল।

তিন সপ্তাহ পরে ছোট খোকা ফিরে আসতেই রাজকুমার মুখ ঘুরিয়ে বসল।

রাগ করেছিস দাদু।

রাগ না করে ধেই ধেই করে নাচব নাকি! আমার ঘরের ছেলে হয়ে জেল খেটে এলি।

ছোট খোকা গভীরভাবে বলল, আরও খাটতে হবে।

মানে, আবার পাপ কাজ করবি, আবার জেলে যাবি।

অতি মোলায়েম ভাবে ছোট খোকা বলল, আচ্ছা দাদু, কালাচাঁদ তিনশ টাকা কর্জা করেছিল মহাজনের কাছে মেয়ের বিয়ে দিতে। তাই তো। সেই টাকা শোধ করতে ফকিরচাঁদ আর নফরচাঁদ তাদের কয়েক বিঘা জমি আর ভিটে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল, বেগার খাটতে হয়েছিল সারা জীবন নফরচাঁদকে। তিনশ টাকা কি করে পাঁচ হাজার ছ' হাজার টাকা হয়েছিল তা কখনও তোর বাবাঠাকুর্দা ভেবেছিল কি?

রাজকুমার বলল, সুদে। মাসে বারটাকা সুদ দিতে পারেনি। আসল টাকার সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে নতুন খত লিখতে হয়েছে বাপঠাকুর্দাকে। তাই এই দশা।

এটা পাপ নয়? তোমরা বলবে নায্য পাওনা। ওদের পয়সা আছে তাই ওদের পাপটা হবে নায্য পাওনা, আমরা গরীব তাই দু'টাকার টিকিট চার পাঁচ টাকায় বিক্রি করলে সেটা হবে পাপ। তোকে ভীমরতি ধরেছে দাদু। আমরা তো টাকার বদলে টিকিট দিই ওরা তোদের কি দিয়েছে। তোদের কথা হল, কেষ্ট ঠাকুর লীলা করে, আর মানুষ করে লুচ্চামি। তোর কথা শুনব না। যতবার জেলে যেতে হয় যাব। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই কিম্বা মেয়ের সর্বনাশ করে তো জেলে যাব না। টাকা খাটাব তার সুদ নেব। তার জন্য যদি জেল হয়, হবে।

ছোট খোকার কথা শুনে রাজকুমার অবাক হয়ে গেল। এসব কথা সে

শুনেছে পার্কের ময়দানের সভায়। বড় বড় বাবু নেতারা শুনিয়েছে কিন্তু সেটা তো কাজে করতে পারেনি কিন্তু তার কচি নাতিটা এখন এই সব কথার সারমর্ম বুঝে ক্ষেপে উঠেছে বদলা নিতে।

রাজকুমারকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোট খোকা বলল, কি ভাবছিস? পুলিশ আমাদের ধরে ঠিকই কিন্তু সব সময় ধরে না। ওদের পাওনা না মেটালে ধরে আর উপরওলার চাপ পড়লে ধরে। তবে সবাই কি জেল খাটে? যাদের পয়সার জোর আছে তারা বাইরেই থাকে। তার প্রক্সি জেল খাটে। যার পয়সার জোর নেই সে আমার মত জেল খাটে। জেল খাটতে খাটতে ঘুঘু হয়। যে মোকসেদ তোর কাছে এসেছিল সে একবার মাত্র জেল খেটেছে। তার বদলে তার প্রক্সি জেল খেটেছে। এখনও খাটছে। যারা দেয় প্রক্সি তাদের ঘরে মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। প্রক্সিদের বউ বাচ্চার পেট ভর্তি হয় আর রাজবাড়িতে আরামে মাসের পর মাস তারা লাপসি খায়। কোন বিকার নেই। ঘর দেয় সরকার, খেতে দেয় সরকার, কাপড় দেয় সরকার আর বউদের ছেলেমেয়েদের মাসোহারা দেয় মোকসেদ। এরকম আরও অনেক আছে দাদু। হরিয়া, মোটা রামু, ঠোঁঠকাটা রমজান। এরা তো হঠাৎ গজায়নি, পেটের দায়ে বেলাক করে।

রাজকুমার যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ঘুরতে থাকে। তার কচি নাতিটা এত জানে অথচ তিরিশ চল্লিশ বছরে সে এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। কেমন অবশ হয়ে এল তার দেহ। তবুও বলল, তোর দাদা কিন্তু তোকে মাপ করবে না।

করবে। কালাচাঁদের ভিটের দখল পেতে হলে দাদার এ জন্ম কেটে যাবে কিন্তু আমি যদি এভাবে চলতে পারি আসছে বছরেই তোদের ভিটার দখল নিতে পারব। বুঝলি?

রাজকুমার সবই বুঝেছিল কিন্তু অবুঝের মত চুপ করেই রইল।

ছোট খোকা কদিনের মধ্যেই তার পুরানো জীবন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

ননীবালা মানা করলেও শোনেনি। বলেছে, টাকা তোর কাছে আছে। কয়েক হাজার হলেই বেলাক আর করব না। তবে টাকা আমি সহজে কাউকে দেব না। জেল খাটব, ঘুস দিয়ে ছাড়া পাব না, তাতে আমার স্টক কমে যাবে। এক বছরের মধ্যেই আমার কাজ শেষ হবে।

ছোট খোকা মোকসেদের চেলা। মোকসেদের কাছেই তার ট্রেনিং। মোকসেদ বলে, জেল খাটবি তো ভি আচ্ছা, রুপিয়া হাত ছাড়া করিস না খোকা।

দল তো একমাত্র মোকসেদেরই নেই, আরও বেলাক পার্টি আছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের রেষারেষিও আছে, এরা নিজেদের মধ্যে হাঙ্গামাও করে। কখনও কখনও অল্পেই মিটে যায়, কখনও চরম অবস্থাও দেখা দেয়। পুলিশ আসে। দু'পার্টির কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা জামিনে খালাস পেয়ে

বাইরে এসে আবার বিজিনেসে নামে। কিছুকাল মিটমাট করে ব্যবসা চালায়। আবার আরম্ভ হয় ঝগড়া-হাঙ্গামা। ঝগড়া-হাঙ্গামায় ছোট খোকাও জড়িয়ে পড়ে।

কোন একটা সিনেমা হলে নতুন ছবি এসেছে। মার-মার কাট-কাট ছবি। যে ছবিতে যত বেশি মারামারি ও যৌন আবেদন থাকে সেই ছবির টিকিটের চাহিদা বেশি। সুযোগ বুঝে সব দলই আগে টিকিট সংগ্রহ করে।

এবার মোকসেদ যে টিকিট ডবল দামে বিক্রি করছিল সেই টিকিট ঠোঁট কাটা রমজানের দল পঞ্চাশ পয়সা কম দামে বিক্রি করছিল। এ থেকেই হাঙ্গামা। শেষে বোমা ছোড়াছুড়ি। বোমার আঘাতে ছোট খোকার পা জখম হওয়াতে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল।

খবরটা রাজকুমার শুনে কোন কথা বলেনি।

নদেরচাঁদও শুনেছিল কিন্তু তার ভাইয়ের বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। অমর ও পচিবালা খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল।

ননীবালা চোখ মুছেছে।

মোকসুদই আদালতে মামলা পরিচালনা করেছিল। ছোট খোকা জামিনে খালাস পেয়ে ফিরে এসেছিল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। বাঁ পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। ভবিষ্যতে কোন কাজ কর্ম করবে এমন ভরসা ছিল না। আদালতে তখনও মামলা ঝুলছে। রেহাই পাবে কিনা কে জানে। মোকসেদ টাকা পয়সা খরচ করে সাক্ষী ভাঙ্গানোর চেষ্টা করছে। ঠোঁটকাটা রমজানের দলের যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মামলাও ঠোঁটকাটা রমজানই দেখাশোনা করছে।

হঠাৎ একদিন মোকসেদ আর ঠোঁটকাটা রমজানের বৈঠক বসল। অনেক আলোচনার পর তারা পরস্পরের শত্রুতাকে ভুলে যাবার অঙ্গীকার করে উভয়েই সাক্ষী ভাঙ্গানোর মহৎ কাজে ব্রতী হল। মামলা চলতে থাকে। সাক্ষীর অভাবে প্রায় ছয়মাস পরে সবাই খালাস হয়ে আবার তাদের পুরানো পেশায় ফিরে গেল।

কিন্তু খোঁড়া ছোট খোকাকে আর দেখা গেল না ব্লাকারের দলে।

এবার কি করবি তুই, জানতে চেয়েছিল ননীবালা।

এখনও ঠিক করতে পারিনি। তবে চুপ করে বসে থাকব না। তোদের ভাত গিলব না পয়সা না দিয়ে। তোর কাছে তো কিছু জমেছে। তাই দিয়ে আমার খরচ চালিয়ে নে। তারপর কিছু উপায়ের পথ দেখতে হবে।

আর কোন পাপ কাজ করিস না ছোট খোকা। দেখলি তো তার জন্য কত কষ্ট তোর।

ছোট খোকা হাসল। ছোট খোকা বুঝেছিল, ভাল হয়ে বাঁচার জন্য যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র পেষণ ও শোষণ সহ্য করতে হয় তা তার মত লোক সহ্য করতে রাজি নয়। ফুটপাতে যার জন্ম, ফুটপাত যার আশ্রয় তার কাছে পাপ

পুণ্যের চেয়ে বড় প্রশ্ন হল পেট। পেটে যাদের ভাত নেই, খিদে যাদের পশুর জীবনে ঠেলে দেয় তাদের কাছে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক সবই সমান।

তোরা তো ভাল মানুষ। তোদের এত কষ্ট কেন ?

ননীবালা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, কপাল। ভগবান আমাদের ছোট করেছে সহ্য করতে।

আমি তা মনে করি না দিদিমা। অনেক আছে আমাদের সামনে, আমরা নিতে জানি না।

নেবার তো অন্য পথ আছে।

কোন সময় ছিল, এখন আর অন্য পথ নেই। আমরা ঠকেছি, আমরা ঠকাব ও বাঁচব। ঠকাতে না পারলে বাঁচা যাবে না। জানিস দিদিমা, এই তো কদিন আগে হাওড়ার উড়াল পুলের তলায় একটা ছেলে পাওয়া গিয়েছিল বয়স তার সাত আটদিন। তাকে ফেলে পালিয়েছে তার মা, বাবা যে কে তাও কেউ জানে না। মা নিজের পেটে ভাত দিতে না পেরে কচি বাচ্চাকে ফেলে পালিয়েছে। কেন জানিস ? পেট, পেট। খিদেয় আর মানুষ মানুষ থাকে না জানোয়ার হয়ে যায়। তোরা পেট পালছিস কি করে, আর সেই মহাজন আর তার ছেলে নাতিপুতি পেট পালছে কি ভাবে তা ভেবেছিস কি কখনও। ভাল মানুষের দিন আর নেই।

ননীবালা মৃদুস্বরে বলল, ভাল মানুষ কষ্ট পায় ঠিকই কিন্তু এখনও কিছু ভাল মানুষ আছে বলেই চন্দ্রসূর্য উঠছে। দুনিয়ার চাকা ঘুরছে।

তুই ওই নিয়েই থাক। আমাকে আর ওসব কথা শোনাস না।

সব বিষয়েই রাজকুমার আজকাল নির্বিকার। বয়সের ভারে নুাজ দেহ। পলিত কেশ, হাত পায়ে জোর নেই। ননীবালা তার সহায় আর আহার্য জোটায় নদেরচাঁদ। কারও বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ নেই। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল কয়েকজন ছোট খোকার সমবয়সী জওয়ান ছেলে আসে ছোট খোকার সন্ধানে। তারা একটু আড়ালে বসে আলাপ আলোচনা করে, বিড়ি টানে কখনও ভাঁড় ভর্তি চা এনে খায়। কখনও এক ঘণ্টা কখনও দু'ঘণ্টা কথাবার্তা বলে তারা ফিরে যায়। রাজকুমার কোন সময়ই জানতে চায়নি এদের পরিচয় এবং এদের আসার কারণ। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এই জওয়ান ছেলেদের চলাচলটা একেবারে সন্দেহাতীত নয়। বরং মনে করা যায় ওরা কোন অকাজের পরামর্শ করতে আসে।

ছোট খোকা তার খোঁড়া পা নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। পা জখম হওয়াতে তার শরীর কিছু পঙ্গু হলেও মনের জোরে ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। অমর এসে ছোট খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। রাজকুমারের অসম্মতি ছিল না কিন্তু ছোটখোকা কোন ক্রমেই রাজকুমারের

আশ্রয় ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

এবার বর্ষায় ফুটপাতের জমিদারদের দুর্দশার আর শেষ ছিল না। বেশি বৃষ্টি হলেই ফুটপাতগুলো প্রায়ই ডুবে যেত। সবাই তখন উঁচু কোন রোয়াকে গিয়ে উঠত। বৃষ্টির জল যখন রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে এগিয়ে আসত তখন তার সঙ্গে ভেসে আসত নানা নোংরা বস্তু। মরা ইঁদুর, আরশোলা, পুরীষ। এসব থেকে নিজেদের বাঁচাতে রোয়াকে উঠে এরা ভিজত, সেই ভেজা কাপড়জামায় রাত কাটাত।

কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ শোনারও লোক নেই!

বর্ষা শেষ হলেই পুজোর মরশুম।

এতে কারও কোন ভূমিকা নেই।

কোথাও যদি কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা থাকে তা হলে এরা দল বেঁধে হাজির হয়। কোথাও কোন বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা থাকলে এরা আগে গিয়ে নাম লেখায়। এইটুকু পুজোর মরশুমে এদের জীবনে ব্যতিক্রম, বলা যায় আনন্দ।

ছোট খোকা বলল, এবার কালীপুজো করব।

সবাই বলল, কোথায়?

কেন এই খানেই। তোদের সবাইকে কিন্তু চাঁদা দিতে হবে।

সবাইকে ডেকে মিটিং করে আলোচনা হল। চাঁদা তোলার ও পুজো করার দায়িত্ব সবাই চাপিয়ে দিল ছোট খোকাকে।

রাজকুমার ছোট খোকাকে ডেকে বলল, এসব কি পাগলামি করছিস ছোট খোকা?

পাগলামি? তা বটে। আচ্ছা দাদু সারা বছর আমরা কি নিয়ে থাকব বলতো। এই তো কম পয়সায় একটু আনন্দ করব।

তা করবি কর। কালীপুজোর আনন্দটুকু যেন থাকে, অন্য কিছু না থাকে যেন।

এই কাজে বড় সহায় হল রিক্সাওলারা। তারাই চাঁদার মোটা অঙ্ক পুষিয়ে দিল।

প্রতিমা এল ফুটপাতে।

প্লাসটিক কাগজ দিয়ে মন্দির তৈরি হল। তাকে নানা রং-এর কাগজ দিয়ে সাজানো হল। পুজার উপকরণ এল কিন্তু এল না শুধু পুরোহিত। অজাত কুজাতের কালীপুজো বামুন ঠাকুর করতে রাজি নয় তবে যদি একখানা ধুতি, গামছা, লালপাড় শাড়ির সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয় তা হলে উৎকলী পুরোহিত কালীপুজো করতে রাজি।

সবাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ছোট খোকা পুরুত ঠাকুরের কথা মেনে নিল।

আতস বাজি এল, দীপান্বিতার আলো সাজানো হল। ফুটপাতের জমিদারদের কাছে এই পুজোটা মহা উৎসব। ছোট খোকা থেকে আরম্ভ করে রহিমুদ্দিনও এই উৎসব থেকে বাদ যায় নি। সবাই উৎসবে যোগ দিল সাগ্রহে।

পুজোর ফলাফল যাইহোক, মাঝরাতে দেখা গেল দল বেঁধে রিক্সাওলারা চোলাই খেয়ে কালী মূর্তির সামনে গড়াগড়ি দিচ্ছে। শেষ রাতে পুজোর সময় কারও কোন হুঁস নেই। মাতালের কণ্ঠে মা-মা শব্দ বিনা আর কোন শব্দ তখন বের হচ্ছিল না।

পুজো শেষ। বিসর্জন শেষ।

ছোট খোকা সব খরচ মিটিয়ে দেখল তার পকেটে বেশ কিছু টাকা থেকে গেছে। টাকার থলেটা ননীবালার হাতে দিয়ে বলল, গুণে দেখ।

এ টাকা দিয়ে কি করবি?

বারে, এত মেহনত করে কালী আনালাম, পুজো করলাম, তার মজুরী নেব না? এ টাকা আমার মজুরী বুঝলি।

পুজোর টাকা দশের টাকা। এটা তোর হবে কেন?

কেন? যে নিতে জানে টাকা তার, টাকা কারও নিজস্ব কিছু নয়। নিতে জানলেই টাকা সবার। কালীপুজো তো একটা ভড়ং, দেখ তো এই ভড়ং-এ কত টাকা পকেটে এসে গেল। এবার আরেকটা ফন্দী করতে হবে দিদিমা। তা হলেই বছরের খরচ তুলতে পারব। বোকা কালাচাঁদকে ঠকিয়ে মহাজনের পেট ভর্তি হয়েছে, বোকা মানুষগুলোকে ধর্মের নামে ঠকিয়ে আমাদের পেট ভর্তি করতে হবে। তাই করছি বুঝলি।

এই অধর্ম করতে পারলি তুই?

এটাই ধর্ম। এতদিন পেটের জ্বালা খ্যাপা কুকুরের মত আমাদের তেড়ে বেরিয়েছে। আর পেটের জ্বালা সহ্য করব না দিদিমা। আমাদের চেয়েও যারা বোকা তাদের পকেট কেটেই পেটের জ্বালা মেটাতেই হবে, কাজী টালি কিছুই নেই আমাদের। আমাদের আছে রাক্ষুসে পেট। সেই পেটের দায় মেটাতেই হবে।

ননীবালা রাজকুমারকে সব কথা বলতেই রাজকুমার চিন্তিত ভাবে বলল, এবার তল্পীতল্পা গুটিয়ে মাটির দেশে ফিরে চ। একটু খোলা আকাশের তলায় খোলা আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে শেষ কদিন কাটাতে চাই।

ননীবালা কোন কথা না বলে রাতের রান্না জোগাড় করতে গেল।

অনেক রাতে নদেরচাঁদ ফিরে এল। তাকে খেতে দিয়ে রাজকুমারের ইচ্ছাটা জানাল তাকে। নদেরচাঁদ বলল, দাদু ঠিকই বলেছে। আমাকে একটু ভাবতে দে।

এখনি তো যাওয়া হচ্ছে না। ভেবে চিন্তে বলব।

নদেরচাঁদ ভেবে ঠিক করার আগেই আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেল ফুটপাতের জমিদারদের জীবনে। জরিনাবিবি তার কোলের ছেলেটা নিয়ে ফুটপাতে আস্তানা নিয়েছিল। স্থান পেয়েছিল একটা গাড়ি বারান্দার তলায়। জরিনা জানে হিন্দু পাড়ায় মোল্লাদের ঘরের কাজ নাও দিতে পারে। সে জন্য সে জরিনা নামটা বদলে ছবি নামটা চাউড় করেছিল। আমানত আলি কাগজ কুড়াতো। সেও হিন্দু পাড়ায় এসে নাম বদলে শম্ভুচরণ হয়েছিল। ছবি ঠিকা ঝিয়ের কাজ করত আর আমানত ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়াত। দুজনেই থাকত একই গাড়ি বারান্দার তলায়। পরিচয় তাদের ফুটপাতে।

আমানত পুরানো কাগজ বিক্রি করে যা পেত তা থেকে হোটেলে এক বেলা খেয়ে এসে যখন গাড়ি বারান্দার তলায় চট বিছিয়ে বসত তখন তার আশে পাশে আরও কয়েকজন গুটি গুটি পায়ে এসে বসত। আমানত কাজ থেকে ফেরবার পথে এক পুরিয়া গাঁজা নিয়ে আসত। সেই গাঁজা কল্কে ভরে সবাই মিলে হাত বদল করে মৌজ করত।

জরিনা ওদের কাজ কর্ম দেখত। সেও কাজের শেষে পঁচিশ পয়সার বিড়ি নিয়ে আসত। সেও বিড়িতে আগুন দিয়ে সুখটান দিত।

কি করে যে ওদের পরিচয় হল তা কেউ বলতে পারে না। ফুটপাতের জমিদারদের এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর কোথায়।

জরিনা তার ঘুমন্ত কচি ছেলেটাকে রেখে খুব সকালে কাজে বের হত। ছেলেটা অঘোরে ঘুমুতো। জরিনা আমানতকে বলে যেত, এই শম্ভু, ছেলেটাকে দেখিস।

আমি আর কতক্ষণ।

যতক্ষণ থাকিস, একটু দেখিস। আমিও দাশবাবুদের বাড়ির কাজ শেষ করে সকাল সকালই ফিরব। শম্ভুচরণ ওরফে আমানত ময়লা কাগজের বস্তাটা ঘাড়ে তুলে নেবার সময় ছেলেটা হয়ত কেঁদে উঠত। তার কান্না থামাতে গা থাবড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করত। এর মধ্যেই জরিনা কোন কোন দিন ফিরে আসত কাজ থেকে।

পরিচয় নয়। পরিচর্যা থেকেই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

জরিনা আমানতকে খুব পছন্দ করত না কিন্তু তার ছেলের জন্য বিস্কুট রুটি বলা অনেক সময়ই নিয়ে আসত আমানত। একদিন জরিনা প্রস্তাব দিল, তুই আর হোটেলে খাসনে শম্ভু আমি তোর ভাতটাও ফুটিয়ে দেব। চালটা কিনে দিয়ে যাস।

আমানত যেন হাতে স্বর্গ পেল কিন্তু এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে পারেনি তারা দুজনেই। খাওয়ার সময় দুজনেরই খটাখটি লেগে যেত মাঝে মাঝে। শম্ভু

বলত, সব চাল তো আমি দেই, তুই একটা ভাল করে তরকারী জোগাড় করতে পারিস না !

জরিনা রেগে গিয়ে বলল, তোর ব্যবস্থা তুই করে নে। চাল আর দিতে হবে না। আমি তোর ভাত ফুটাতে পারব না। আমি কি তোর ঘরের মাগ।

পাশেই বিহারী মুচি লচ্ছুরামের বাঙ্গালী বউ মঙ্গলার সংসার। লচ্ছুরাম ফুটবল মেরামত করে, জুতার কাজ করে না। জুতোর কাজ ছোট কাজ, ফুটবলের কাজে সম্মান আছে। এই সম্মানের বড় অংশীদার মঙ্গলা। আমানত আর জরিনার ঝগড়া শুনে আগাগোড়াই চুপ করে ছিল। সেদিন আমানত আর জরিনা বিশেষ পর্যায়ে উঠল তখন মঙ্গলা জরিনাকে লক্ষ্য করে বলল, তোর ছেলে পাহারা দেবে শম্ভু, তুই ভাত রেধে খাওয়াস শম্ভুকে, আর সতীগিরি করিস কেন ? ওর গলায় ঝুলে পড়লেই পারিস।

ব্যস। আর রক্ষা আছে !

জরিনা কলহে ফুটপাতের সবাইকে হার মানাতে পারে। লচ্ছুর কোন সন্তান নেই। জরিনা শম্ভুকে ছেড়ে মঙ্গলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তুই তো মাগী বাঁজা। তোর অত রবরবা কেন ! আমার তো পেটের ছেলে আছে।

মঙ্গলাও কম নয়। সে বলল, ছেলের বাবা কি শম্ভু না আর কেউ।

তা দিয়ে তোর দরকার কি। তোর ভাতার তো কেড়ে নেই নি। বাঁজা মাগীর গলায় জোর আছে। তোর কপালে ঝাঁটা। সকালে তোর মুখ দেখলে অযাত্রা।

আমানত এই অবসরে চটের বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ওদের ঝগড়া তখন তুঙ্গে। চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। অশ্লীল খিস্তিতে ফুটপাত তখন গরম। পাড়ার কজন জওয়ান ছেলে এসে শাসানি দেওয়াতে তখনকার মত কোঁদল থামল। গজরাতে গজরাতে দু'জনে নিজের নিজের আস্তানায় গিয়ে বসল।

রাতের বেলায় ফুটপাতের জমিদাররা বসল শালিশে। সবাই বলল, ছবি, তোকে বিয়ে করতে হবে শম্ভুকে। কালই কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে আসবি।

জরিনা কিছুটা রাজি হলেও আমানত রাজি হল না।

কেউ কিছু বুঝল না কিন্তু ওদের জীবন যাত্রায় কোন প্রতিবন্ধকও কেউ হল না।

আবার ওদের কাজকর্ম আগের মতই চলতে থাকে।

জরিনা আগের মতই ছেলেকে বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে। ফুটপাতের পাশে দোকানগুলো যখন রাত সাতটার পর বন্ধ হয়ে যায় তখন অন্যান্য সবাইয়ের মত জরিনা রাঁধতে বসে। তার ছেলে শাহু ওরফে শাহজান তখন আমানতের কোলে বসে দোল-দোল খেলে। আমানতের কল্কের সঙ্গীরা আসলেই গাঁজার

পুরিয়াটা তাদের হাতে তুলে দেয়। তারাই গাঁজা কেটে কল্কেতে ভর্তি করে। আগুনও দেয় তারাই। হাত ঘুরে কল্কেটা আমানতের হাতে পেঁছালেই শাহুকে মাটিতে বসিয়ে দু'হাত জোড় করে কল্কেটা চেপে ধরে কসে কয়েকটা টান দিয়ে কল্কেটা ফিরিয়ে দেয়। হাত বদল হতে হতে একসময় কল্কের আগুন নিভে যায়। সবাই ফিরে গেলে ঢুলু ঢুলু চোখে জড়িত কণ্ঠে আমানত বলে, ছবি তোর রান্না হল ?

তোর খিদে পেয়েছে ? এই তো গাঁজা খেলি ওতে বুঝি পেট ভরল না।

তুই তো বিড়ি খাস। তাতে তোর পেট ভরে। সবই নেশা, নেশা মানুষকে খায়, নেশায় পেট ভরায় কি কারও ? নেশা নেশা। তাতে তোর কি বলার আছে। খেতে দিস তো দে, নইলে চললাম হোটেলে। কাউকে এই মিঞা খোসামোদ করে না জানিস ?

আচ্ছা রাগ করিস কেন ? গাঁজাও খাবি ভাতও খাবি, তবেই তো তুই আমানত। আমি কিন্তু নিজেকে তোর কাছে আমানত রাখতে পারব না। পায়ে শেকল পরার মেয়ে আমি নই। একটু চুপ করে বসে সাহুকে খেলা দে। আমিও গরম গরম ভাত দেব তোকে।

তোর তো বড়ই দেমাক।

তা বলতে পারিস। দেমাক থাকবে বই কি। ওই শোন্ সামনের বাবুদের বাড়িতে পোষা কোকিল ডাকছে। ওর সঙ্গী আসছে না। কোকিলের মত খাঁচায় বসে আমি কাউকে ডাকি না। আমি আজাদ। আমি ডাকলে তোরা পেছন পেছন ঘুরবি।

খাওয়া দাওয়া শেষ করতে দশটা বেজে গেল।

সবাই তখন শুয়ে পড়েছে।

আমানত শোয় একটু দূরে। জরিনা উঠে গেল তার কাছে। জিজ্ঞেস করল, সেদিন তুই বিয়ে করতে রাজি হলি না কেন ?

আমরা মোল্লা। কালীঘাটে কেন বিয়ে করব।

তোর মত শয়তান এই দুনিয়াতে নাই। বিয়ে তো বিয়ে, সে বিয়ে কালী-ঘাটে হলেই বা দোষ কি, আর মসজিদের উকিলে বিয়ে দিলেই বা লাভ কি। বাস করব তো আমরা দুজন। মনের মিল না হলে তুই আমাকে ছেড়ে পালাবি, না হলে আমি তোকে ছেড়ে পালাব। যত দিন এক সঙ্গে থাকব ততদিনই আমরা স্বামী আর স্ত্রী, নইলে কেউ নয়।

বুঝলাম, কিন্তু তোর শাহু কি আমাকে বাপ্ বলে ডাকবে।

শেখালেই ডাকবে। ওকি কখনও জানবে ওর বাবার হদিস। এই ফুটপাতে এমন হাজারো বাচ্চা কাচ্চা আছে। তারাও তো জানে না তাদের বাবার হদিস।

যা তুই শুয়ে পড়। পরে ভেবে চিন্তে কিছু করব। আবার তো কয়েক

গণ্ডা ছেলে হবে। কি খাওয়াবি তাদের। একটাকেই তো পালতে পারছিস না। তুই তো নগদ পেলেই খুশী, আমার তো ধারের কারবার।

সবই খোদার দান। খোদাই খাওয়াবে।

আমানত হাসল।

হাসছিস কেন? বিয়ে করার সময় তুই মোল্লা আর ছেলে পালতে খোদার কথা ভুলে গেলি। পেটের দায়ে তুই হলি শম্ভূ আমি হলাম ছবি। তাই কালীঘাট না পছন্দ কেন?

আমানত হাসল।

হাসছিস। তোর মত শয়তান আর দেখিনি।

গাঁজার নেশা তখনও ঢিলে হয়নি। আমানত বলল, যেমন শালার খোদা তেমনি শালার বিয়ে। তুই যা এখান থেকে।

জরিনা উঠে গেল তার ছেলের কাছে। ছেলেকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে নিজে নিজেই বলল, কোন শালা আর বিয়ে করে।

জরিনা আর আমানত ফুটপাতের জমিদারীতে পাশাপাশি শোবার অধিকার অর্জন করেছিল কিনা তা কেউ জানে না। তবে কিছুকাল পরে আমানত কোথাও গা ঢাকা দিল। জরিনা আমানতের আগমন ও নিষ্ক্রমনের জন্য একবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, ওরা শয়তান। মেয়ে মানুষদের ছিঁড়ে খায়। ঘর করে না। থু-থু।

রাজকুমার তার অক্ষম দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে প্রথম যখন সে এসেছিল কলকাতা শহরে তখন তার যে উৎসাহ ছিল নিজেকে গড়ে তোলার সে উৎসাহে শুধু ভাটা পড়েনি চিরতরে তা লুপ্ত হয়েছে। তবুও সে হয়ত লড়াই করে কিছুটা সুস্থ জীবন পেতে পারত কিন্তু ননীবালার দেহটা হঠাৎ কেন বা ভেঙ্গে পড়ল। তার চেয়েও রুগ্ন হয়েছে ননীবালা। তাকে নিয়েও বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অমরচাঁদ মাঝে মাঝে আসে, খবর নেয়। তার করার কিছু নেই সে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

নদেরচাঁদ তখনও হাল ছাড়েনি। কঠিন ভাবে লড়ে চলেছে সবাইকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাটল থেকেছে তাদের জীবন ধারায়। এই ফাটল মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। যতবার সে এগিয়েছে ততবারই পিছিয়ে আসতে হয়েছে অনিবার্য কারণে।

মেনকা কোথায় হারিয়ে গেছে। তার কথা সবাই ভুলে গেছে। রাজকুমার সব সময়ই ভাবে কত আসে কত যায় কে কার হিসাব রাখে। জলে আঁচড় কাটলে তো দাগ পড়ে না। কলকাতা শহরটা হল সীমাহীন একটা জলাশয়। এই জলাশয়ে কে এল, কে গেল তার জন্য কোন তরঙ্গ ওঠে না। কখনও কখনও

বুদবুদ ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

বহুদিন আগে ওড়িষা থেকে এসেছিল একদল নারীপুরুষ। তারা খবর নিয়েই এসেছিল কোথায় তাদের দেশের মানুষরা আস্তানা করে বাসা করেছে। দু-একদিন ফুটপাতে ঘোরাফেরা করে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়ে ফিরে গেছে।

যে অত্যুগ্র আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় তার গতিপ্রকৃতি সব সময় সমাজবোধ নিয়ে এগিয়ে চলে এমন তো হয় না।

রাজকুমার দেখেছে ভাল মানুষগুলো কিভাবে অমানুষে পরিণত হয়েছে। সহজ সরল মানুষগুলো কলঙ্কহীন জীবন যাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। সবার সামনেই একটা প্রশ্ন, জন্মের দায়িত্ব পরিহার করলেও বাঁচার অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। এই বাঁচাটা মানুষের মত অথবা পশুর মত তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারে না তার মত ফুটপাতের অধিবাসীরা।

রাজকুমার হারিয়েছে অনেক কিন্তু হারায়নি তার পারিবারিক বোধ। ননীবালাও পায়নি কিছুই কিন্তু পেয়েছে পরিবার ধর্মী হবার মত মন। দারিদ্র ও লাঞ্ছনা তাকে বহুভোগ্যা না করে স্নিগ্ধ পল্লীর অবগুণ্ঠিত বধুর নির্মম মর্যাদা দিয়েছে।

নদেরচাঁদ!

কাজে অকাজে শহরের বাইরে যখনই গিয়েছে তখন তার মনে স্বপ্নের মত জেগেছে ছায়াশীতল একটি পল্লীর কাল্পনিক ছবি। এই ছবি-ই বোধ হয় তাদের পিতৃপুরুষ হারিয়েছে, তাদের আকুতি আছে ফিরে যাবার কিন্তু সঙ্গতি নেই।

কতদিন সে শুনেছে তার ঠাকুমার কাছে তার প্রথম জীবনের কথা। কিশোরী হবার আগেই তাকে তুলে দিয়েছে একটা পরপুরুষের হাতে, যাকে আজ অবধি স্বামী বলেই মেনে আসছে। যে বয়সের শিশু কিশোররা মাঠে ঘাটে খেলে বেড়ায় সেই বয়সে পুতুল খেলার আমেজ ভুলে তাকে রাজকুমারের হাত ধরে কালাচাঁদের ভাঙ্গা ভিটেয় আসতে হয়েছিল।

ননীবালা শান্ত মেয়ে, তার সব সঙ্গী তো তার মত শান্ত ছিল না। তারা পুকুরে ঝাপাই পিটেছে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আমগাছ তলায় আম কুড়িয়েছে, পেয়ারা গাছতলায় সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকেছে একটা পাকা পেয়ারার জন্য। এসব দিন কখনও যে ফিরে আসবে না তা জেনেও তাদের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

ননীবালার রোগের লক্ষণ ভাল নয়।

তার কাতরাণিতে রাজকুমার ভাল করে ঘুমাতে পারে না। মাঝে মাঝে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, তোর কি কষ্ট-রে বউ?

বউ হাত মেলে ধরে কি যেন বলতে চায় অথচ বলতে পারে না। অতৃপ্ত

আত্মা কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

রাজকুমার কিছু না বুঝেই বলে, হবে হবে।

কি হবে তা রাজকুমারও জানে না ননীবালাও জানে না। অজানা যা হবে তার জন্য তাদের কোন মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না।

ননীবালা কিছুটা সুস্থ হয়েই বলেছিল, আমাকে গাঁয়ে নিয়ে চ।

রাজকুমার বিমর্ষ ভাবে বলল, সেখানে তো কেউ নেই।

ননীবালা জোর দিয়ে বলল, আছে রে আছে। বাড়িঘর নেই, ফসলের ক্ষেত নেই। আত্মজন কেউ নেই, তবুও মাটিতো আছে। মাটি আমাদের মা। সেই মায়ের কাছে যাব। মা কোল পেতে রেখেছে। সেই কোলে মাথা রেখে মরব।

চাঁদুকে বলে দেখি। অমর কি বলে শুনে নেব। তারপর।

তুই যাবি না।

যাব রে যাব। তবে এখুনি নয়।

হঠাৎ সেদিন হেঁপো গোবরার বউ মীনু এসেছিল নদেরচাঁদের খোঁজে।

রাজকুমার বলল সে কাজে বেরিয়েছে।

কখন আসবে ?

তার কি ঠিক আছে রে মা, পেটের দানা জোগাড় না করে তো ফিরবে না। তবে সকাল সকালই তো আজকাল আসে। তুই বস।

একটু ইতস্তত করে হেঁপো গোবরার বউ বসল।

সন্ধ্যে না হতেই নদেরচাঁদ রিক্সা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল।

ননীবালা কোনরকমে উঠে বসে বলল, কি খাবি রে চাঁদু।

হেঁপো গোবরার বউকে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোর কি খবর বউদি ?

খবর নেই। তোকে দেখতে এলাম।

আমাকে দেখতে! আশ্চর্য! কোন মতলব না থাকলে কি কেউ আসে ? বল্ এবার আর কি হুজ্জত হয়েছে ?

আমরা তো রইছি রেল লাইনের ধারে।

শুনেছি।

এবার হটতে হবে। লাইন বসবে, রাস্তা খালি করতে হবে।

চিংড়িঘাটা থেকে খেদিয়েছে। এখন মাকে নিয়ে কোথায় যাই বল। বুড়ী নড়তে পারে না। পেটের দায় তো আছে।

এর মধ্যেই ননীবালা মুড়ি আর তেলেভাজা এনে সামনে রাখতেই চাঁদু বলল, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, পেটে পড়েনি। তুইও খা বউদি, লজ্জা কিসের। আমার ঠাকুমা, তোর কথা মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করে। নে খা।

খেতে খেতে নদেরচাঁদ বলল, তিনচার দিনেই তো তাড়াবে না।

কি জানি।

দেখি কিছু ব্যবস্থা হয় কি না। তিনচার দিনের মধ্যে যা হয় করব। তবে কি জানিস, আমি নিজেই খোঁড়া চলতে পারি না। আরেকটা খোঁড়াকে কতদূর টানতে পারব বলতে পারি না। তোর কাছে টাকা পয়সা আছে? নেই, এই নে দশটা টাকা। তিনচার দিন পর আসবি কিন্তু।

রাজকুমার আর ভাল করে নড়াচড়া করতে পারে না! ননীবালা কিছু সুস্থ হলেও মাঝে মাঝেই জ্বরে ভুগছে। নদেরচাঁদ অনেক ভেবে-চিন্তে রাজকুমারকে বলল, এবার দেশেই ফিরব দাদু।

তোর বাবা যাবে না?

বাবা যেতে চায় না। বলে কালাচাঁদের ভিটা দখল না পেলে আর যাব না।

ওটা আর হবে না।

নদেরচাঁদ বলল, হবে। আমি খবর করেছিলাম। মহাজনের নাতি অমূল্য ভিটা ফেরত দেবে তবে দাম দিতে হবে দু'হাজার টাকা।

দুশ টাকার বদলে সব গেছে। আবার দু'হাজার টাকা। কোথায় পাবি এত টাকা। ভিটে নিলেও তো পেট চালাতে হবে।

চলবে। আমার রিক্সাটা বেচে দেব। বারশ টাকা দাম পেয়েছি।

অত দাম দেবে?

লাইন্সেসটা দেব। তাই দাম পাব। ওখানে গিয়ে একটা সাইকেল রিক্সা কিনব। মেহনত করব। ঠিক চলে যাবে।

নদেরচাঁদ ধীরে ধীরে সব কিছু ব্যবস্থা করে একদিন দুপুরের ট্রেনে রাজকুমার আর ননীবালাকে নিয়ে রওনা হল।

ট্রেনে উঠবার কিছু পরেই ননীবালার প্রবল জ্বর ও কাশি দেখে রাজকুমার চিন্তিত হল।

আজ আর যাব না রে চাঁদু।

কেন?

তোর ঠাকুমার শরীরটার গতিক ভাল নয়।

নদেরচাঁদ ননীবালার মাথার কাছে বসে বলল, তুই কি বলছিস দিদিমা?

যাব। কোন ভয় নেইরে চাঁদু। কত বছর পর গাঁয়ের মাটিতে পা দেব, গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে দেখা হবে। তারপর! মরতে তো হবেই। দুদিন আগে আর পরে।

তোকে মরতেই দেব না দিদিমা। এত কষ্ট করলাম। রাক্ষুসে খিদের হাত থেকে বাঁচতে জানোয়ারের মত দিন কাটালাম জন্ম থেকে। আজ অবধি কেবল শুনলাম খিদের জ্বালায় আমাদের মত হাজার হাজার মানুষের কান্না। দেখলাম তাদের নোংরা জীবন। আমরা ন্যাংটো খিদের হাত থেকেই তো

মুক্তি চেয়েছি। জল খাবি দিদিমা। এই নে।

ননীবালা জল খেয়ে চোখ বুজল। দেহটা তপ্ত কিন্তু তাপের পরিমান কেউ ঠিক করতে পারল না। ঠিক করার কোন উপায়ও জানা নেই।

রাজকুমার এগিয়ে এসে ননীবালার পাশে বসে ডাকল, বউ।

ননীবালা চোখ মেলে তাকাল। তার চোখের কোণে জল।

তুই একটু মন শক্ত কর। শেষ সময়ে যাতে মাটির ছোঁয়া পাই তার চিন্তা কর।

হাঁপাতে হাঁপাতে ননীবালা বলল, আমি তো সেটাই চাই।

খবর পেয়ে মীনু এসেছিল স্টেশনে।

ট্রেন ছাড়বার আগে মীনু এসে জানালার ধারে উঁকি দিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

নদেরচাঁদ মীনুকে দেখতে পেয়ে বলল, কি খবর বউদি?

তোমার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম তোমরা সবে রওনা হয়েছ। সেই জন্য ছুটে এলাম দেখা করতে। তুমি তো ফিরে আসবে?

আসব। তবে দেরি হবে। তোমাদের ঝুপড়ি তো ভেঙ্গে দিয়েছে পুলিশ। এখন আছ কোথায়? তোমার মা ভাল আছে তো?

আছি অনিলের বাড়িতে।

কোন্ অনিল?

চিনতে পারলে না। সেই যে ভোটের সময় তোমাদের সঙ্গে কাজ করত। অনিল গোমেস।

গোমেস। তাই বল। সেই যে মোটা মত বেঁটে খাটো মরদ। তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

মৌলালির বাজারে মাছ নিয়ে বসেছিলাম। সেখানে অনিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতেই বললাম, আছি ফুটপাতে।

গোমেস বলল, ওখানে কেন। আমার দাওয়াতে চলে এস। যতদিন কোন সুবিধা না হয় আমার কাছেই থেক দিদি।

তাই করলাম। ভাবলাম নদেরচাঁদ একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। তোমার খোঁজে গিয়ে শুনলাম তোমরা রওনা হয়ে গেছ। তাই ছুটে এলাম।

নদেরচাঁদ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বেশ তুমি এখন গোমেসের বাড়িতেই থাক। আমি দাদু দিদিমাকে পেঁছে দিয়ে কদিন পরেই ফিরব। তখন যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

মীনু নদেরচাঁদের কথায় মোটেই আশ্বস্ত হল না। বলল, নিজের আস্তানা না হলে রোগা মাকে নিয়ে খুবই কষ্ট হবে। তুমি একটু তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।

নিশ্চয়। আমি মাঠপুকুরে একটা ঘরের কথা বলেছি?

ননীবালা মৃদুস্বরে বলল, কে এসেছে রে চাঁদু ?

মীনু বউদি, হেঁপো গোবরার বউ। আমরা চলে যাচ্ছি তাই দেখা করতে এসেছে।

খুব ভাল মেয়ে। ভেতরে ডেকে নে।

বউদি ভেতরে এস। দিদিমা তোমার সাথে কথা বলবে।

মীনু ভেতরে আসতেই রোগা হাতটা মীনুর মাথায় রেখে ননীবালা বলল, সুখে থাক মা।

সুখ, বলে মীনু কেঁদে ফেলল।

কাঁদছিস কেন ? কাঁদার দিন তো শেষ হয়নি, কাঁদার জন্য অনেক দিন পাবি। আমি বলছি তুই সুখী হবি।

গাড়ির ভোঁ শোনা গেল।

গাড়ি ছাড়ছে বলেই মীনু দ্রুতপদে গাড়ি থেকে নেমে এল। জানালার কাছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার সম্মুখ দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। মীনু উদাসভাবে গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ি চলছে। থামছে আবার চলছে।

কয়েক ঘণ্টার পথ। অথচ মনে হচ্ছে বত ঘণ্টা কেটে গেছে তবুও গন্তব্য স্থানে পেঁছিতে পারছে না তারা। ননীবালা হাঁপাচ্ছে। রাজকুমার পাশে বসে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছে, বউ কিছু বলতে চাস ?

না। মথরোপুর আর কতদূরে অমরের বাপ্ ?

এই এসে গেলাম।

রাজকুমার গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। সেই গাছ, সেই মাঠ, সেই সব বাড়িঘর তবুও কত অচেনা হয়ে গেছে। কত পরিবর্তন হয়েছে পরিবেশের। রেল স্টেশনগুলোর চেহারাও বদলে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক ভেঙ্গে।

ধীরে ধীরে গাড়ির ভিড় কমতে থাকে। জয়নগরে গাড়ি প্রায় হাল্কা। এর পরেই মথুরাপুর।

মথুরাপুরে গাড়ি যখন এল তখন ননীবালার আর নড়ার ক্ষমতা ছিল না। নদেরচাঁদ আর রাজকুমার ধরাধরি করে প্ল্যাটফরমে তাকে নামাল। পড়ন্ত বেলায় ননীবালা চারিদিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে দেশে এসে গেলাম। কত বছর পর ? তিরিশ। দূর। আরও বেশি, হিসাব নেই।

রাজকুমার বলল, এবার তুই তো খুশী।

ননীবালার শুকনো মুখে মৃদু হাসির ছাপ।

রাজকুমারের হাত ধরে বলল, তুই যা পারলি না, তোর নাতি তা করল।

কেমন একটা হাসি ফুটে উঠল রাজকুমারের মুখে, বলল, এক কালাচাঁদ, দুই

ফকিরচাঁদ, তিন নফরচাঁদ, চার রাজকুমার, পাঁচ অমরচাঁদ, ছয় নদেরচাঁদ। ছয় পুরুষ আগের তিনশ টাকার কর্জা শোধ করতে হবে রে বউ। এখনও গাঁয়ের মাটিতে পা দিতে পারিনি, গাঁয়ে পেঁছে তখন বলব, আমার নাতিই পেরেছে অসাধ্য সাধন করতে। পাপ। পাপ রে বউ। গরীব হওয়ার পাপ। এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। ছয় পুরুষে পাপ মুক্তি ঘটবে।

নদেরচাঁদ বলল, একটা ভ্যান পেয়েছি। চল দিদিমাকে নিয়ে। একেবারে মণি নদীর ঘাট অবধি যাব। তারপর নদী পার হয়ে হাঁটাপথ।

রাজকুমার বলল, জানি। যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে রে চাঁদু। আজ বিষ্টুপুরে থেকে গেলেই ভাল হত।

বিষ্টুপুরে কোথায় থাকবি।

ইস্কুলের বারান্দায়। তোর ঠাকুমার যে জ্বর কমেনি। আমি ভয় পাচ্ছি।

এখন চ। দেখি কি করলে ভাল হয়।

কিছুক্ষণ পরেই নদেরচাঁদ এসে বলল, ভ্যান পেয়েছি। মণির তটের ঘাট অবধি নিয়ে যাবে।

ঘাট পেরোবি কি করে। রাতের বেলায় ফেরী বন্ধ।

সন্ধ্যের আগেই পেঁছে দেবে। তবুও যদি রাত হয় জেলেদের অনেক নৌকা ঘাটে থাকে। বলে কয়ে পার হওয়া যাবে। নইলে ঘাটেই গাছতলায় রাত কাটিয়ে সকালে নদী পার হব। ভালই হবে। ওখানে দুটি ভাত ফুটিয়েও নিতে পারব।

যুক্তিটা সবাই মেনে নিল।

ননীবালাকে কোন রকমে ভ্যানের ওপর শুইয়ে রাজকুমার আর নদেরচাঁদ তার দু'পাশে বসল।

ভ্যান চলতে থাকে।

নদেরচাঁদ বারবার বলতে থাকে একটু আস্তে চল, বেমারি দিদিমার কষ্ট হচ্ছে।

আকাশে তখন পঞ্চমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। মিষ্টি বাতাসে গাছের মাথাগুলো দুলছে। অনেকদিন গ্রামের চেহারাটা ভাল করে দেখতে না পেলেও ভালই লাগছিল রাজকুমারের। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই পথেই ননীবালা আর অমরের হাত ধরে রাজকুমারের পেটের জ্বালা মেটাতে বের হয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। সে সময় বাঁধানো রাস্তা ছিল না। ভ্যান ছিল না। পায়ে হেঁটেই তাকে যেতে হয়েছিল। সে দিনগুলো এখন তার কাছে স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন মিলিয়ে গেলে নতুন পরিবেশটা ভালই লাগছিল তার।

ভ্যানচালক জিজ্ঞাসা করল, তোদের ঘর কোন্ গাঁয়ে ?

নদেরচাঁদ বলল, মাছতলি।

তোদের তো কখনও দেখিনি। মাছতলির সব লোককেই তো আমি চিনি।

রাজকুমার অতি ধীর গলায় বলল, কি করে চিনবি। তিরিশ চল্লিশ বছর আগে আমরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তখন তো তুই জন্মাসনি।

তা বটে। তোর বাড়িতে কে থাকে ?

বাড়ি ? কেউ থাকে না। ছিলও না।

তা হলে আর তোদের বাড়ি নেই। বেদখল হয়ে গেছে।

আশ্চর্য কি ?

দেখতে দেখতে বিষ্ণুপুর বাজারে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

তোর নাম কি ?

মনসা তিওর।

তুই এখানে একটু দাঁড়া। কিছু মুড়ি আর গুড় কিনেনি।

নদেরচাঁদ দোকান থেকে মুড়িগুড় নিয়ে ফিরতেই আবার ভ্যান চলতে থাকে।

রাজকুমার বলল, রাস্তাটা বেশ ভালই করেছে সরকার। চাঁদের আলো চিক্ চিক্ করছে। তবে পুরানো দিনের মিঠে গন্ধ আর নেই বাতাসে, পুরানো দিনের মানুষও আর নেই। হাঁরে চাঁদু, সব তো হল, এবার বিয়ে কর।

করব রে করব। মনের মতন বউ পাচ্ছি না।

বললেই আমরা খুঁজব। তোর হেঁপো গোবরার বউ মীনুটা এখন কোথায় থাকে ?

অনিলের বাড়িতে।

আমি বলছিলাম কি।

কি বলতে চাস ? মীনুকে ঘরে নিয়ে আসতে হবে। তা হবে না দাদু। হেঁপো গোবরা ছিল মস্ত গুণ্ডা। তার বউ গুণ্ডামি ছ্যাঁচড়ামির পয়সা খেয়েছে। আমাদের তো অনেক টাকা নেই, হেঁপো গোবরা ওকে রাজার হালে রেখেছিল, তা কি পারব ? এখনও ভেরির চোরাই মাছের কারবার করে। আমার মত লোক ওর মত মেয়েকে পুষতে পারবে কি ? ও কথা ভুলে যা।

রাজকুমার বলল, তা বটে। তা হলে তোর আর বউ জুটবে না রে।

কি বলিস, ওই যে ছবি, ওর একটা বোন এসেছে কয়েকদিন হল। দেখতেও যেমন কাজেও তেমন। যখন মনে করব তখন ওকেই বিয়ে করব। ছবি তো কয়েকবার বলেওছে।

ওদের বাবা মায়ের হদিস জানিস ?

জানি। হিজলবেড়িয়ার মোল্লা ওরা।

রাজকুমার কোন কথা বলল না।

ভ্যান তখন প্রায় নদীর কিনারায়।

কথা বলছিস না কেন ? পছন্দ হল না বুঝি। আমার মা-ও তো মোল্লার

মেয়ে। আমাদের কি কোন জাত ধর্ম আছে, আমাদের কি কোন ভগবান আর খোদা আছে। যতদিন গতর আছে ততদিন সবাই বলবে মানুষ। মনের মত কাজ না করলে বলবে জানোয়ার। ওসব কথা ছাড়। মনসা এখানেই গাড়িটা রাখ। আমি দেখে আসি ওপার যাবার কোন নৌকা পাই কিনা।

এতটা পথ ননীবালা মরার মত ভ্যানে শুয়েছিল। ওর কানে কোন কথাই ঢোকেনি। প্রবল জ্বরে তখনও সে বেহুঁস। ভ্যানের ঝাঁকুনীতে দেহটা কাত হলেই রাজকুমার সন্তর্পণে ননীবালাকে চেপে ধরছিল। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিল, তোর কষ্ট হচ্ছে কি বউ? ননীবালা কোন জবাব দিতে পারছিল না। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল আর কোন রকমে তাকিয়ে দেখছিল।

পঞ্চমীর চাঁদ তখন মিটমিটিয়ে এসেছে। নদেরচাঁদ কোন নৌকার হদিস করতে না পেরে ফিরে এসে বলল, না হল না। আজ রাতে ওই গাছতলাতেই বসতে হবে। ঠাণ্ডা বেশি মনে হচ্ছে। ঠাকুমাকে ওখানে চট বিছিয়ে শুইয়ে দি।

রাজকুমার গাছতলায় চট বিছিয়ে দিল।

দুজন ধরাধরি করে ননীবালাকে শুইয়ে দিল চটের ওপর।

সামনে নদী অথচ জল খাবার যোগ্য নয়। একটা বোতলে খাবার জল ছিল তা থেকে কিছুটা ননীবালার মুখে ঢেলে দিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসে রইল।

লোকালয় শূণ্য ফাঁকা মাঠে খোলা বাতাসের দাপটে সবাই বেশ শীত শীত অনুভব করছিল। নদেরচাঁদ দেশলাই হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। শুকনো ডালপালা খুজতে খুজতে কিছু দূরে গিয়ে তার মনে হল কয়েকজন লোক যেন জটলা করছে একটা গাছতলায়। কেমন সন্দেহ হল। চুপ করে বসে রইল একটা ঝোপের পেছনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা উঠে চলে গেল।

দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিশে গেল।

নদেরচাঁদ ফিরে এসে দেখল ননীবালার পাশে বুকের সঙ্গে হাঁটু চেপে রাজকুমার ঘুমিয়ে গেছে।

ননীবালার গায়ে হাত দিয়ে মনে হল তার দেহের তাপটা যেন কম।

বসে রইল ননীবালার পাশে। দেখতে দেখতে সকাল হল। রাজকুমারকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলে বলল, দেখ তো দাদু দিদিমার দেহের তাপ যেন নেই।

রাজকুমার ননীবালার গালে গাল দিয়ে বলল, বরফ!

বরফ? মানে?

একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। ও বউ, বউ।

বউ কোন জবাব না দেওয়াতে তাকে ধাক্কা দিল কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। অসার তার দেহ। চোখের পাতা তুলে দেখল চোখের মণি-স্থির।

রাজকুমার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

তোর ঠাকুমা আর নেই রে চাঁদু! সব শেষ!

নদেরচাঁদ বার বার ননীবালার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে কোন রকম তাপ নেই দেখে সেও কেঁদে উঠল। তখনই তার মনে হল এ মৃত্যু তো মৃত্যু নয়, পরম ও চরম মুক্তি। ক্ষুধার পরিসমাপ্তি। নরক যন্ত্রণা থেকে অমৃতের পথযাত্রীকে চোখের জল দিয়ে অসম্মান করা উচিত নয়। কেঁদে কোন লাভ নেই।

শোন্ দাদু। দিদিমাকে ওপারে নিয়ে যেতে হবে। ফেরীর নৌকা এসেছে। ওকে ওপারে নিয়ে যাই। কাউকে বলিস না ও মরে গেছে। গাঁয়ের মাটির ছোঁয়া যেন ওর গায়ে লাগে।

তারপর?

ওপারে পেঁছে ঘাটের কাছে একটা আম গাছতলায় ননীবালাকে শুইয়ে নদেরচাঁদ গেল গাঁয়ের লোকজনের সন্ধানে। সেই সকালে কারও কোন পাত্তা করতে না পেরে ফিরে এসে বলল, এখন কি করি বল দেখি।

রাজকুমার তখন অঝোরে কাঁদছিল। কোনরকমে চোখ মুছে বলল, কোন উপায় নেই রে চাঁদু। ওর মুখে আগুন ছুঁইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতেই হবে।

না। কালাচাঁদের ভিটে পর্যন্ত পেঁছতে না পারলেও, গাঁয়ের মাটিতে যখন এসেছি তখন একটা কিছু করতেই হবে দিদিমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে। তুই বস। আমি একটা কোদাল সংগ্রহ করে আনি।

রাজকুমার বসে রইল।

বসে বসে ভাবছিল তার অতীত, ভাবছিল ক্ষুধার তাড়নায় কি ভাবে কলকাতার ফুটপাতে বাস করতে হয়েছে বছরের পর বছর ধরে, কি ভাবে তাকে বঞ্চিত করেছিল মহাজন, কিভাবে শোষণ করেছে তাদের কয়েক পুরুষকে। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নদেরচাঁদ ফিরে এল দুজন লোক নিয়ে। তাদের হাতে কোদাল।

নদীর কিনারার নরম মাটি ঝপাঝপ্ কেটে তুলে একটা বড় গর্ত করল তিনজন মিলে। রাজকুমার বসে বসে দেখছিল আর ভাবছিল, চোখ মুছছিল।

তারপর শুকনো পাতায় আগুন দিয়ে ননীবালার মুখে ঠেকিয়ে চারজনে মিলে ধরাধরি করে ননীবালার দেহটা নামিয়ে দিল সেই গর্তের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই মাটি চাপা দিয়ে ননীবালার দেহকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠিয়ে দিল। এতক্ষণ মনের জোর নিয়ে নদেরচাঁদ সব কিছু করলেও এবার সে ভেঙ্গে পড়ল। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

আর রাজকুমার পাষাণের মত বসে রইল নদীর পারে।

এর মধ্যেই নদীতে জোয়ার এসে গেছে। ননীবালার কবর ঢাকা পড়ল জোয়ারের জলে। জলের প্রবল স্রোতের দিকে তাকিয়ে রাজকুমার বলল, কালাচাঁদের ভিটে আর দখল করা হল না রে চাঁদু। তোর ঠাকুমার বড়ই

আশা ছিল একদিন কালাচাঁদের ভিটেয় আবার ঘর বাঁধবে, তা আর হল না।

নদেরচাঁদ উবু হয়ে বসেছিল মাথাটা দু'হাতের মাঝেতে রেখে। উদাস ভাবে রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর গভীরভাবে নিশ্বাস ফেলে বলল, কলকাতায় আখ মাড়াই তো দেখেছিস দাদু। কেমন দুটো লম্বা রোলারে চেপে রস নিংড়ে নেয়। আমাদেরও রস নিংড়ে নিয়েছে রে। তাতেও তো নিষ্কৃতি নেই। আখের ছিবড়েগুলোকে জ্বালানি করে, আখের চিহ্নও যেমন থাকে না তেমনি আমাদের পিষে রস বের করে ছিবড়ে করেই ওদের মন ঠাণ্ডা হয় না। ওরা ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমাদের চিহ্নও রাখতে চায় না।

রাজকুমার মৃদু স্বরে বলল, সবাইয়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে পারতাম কিন্তু পেটের ন্যাংটো জ্বালা আমাদের শেষ করে দিয়েছে। আমরা আর মানুষ নইরে, আমরা জানোয়ার হয়ে গেছি। ক্ষিদের জ্বালায় ভালমন্দ ভুলে গেছি, জাত ধর্ম ভুলে গেছি, ভালবাসা মায়া মমতা ভুলে গেছি। মানুষের দেহ থেকেও মানুষ হতে পারিনি। যাদের আছে তারাই চক্রান্ত করে আমাদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। কার কাছে নালিশ করবি, কে শুনবে। কে প্রতিকার করবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

নদেরচাঁদ ডাকল, দাদু।

আর কোন শব্দ বের হল না তার মুখ থেকে।